যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি

আবদুর রহিম

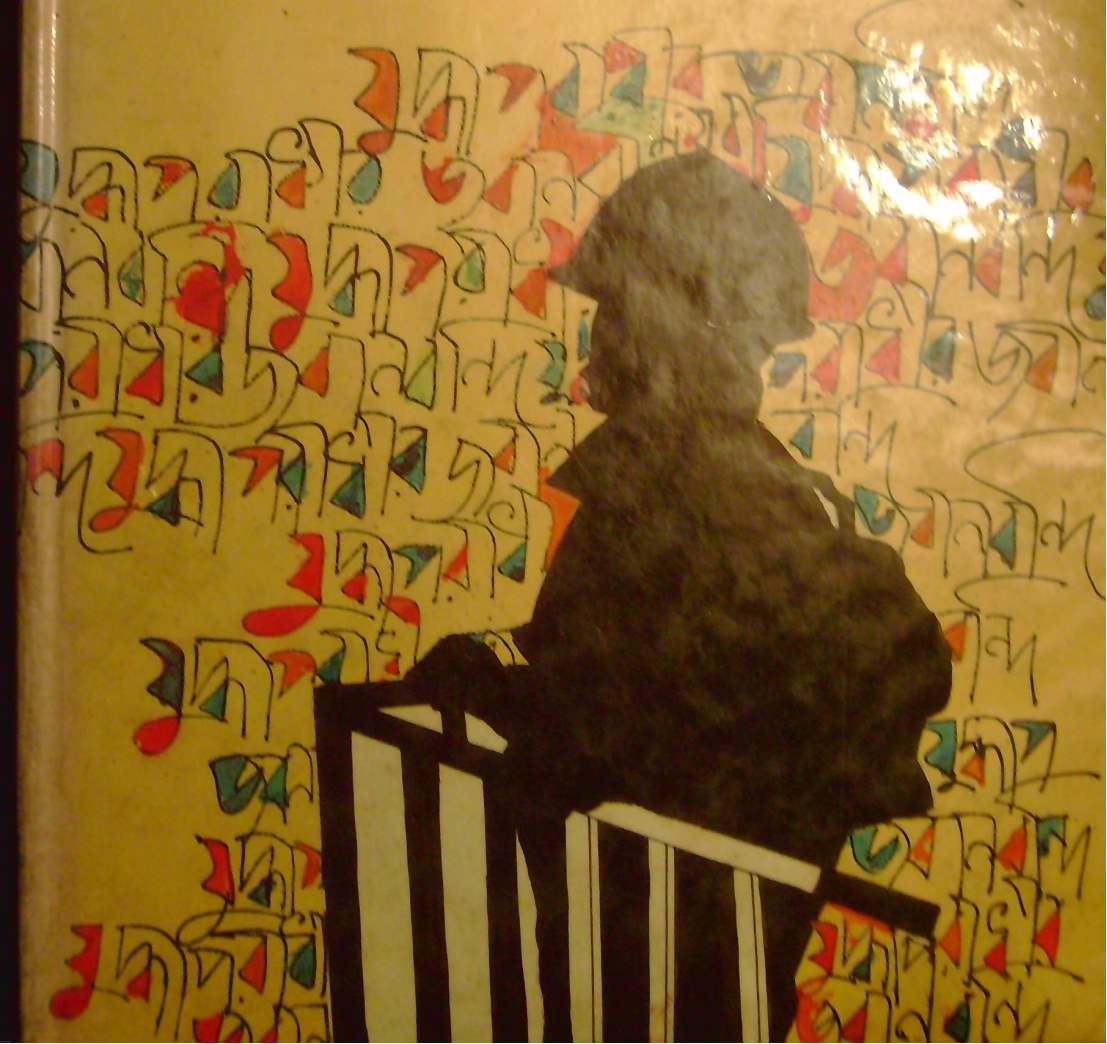

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

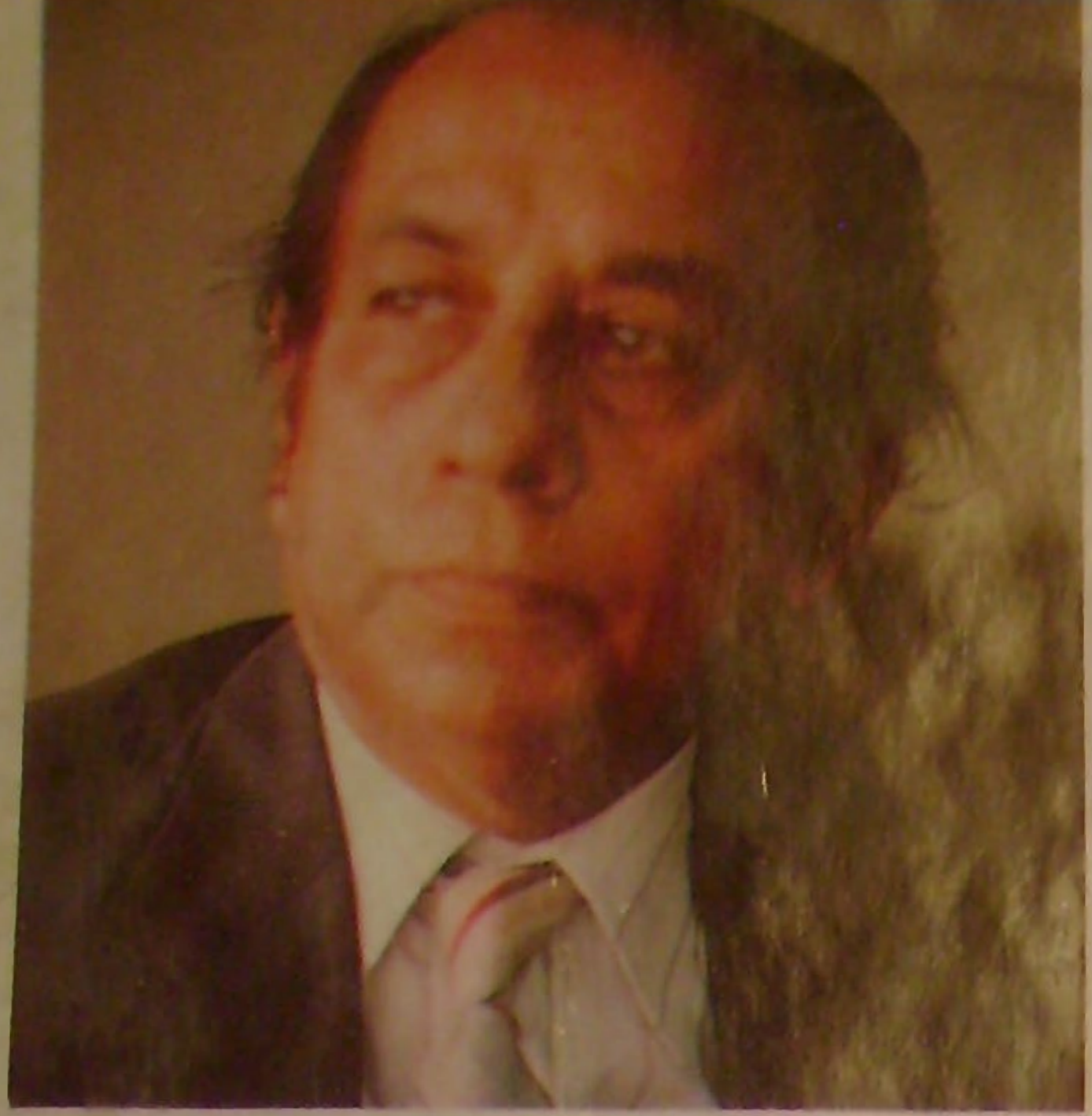

"যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি" নামের এই গ্রন্থের রচয়িতা অন্য কেউ নন, একজন ইতিহাস-নায়ক। ওই নায়কের জবানিতে যিনি লিখেছেন তিনি এদেশের একজন প্রথিতযশা কথাশিল্পী আবদুর রহিম। কথাকে তিনি শিল্প করে তুলেছেন সাংবাদিক হিসেবেও, সাহিত্যিক হিসেবে তো বটেই। মহান একুশের রক্তাক্ত আন্দোলনের সময়ে তাঁর জীবনের জাগরণ শুরু। তারপর সেই চেতনা, সেই জাগৃতিকে আবদুর রহিম বয়ে নিয়ে চলেছেন ষাট, সত্তর, আশি, নব্বুইয়ের প্রতিটি দশকের প্রতিটি আন্দোলনে, সংগ্রামে, অভ্যুত্থানে; নিজের কলমের মতো নিজেকেও তাই তিনি করে তুলেছেন সক্রিয়তায় শাণিত এক শক্তিতে। এই শক্তি যে কতখানি নির্ভীক হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ মেলে একাত্তরের ঘটনাবলীর বর্ণনায়।এ গ্রন্থের বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে অনেক অজানা অকথিত কাহিনী, যা লেখক প্রকাশ করেছেন সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায়, যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় দূরে, বহু দূরে। -সায়যাদ কাদির

Yuddhaparadheer Jabanbandi
Abdur Rahim

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
© সাইফ রহিম

প্রকাশক : সাইফ রহিম
ননী প্রকাশনী
বাড়ি নম্বর ২০, রাস্তা নম্বর ২৬
গুলশান, ঢাকা
ফোন : ৮৮৫৬২৪, ৬০৭৯৩৭

কম্পিউটার কম্পোজ/মেকআপ
কমপার্ফেক্ট
৩৫/২ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩৪৩২৮, ৪১৬০১৩
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৮১৯৩

মুদ্রক
সুমি প্রিন্টিং প্রেস
৯ নিলক্ষেত, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

দাম
১৫০ টাকা
US $ 8

উৎসর্গ
মহান ভাষা আন্দোলন ও
স্বাধীনতা সংগ্রামের
শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

- ❑ নিশাচরের নিশিদিন [প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪]
- ❑ সুপ্রভাত বাংলাদেশ [১৯৯৫]
- ❑ হাইওয়ে [যন্ত্রস্থ গল্পগ্রন্থ]

নির্লিপ্ত ও বলিষ্ঠ লেখনী

মানুষের অভিজ্ঞতা নানা রকমের। নানা রকমের না বলে বিচিত্র রকমের বলাই ভাল। বিভিন্ন পেশা এবং কর্মব্যবস্থাপনা থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করে। কেউ কেউ এসব অভিজ্ঞতার কথা লেখেন, অধিকাংশই লেখেন না। যাঁরা লেখেন তাঁরা হয়তো গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে অথবা স্মৃতিকথার মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন ঘটনাভিত্তিক তথ্যপূর্ণ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে এসব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। এসব পেশার মধ্যে আছে আইন পেশা, চিকিৎসা পেশা, সাংবাদিকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আরো অনেক কিছু। প্রথম যে বাংলা উপন্যাসে একটি পেশার ব্যবহার আছে সেটি হচ্ছে নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা'। সে পেশাটি হচ্ছে পাট ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল সংক্রান্ত। মুসলমান লেখকদের মধ্যে নজিবর রহমানই প্রথম একটি পেশার কর্মব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি জীবনকাহিনী উপস্থাপন করেছেন। সাংবাদিকতা পেশা মুসলমানদের মধ্যে এসেছে মূলত কলকাতায় 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই প্রথম মুসলমান সাংবাদিকদের আবির্ভাব ঘটল আমাদের সমাজ জীবনে। এ সময়কার দু'জন সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং মোহাম্মদ মোদাব্বের সাংবাদিকতা কর্মের সূত্রে কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ দু'জনের মধ্যে জহুর হোসেন চৌধুরীর 'নবাব-ই- জহুর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি বিচিত্র চরিত্রের উদঘাটন ঘটিয়েছেন। সাংবাদিকতা পেশার একজন মানুষ যে সমস্ত বিচিত্র কলকাঠির মধ্য দিয়ে চলে এবং বিবিধ স্বভাবের মানুষের সম্মুখীন হয় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ জহুর হোসেন চৌধুরীর লেখায় আছে।

সাংবাদিক হিসেবে আবদুর রহিমের অভিজ্ঞতা অনেক। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের সময় পর্যন্ত তিনি অনেক সংবাদপত্র এবং কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে সরকারি প্রচার মাধ্যমের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বিচিত্রমুখী, এসব অভিজ্ঞতা কখনও কৌতুকের, কখনও বিতৃষ্ণাকর এবং কখনও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক সিদ্ধান্তের পশ্চাদঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। তাঁর 'নিশাচরের নিশিদিন' গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি তাঁর সাংবাদিক জীবনের বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতার চিত্রলিপি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। আমি এই গ্রন্থটি পাঠ করে চমকিত হই। সাহিত্যের স্বাদযুক্ত এ গ্রন্থটিতে আমাদের সমাজ জীবনের, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের জন্য অনিবার্যভাবে দুটি জিনিস একান্ত প্রয়োজন। একটি হচ্ছে গতিময় বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। এমন একটি ভাষা যা পাঠককে রচয়িতার অনুকূলে নিয়ে আসবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের রূপাভিব্যক্তি। এ দুটি ক্ষেত্রেই আবদুর রহিম সফলকাম হয়েছেন। তাঁর অনেকগুলো চিত্র ছোটগল্পের যথার্থ স্বাদযুক্ত। আবদুর রহিম কখনও কখনও গল্প লিখে থাকেন এবং আমার মনে হয় এ কর্মপ্রক্রিয়ায় তিনি সফলকাম হতে পারতেন।

বর্তমানে আবদুর রহিমের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ করে চলেছেন। লেখক হিসেবে তাঁর একটি শান্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিবেক মন আছে, যার ফলে তাঁর রচনায় অহেতুক কোন আবেগ নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, নির্যক্ ইঙ্গিত আছে এবং সর্বোপরি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা নির্লিপ্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবদুর রহিমের রচনা একটি নতুন সংযোজন বলে গৃহীত হবে।

সৈয়দ আলী আহসান

লেখকের কথা

স্বেচ্ছায় যতটুকু না লিখেছি, তার চেয়ে বেশি লিখেছি হুমায়ূন সাহেবের তাড়ায়। দৈনিক বাংলার সম্পাদক বন্ধু আহমেদ হুমায়ূন প্রতি সপ্তাহে তাঁর পত্রিকায় একটা লেখা দেয়ার যে অনুরোধ করেছিলেন তারই ফসল 'যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি'।

'নিশাচরের নিশিদিন' শীর্ষক কলামটির একটি অংশের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান বইটির নামকরণ। চোখে দেখা ও বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থটির বিরাট অংশ জুড়ে। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের অনেক কিছুই লেখা হয়নি আগে। সেই সব অলিখিত কাহিনীগুলো প্রকাশ পেয়েছে নিবন্ধগুলোতে।

বন্ধুবর সাহিত্যিক শওকত আলী, অনুজপ্রতিম সাযযাদ কাদির ও আবদুল হাই শিকদার লেখার ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে।

বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে 'অর্থকথা'র সম্পাদক সৈয়দ রানা মুস্তফী এবং সাংবাদিক কামাল মাহমুদ যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমার লেখা কলামগুলো পড়ে যাঁরা কড়া ভাষায় সমালোচনা করে আমার চেতনাকে শাণিত করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা লেখক হিসেবে দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে আরো সজাগ করেছেন।

আবদুর রহিম

সূচীপত্র

যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি	৯		
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	২৮	কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়	১০২
অমর হাসান ভাই	৩৪	নিকষিত হেম	১০৬
জীবন ও বীমা	৩৮	বে-আক্কেল গরু	১১০
বই মেলায়	৪২	ম্যান্ডেলার জীবনে নারী	১১৪
সম্রাটের বিদায়	৪৬	শিক্ষা-দীক্ষা	১১৮
সমঝোতা	৫১	সূর্যোদয়ের দেশ	১২২
কূটনীতি	৫৪	বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ!	১২৫
সময় কথা কয়	৫৮	নিয়তির পরিহাস	১২৯
হরতাল	৬৩	অব্যবহৃত, তাই দামী	১৩৩
দুঃখের মাস	৬৫	শান্তির সংজ্ঞা	১৩৭
খোন্দকার ইলিয়াস	৬৮	পরিণতি বাগদাদের	১৪২
গুণীজন সংবর্ধনা	৭৪	রাজ্যহারার রাজনীতি	১৪৮
বিলম্বিত শোকসভা	৭৮	পুওর কাজিন	১৫২
কলকাতায় ড. শহীদুল্লাহ	৮২	জ্ঞানের ফকির	১৫৭
চোর আর লাঠি দু'জন	৮৮	বিলেতের ঢেউ	১৬৩
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী	৯২	জীবদ্দশায়	১৬৬
সেতুবন্ধন	৯৫	মহাপ্রস্থানের যাত্রী	১৭১
আফটার অল নিজের স্বামী	৯৯	বীজতলা	১৭৫

যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি

মাটি চুম্বন করে ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। তার বুকের ওপর স্টেনগানের নল ঠেকানো। 'বীর' মেজর সাহেবকে সে বললো, হ্যাঁ, আমি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরী। আমার রক্ত পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে।

সময় ১৯৭১ সালের জুন মাস। স্থান: রাজশাহী জেলার রোহানপুর। গেরিলা তৎপরতা চালাতে গিয়ে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নাম না জানা ছেলেটি। তার ওপর প্রচুর অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু সে একটি কথাও বলেনি। তার কাছ থেকে কোন খবর বের করতে না পেরে মেজর 'র' বললেন, এই তোমার শেষ সুযোগ। আমাদের সাথে যদি সহযোগিতা না করো তা হলে গুলি তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে।

এরপর কি হয়েছিলো তা কিন্তু মেজর সিদ্দিক সালেক তার লেখায় বলেননি। শত সহস্র বিদ্রোহী বিপ্লবীর মত সেই অসীম সাহসী যুবক আত্মাহুতি দিলো স্বাধীনতার বেদীমূলে।

এক সময়ের সাংবাদিক ও ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক এবং অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক সত্য স্বীকার করতে কিন্তু কার্পণ্য করেন নি। তিনি তাঁর স্বলিখিত গ্রন্থ Witness To Surrender-এ অকপটে স্বীকার করেছেন, আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাস না থাকলে ঐ ছেলেটির মতো কেউ আত্মবলিদান করতে পারে না।

অপর দিকে বিপরীত ঘটনার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি। রাজশাহীর গোমস্তাপুরে একটি সেতু পাহারায় রত এক রাজাকার সদস্য মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। ধৃত রাজাকার সদস্য 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলতে বেয়নেটের

আঘাতে মৃত্যুবরণ করে তবুও সে 'জয় বাংলা' বলেনি।

প্রবল প্রতাপান্বিত ইরাণের রাজাধিরাজ আর্য মেহের রেজা শাহ পাহলবীর সুদিনে কয়েকজন আর্মি জেনারেলকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে হাজির করার পর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ওরা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে বললেন, আমাদের রক্তের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে শত সহস্র দেশপ্রেমিক এবং তারা দেশকে করবে দাসত্ব শৃংখল মুক্ত। তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে, হয়ত কিছু দেরিতে।

ডিসেম্বর মাসটা আমাদের জাতীয় জীবনে যেমন আনন্দের দিন বয়ে এনেছে তেমনি আমাদের জন্যে রেখে গেছে দুঃখের সাগর। তাই এ সময় কিছু লিখতে গেলেই মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কলমে লেখা আসে না। বরং চোখে আসে পানি। যদিও এ বয়সে তা শোভা পায় না। কিন্তু সুখ-দুঃখের অনুভূতি বয়সের সীমারেখা মানে না। এক প্রাক্তন সাংবাদিক, পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যুদ্ধবন্দী মেজর সিদ্দিক সালেক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর বর্বরতার কথাও স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর ভাষায় বেসামরিক লোকদের ওপর সামরিক অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা হত্যা, লুট ও ধর্ষণ চালিয়ে 'আমাদের চরম অবমাননাকর অবস্থায় ফেলেছে'। তিনি বলেন, ধর্ষণের নয়টি ঘটনার বিচার করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশ্য কি রকম শাস্তি দেয়া হয়েছে তা মেজর সাহেব উল্লেখ করেন নি। প্রয়াত মেজর সালেক স্বীকার করেন যে, তিনি সঠিক করে জানেন না কতগুলো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাঁর মতে যদি এ ধরনের একটি ঘটনাও ঘটে থাকে তা হলে তা আমাদের সমগ্র বাহিনীর সুনাম নষ্ট করতে যথেষ্ট। তিনি মনে করেন, এ ধরনের অত্যাচার স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিদেরকে পাকিস্তান বিদ্বেষী করে তোলে। পাকিস্তানীদের প্রতি বাঙালিদের আগেও তেমন ভালোবাসা ছিলো না, কিন্তু এখন তারা আমাদের ভীষণভাবে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজী হয়, যদিও তারা এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত ছিলো, সিদ্দিক সালেকের উক্তি।

সালেক তাঁর গ্রন্থে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন- যার দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন, পাকিস্তানীদের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টায়ও তদানীন্তন সামরিক কর্তারা সফল হননি। যদিও কতিপয় চিহ্নিত পাকিস্তানপন্থী ইতোমধ্যে সামরিক বাহিনীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন, তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে সালেক তাঁদের এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায় 'পুরনো মুদ্রা' দিয়ে কাজ হবে না। বরং চেষ্টা করা যাক বুদ্ধিজীবীদের কাছ

থেকে বিবৃতি আদায় করার। তাঁর ওপর সে দায়িত্ব বর্তালে, তিনি যান পূর্ব পাকিস্তানে ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি জাস্টিস মোর্শেদের গুলশানস্থ বাড়িতে। সালেককে তাঁর স্টাডি রুমে নিয়ে জাস্টিস মোর্শেদ দেখালেন দুর্লভ বইপত্র ও অনেক বিরল পাণ্ডুলিপি। সাথে সাথে তিনি রুমী, সাদী, ইকবাল ও আরো অনেক কবির লেখার উল্লেখ করে গেলেন অবলীলায়। সালেক সাহেব তাঁর আসল কথা পেড়ে জাস্টিস সাহেবের সহযোগিতা কামনা করলেন। এ কথা সে কথার পর জাস্টিস মোর্শেদ মেজর সাহেবের কাছ থেকে তিন মাস সময় চাইলেন এ ব্যাপারে চিন্তা করতে। অবাক বিস্ময়ে সালেক বললেন, তিন মাস! উত্তরে মোর্শেদ সাহেব বললেন, হ্যাঁ, কমপক্ষে তিন মাস। কারণ আমি দেখতে চাই আপনারা নিজেদের অথরিটি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিনা। মোর্শেদ সাহেব কথাচ্ছলে সালেককে জিজ্ঞেস করলেন, ফারল্যান্ড (মার্কিন রাষ্ট্রদূত) এখন কোথায়?

এর কি উত্তর দিয়েছেন সালেক তা বলেননি। মোর্শেদ সাহেবের সাথে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ দিলেন পরবর্তী এক সভায়। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে গোয়েন্দা সংস্থার এক 'দেশপ্রেমিক' অফিসার বললেন, ইচ্ছা করলে আমরা মোর্শেদ সাহেবকে রাত্রে তুলে নিয়ে আসতে পারি এবং যে রকম ইচ্ছা সে রকম বিবৃতিতে তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষর আদায় করে নিতে পারি। একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সালেক বললেন, আমি খুশি হয়েছি যে, মোর্শেদ সাহেবকে সে 'সম্মান' দেখানো থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

মেজর সালেক গোয়েন্দা সংস্থার সেই সদস্যকে চিহ্নিত করতে গিয়ে দেশপ্রেমিক শব্দটি তির্যকার্থে ব্যবহার করেছেন।

তা ছাড়াও সালেক সামরিক বাহিনীর বহু কর্তাব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্য না বলে পারেননি। খুব উচ্চ পদস্থ এক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নতুন কর্মকর্তা দায়িত্ব বুঝে নেয়ার সময় জানতে চাইলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বসূরির উপপত্নীদেরও পাবেন।

পাক-সামরিক বাহিনীর অনেক অকথিত অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে সালেক কেরানীগঞ্জে সংঘটিত এক নারকীয় ঘটনার কথা বলেছেন। পাক বাহিনীর দোসর অনেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতায় বিশ্বাস করলেও কিছু লোক ছিলো যারা সামরিক বাহিনীর সাথে যোগাযোগ থাকার সুবাদে নিজেদের পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। কেরানীগঞ্জে বর্বর হামলা এবং অসংখ্য নিরীহ লোকের জীবননাশ তারই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কেরানীগঞ্জ অভিযানের নায়ক সামরিক অফিসার সালেককে বললো, মিথ্যা খবরের ওপর ভিত্তি করে তারা নিরীহ মানুষদের খুন করেছে।

সালেক বলেন, যাঁরা দেশের অভ্যন্তরে রয়ে গেছেন, তাঁরা জীবন বাঁচাবার জন্য সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

অনেক সামরিক কর্মকর্তা বাঙালি পরিবারের অভিভাবক হিসেবে পরিচিত হন। সালেকের ভাষায় যে পরিবারে কোন সুন্দরী কন্যা ছিলো, সে পরিবারে একাধিক অফিসার অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হন। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সালেক বলেছেন, কোন এক বিত্তশালী সম্পাদকের বাড়িতে তিনি নিমন্ত্রিত হলেন। একই সম্পাদক আগে মেজর সাহেবের সাথে অত্যন্ত ফরমাল ব্যবহারই করতেন। সম্পাদক সাহেব সালেককে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দিলেন মা, বিবাহিতা বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে। কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পাদক সাহেব তাঁর এক বন্ধুকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে আনতে গেলেন এবং যাওয়ার আগে সম্পাদকের স্ত্রীকে রেখে গেলেন সালেকের সাথে কথা বলতে।

এ অবস্থায় আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম, সালেকের ভাষ্য। বলতে চাচ্ছিলাম, আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সম্পাদকের স্ত্রী বললেন, তোমাদের প্রত্যেকটি লোককে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। এত লুটতরাজ, হত্যা, ধর্ষণের পর বলছো তোমরা দুঃখিত। তোমাদের চোখে-মুখে রয়েছে বর্বরতার ছাপ। মহিলা আক্রোশ মিটিয়ে বলে গেলেন। আমি আস্তে উঠে পড়লাম এবং পথে পা বাড়ালাম, সালেক আক্ষেপের স্বরে লিপিবদ্ধ করলেন।

জন কেলীর কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানী শাসকরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলো এবং তা কার্যকর হয় কিনা পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় এলেন আয়ারল্যান্ডবাসী জন কেলী। তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য যাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। আমার সাথে ক্যামেরাম্যান মোজাম্মেল।

এই নারকীয় অবস্থার মধ্যে কি মুক্তিযোদ্ধা বা যারা দেশ ত্যাগ করেছে, তারা ফিরে আসবে আমার এ প্রশ্নের উত্তর তিনি সরাসরি দিতে পারেননি। অবস্থার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। একজন কূটনৈতিক কখনো একটি প্রশ্নের জবাবে একেবারে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেন না। তিনি বললেন, তিনি আশাবাদী।

তাঁর দেশের বিপ্লবী নেতা আইরিশ রিপাবলিকের জনক ডি ভ্যালেরার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাবার পর, জন কেলীর ব্যবহার ফরমাল থেকে ইনফরমাল হয়ে গেলো। তাঁর দেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রনায়ক-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছিলাম, আয়াল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা কি করে জেল থেকে পালিয়েছিলেন এটা স্কুলে পড়ার সময় বইতে দেখেছিলাম। কেলী বুঝলো আমরা কি চাই। কেলী যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, তা পূরণ হওয়ার

কোনও আশা নেই জেনেও তিনি রয়ে গেলেন কোটি কোটি মানুষের বিজয় দেখার মানসে। হ্যাঁ, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ১৬ ডিসেম্বর ওয়াকিটকি হাতে করে খুঁজে বেড়িয়েছেন 'টাইগার' নিয়াজী ও 'বিচক্ষণ' রাও ফরমান আলীকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আনাচে-কানাচে। অবশেষে তাঁর মিশন হয়েছিলো সার্থক।

জন কেলীর সাথে সাক্ষাৎকারের খবরটি অবজারভারে ছাপা হয় যথারীতি সেন্সরের অনাপত্তি পাওয়ার পর। খবরের সাথে ছাপা ছবিটিও সেন্সর-এ পাস করিয়ে নিতে হয়েছিলো নিয়মানুযায়ী। তৎকালীন তথ্য কর্মকর্তা একরামুল হকের সইয়ে ছবি ও সংবাদটি ছাপার অনুমতি পায়। ওই সময় বৃষ্টি ও বন্যার খবরও সেন্সর-এ পাস করিয়ে নিতে হতো।

পুনশ্চঃ মেজর সালেকের সাথে ১৯৮০ সালে আমার দেখা হয় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতার পর পরই। তখন ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত ও পাক প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি সালেক মাইক্রোফোন হাতে সামনে এসে জানতে চাইলেন জিয়াউল হকের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের মতামত। বললাম, এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার এক্তিয়ার আমাদের প্রতিনিধিদলের নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের। ব্রিগেডিয়ার সালেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাথে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। একই সময় হঠাৎ দেখা হয় নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে জন কেলীর সাথে। তাঁকে নিয়ে কফি খেলাম জাতিসংঘের সদর দপ্তরের লাউঞ্জে। তিনি ঢাকায় তাঁর অবস্থানকালের কিছু স্মৃতিচারণ করে বাংলাদেশের মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তার প্রশংসা করলেন। জানিনা জন কেলী এখন কোথায় আছেন, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর শুভ কামনা করি।

দুই

সেপ্টেম্বর মাস। ১৯৭১ সাল। ছয় ছয়টি মাস অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অবস্থান ছিলো প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করা। চারদিক থেকে খবর আসছে কোথাও যুবকদের হত্যা করা হয়েছে নদীর পাড়ে নিয়ে, কোন হাট-বাজার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হয়েছে 'মুক্তি'র সন্ধান করতে গিয়ে।

নোয়াখালী জেলার সোনাপুরে এমনি এক বর্বরোচিত ঘটনায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অনেক দোকানপাট। মিজান নামক এক কিশোরসহ আরো কয়েকজন দগ্ধ হয় সেই আগুনের লেলিহান শিখায়। সোনাপুরের পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর গ্রামেও চলে একই রকম তাণ্ডব। বেশ কয়েকজন কিশোরী-মহিলার ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয় হানাদার সৈন্যদের পৈশাচিক কর্মের ফলে।

মেজর সালেক ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা। সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এপ্রিলের (১৯৭১) প্রথম সপ্তায় অবজারভার অফিসে তাঁর আগমন ঘটলো। নিউজ ডেস্কে এসে বসলেন তিনি বীরদর্পে। আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং জানালেন খাঁটি পাকিস্তানীদের ভয়ের কোন কারণ নেই। সভয়ে শুনলাম তাঁর অভয় বাণী। ইতোমধ্যে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্বচক্ষে দেখেছি আগুনের লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত জনপদ। খবর এসেছে ঢাকা- টাঙ্গাইল সড়কের আশপাশের বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ভয়ে ভয়ে সালেক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম এভাবে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার হেতু কি? দক্ষ জনসংযোগ কর্মকর্তা জানালেন, 'মুক্তি'রা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গ্রামবাসীদের সায়েস্তা করার জন্য এ ব্যবস্থা নিতে হয়। এর

সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে। এর ফলে 'মুক্তিদের আশ্রয়' দিতে অন্যরা ভয় পাবে। নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রতি পাক সেনাদের কোন আক্রোশ নেই বললেন মেজর সাহেব। মেজর সাহেবের সারগর্ভ বক্তব্য শুনলাম একজন মাইনর বয়-এর একাগ্রতা নিয়ে। ভাবতে অবাক লাগছে এই লোকটি ছিলো একদা পাঞ্জাবের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা মিয়া ইফতেখার প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান টাইমস-এর একজন সাংবাদিক এবং এক সময় তিনি একটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনাও নাকি করেছিলেন। আজ তাঁর চোখে হায়েনার হিংস্রতা, বক্তব্যে রূঢ় বাস্তবতা। অসংখ্য নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরেছে তাঁরই চোখের সামনে। তাঁর লিখিত বই 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে মেজর সালেক এক মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: বীর সে মুক্তিসেনা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে, জন্মভূমির মাটিকে শেষ সালাম জানিয়ে হিংস্র শার্দুলদের তপ্ত বুলেটের আঘাতে লুটিতে পড়ে বধ্যভূমিতে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। পরে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন। পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

বলছিলাম আতঙ্কিত সেপ্টেম্বর মাসের কথা। এখানে সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত পাক সেনারা। সামান্য পটকা ফোটার আওয়াজে আতঙ্কিত দখলদাররা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতীক্ষা করে 'দেশদ্রোহীদের' আক্রমণ প্রতিহত করতে। ঢাকার কচুক্ষেত এলাকায় কথিত মুক্তিদের সাথে যুদ্ধ হয় একদিন পাক সেনাদের শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত। ভোরে জানা গেলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আমদানিকৃত মিলিশিয়া বাহিনীর এক বেয়াকুফ সদস্যের হাত ফসকে গুলি ফোটার পর পরই অদূরে অবস্থিত অন্য পাহারাদার বাহিনী পাল্টা গুলি ছুঁড়তে থাকে। এবং এ যুদ্ধ শেষ হয় ভোর বেলায়। এ প্রচণ্ড যুদ্ধে গাছপালা ছাড়া কেউ হতাহত হয় নি। আতঙ্কের মধ্যে নিশানা ঠিক রাখা সত্যিই মুশকিল। তা আবার রাত্রি বেলায়।

ঐ সময়ের রাতগুলো ছিলো সত্যিই বিভীষিকাময়। সন্ধ্যা ছ'টার পর ফোন লাইন বন্ধ হয়ে যেতো। এর কি মাজেজা বোঝা দায়। সন্ধ্যার দিকে অফিসে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসতো আমার উত্তর শাহজাহানপুরের বাসায়। গাড়ি সমেত গাড়োয়ানের কারফিউ পাস ছিলো। নিজের কারফিউ পাসটিও থাকতো সাথে সর্বক্ষণ। দায়সারা গোছে অফিস সেরে ফিরতাম আবার সেই গাড়িতে। একদিন দেখি গাড়ি নেই। রাত বাজে এগারোটা। বাসায় যে খবর দেবো তারও উপায় নেই। ফোন অচল। অনেক ভেবে-চিন্তে হেঁটেই রওনা দিলাম। দুরুদুরু বক্ষ। পা হারিয়েছে স্বাভাবিক গতি। কোথাও কোন সাড়া নেই। রাস্তায় একটি নেড়ী কুকুরও দেখলাম না। কুকুর

হলেও একটা প্রাণী তো। দেখলে সাহস পেতাম মনে। মনে মনে দোয়া দরূদ পড়তে শুরু করলাম। এ খোদা, অতি সাধারণ সুরা কেরাতও মনে আসছে না। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনছি। মনে হলো মৃত্যু বোধহয় খুব নজদিক। পা চলতে চাচ্ছে না। পুলিশ লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো পূব আকাশে যেন সূর্যোদয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলাম- না, এ সূর্যের আলো নয়, আগুনের লেলিহান শিখা, লক লক করে উঠছে আকাশের দিকে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এমন প্রচণ্ড আগুন কোথায় লাগতে পারে। পরের দিন শুনলাম ডেমরার ওদিকে মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা জ্বালিয়ে দিয়েছে একটা গ্যাস ডিপো। মুক্তি বাহিনীর আক্রমণের আভাস হয়তো ড্রাইভার সালেক আগেই পেয়েছিল, তাই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আগেভাগে। এর আগে বিনা কারণে রাত্রে গাড়ি চালাবার সময় 'সাহসী' পাকসেনা তাকে সহ অন্য ড্রাইভারদের নাজেহাল করেছে। ইংরেজিতে লিখিত পরিচয়পত্র আনপড় সিপাহী ছাহাবদের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। তবু তারা ওগুলো উল্টোপাল্টা করে দেখে পরিচয়পত্র বহনকারীর কাপড়চোপড় নিরীক্ষা করে তার মর্যাদানুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ চড়-চাপড় দিয়ে নিজেদের ওপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করতো।

পঁচিশে মার্চের সেই বিভীষিকাময় রাত্রের হত্যাযজ্ঞের কথা শুনে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পড়ে কান্নার রোল। অনেকেরই আত্মীয়স্বজন রয়েছে ঢাকায়। তাদের খবর জানার উপায় নেই। যারা পেরেছে তারা ঢাকা ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এভাবে দেশের পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন বহু পরিবার।

আমার জেলা শহরে খবর রটে গেছে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মাইলখানেক স্থান শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আমাদের বাসা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সরাসরি দূরত্ব আধামাইলের মতো। ঝুঁকিপূর্ণ একটা চাকরি করি, তার উপর উপদ্রুত এলাকার এত কাছে থেকে জীবনে বেঁচে আছি কিনা এ নিয়ে পিতাসহ নিকটাত্মীয়দের চিন্তা ছিল খুব। আমাদের বীর পুলিশ বাহিনী তাদের পুরনো অস্ত্র নিয়ে দীর্ঘক্ষণ লড়েছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর সাথে। অতএব পুলিশ লাইনের আশপাশের এলাকায় কি হতে পারে এ চিন্তা ছিলো দেশের সর্বত্র।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নোয়াখালী যাবো ঠিক করেছি। যাবার আগের দিন দুপুরে অফিসে চোস্ত উর্দুতে একখান সাহেব আমি অফিসে উপস্থিত কিনা জানতে চাইলেন। প্রশ্নকর্তার পরিচয় জানতে চেয়ে ধমক খেলাম ইংরেজিতে। মনে মনে ভাবলাম বেয়াদবিটা করেছি কি, কার সঙ্গে? অপর প্রান্ত গুরুগম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, খবরটা ছাপছি না কেন? বিনয়ের সাথে শুধালাম, কোন খবরটার

কথা বলছেন। আবার ধমক। মহাত্মনের উর্দু জবানী বাংলা করলে দাঁড়ায়, ন্যাকা সাজা হচ্ছে! শেরে বাংলা নগরে 'দুষ্কৃতকারীদের' দ্বারা নষ্ট করে দেয়া টেলিফোন লাইন ঠিক করে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত 'দেশপ্রেমিক' ইঞ্জিনিয়াররা। সেই খবর ফলাও করে ছাপার জন্য সামরিক কর্তাদের চাপে পড়ে রিপোর্টার খলিল ও ফটোগ্রাফার মোজাম্মেলকে পাঠিয়ে ছিলাম। ঐ খবরটা কেন আজো ছাপা হলো না তারই কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন অপর প্রান্ত থেকে জাঁদরেল কোন পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার। উত্তরে বললাম, টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপার এর সাথে জড়িত। তাই ছাপতে একটু দেরী হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেই ওটা ছাপবো। তাচ্ছিল্যের সাথে ইঞ্জিনিয়ার ছাহাব বললেন, তিনি নিজেই কর্তৃপক্ষ, তিনি চান এটা কালই পত্রিকায় ছাপা হোক। নরম সুরে বললাম, আমি যে আগামীকাল আমার দেশের বাড়ি যাচ্ছি। ওতে ও প্রান্তের বক্তব্যের দৃঢ়তার কোন রদবদল হলো না। তিনি তার অন্য সহযাগীদের নিয়ে আজই বিকেলে আমার বাসায় আসবেন। দেশের বাড়ি যাওয়া হবে কিনা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। নাকি পাক বাহিনীর অতিথি হয়ে যেতে হয় তাও ভাববার বিষয়।

অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম কপালে যা থাকে বাসায়ই থাকবো। 'মেহমানরা' আমার অখ্যাত আস্তানা বের করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ করেছে আমার বাসা থেকে মাইলখানেক দূরের অনেক বাসিন্দাদের। খিলগাঁও এক বিরাট এলাকা। আর আমার আস্তানা খিলগাঁও বাগিচায়। এটা স্বল্প পরিচিত ক্ষুদ্র জনপদ। আমার সামান্য উত্তরে একটি বাসার পরই থাকতেন অমর একুশে ফেব্রুয়ারির গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারির"-সুরকার আলতাফ মাহমুদ। ঐ বাসা থেকে ওকে জল্লাদরা নিয়ে যায়। সেই যে হারিয়ে গেলো আলতাফ মাহমুদ আর ফিরলো না হাজারো শহীদের মত।

পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা শেষ পর্যন্ত এক নির্ভীক টোকাইর সাহায্য নিয়ে আমার বাসায় হাজির। 'মেহমানদের' যৎকিঞ্চিৎ আপ্যায়ন করলাম। আমার পরিবেশিত মিষ্টি ও মিষ্টি কথায় তেমন মনোযোগী নয় অভ্যাগত অতিথিরা। তাদের জিজ্ঞাসা, কবে আখবারমে তাদের কৃতিত্বের খবর বেরুবে। বললাম, আমি দেশ থেকে ফিরে এসে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছি, মেহমানরা যদি আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় তখন কি করবো। স্বদেশে পাকিস্তানীদের মেহমানদারীর সুনাম আছে। হোস্ট নিজ বাড়িতে নিয়ে মেহমানদের গোস্ত কাবাব হালুয়া রুটি ভক্ষণ করাবার বহু গল্প শুনেছি। কিন্তু অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যারা তাদের মেহমান হয়ে গেছেন তাদের হাড্ডিও পাওয়া যায়নি।

সাইদুল হাসান, মুনির চৌধুরী, সিরাজুদ্দিন হোসেন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, নাজমুল হক, নিজাম উদ্দিন, ডাঃ ফজলে রাব্বী, ডাঃ আলিম চৌধুরী, লাড়ু ভাই এমনি আরো কত নাম বয়েছে এ লিস্টে। লাহোরী ছবির ভায়লগের মত ইন্ডিনিয়ার ছাহাবরা বলে গেলেন ফের মেলেগি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পাশের বাসায় আমার বড় বোন এতক্ষণ কোরান শরীফ পড়ে দোয়া করছিলেন, আমার যেন কোন ক্ষতি না হয়।

নোয়াখালীর জেলা সদর মাইজদী কোর্ট গিয়ে দেখি শ্মশানের নীরবতা। লোকজন খুব কম। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। নতুন লোক দেখলে কথা বলে না। আমার ছোট বোনের স্বামী, পা-ঢাকা দিয়ে আছে। এক ভাই চলে গেছে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে। অন্য একজনকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে আমার অজাতশত্রু প্রয়াত ডাক্তার ভাই মজিবুল হক। একটি খবর শুনে শিউরে উঠলাম। একবার আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার সব বন্দোবস্ত ঠিক। শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়নি। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।

আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথেই রওশনবাগী সিনেমা হলে আস্তানা গেড়েছেন পাক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের সাথে স্থানীয় কিছু চিহ্নিত ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দহরম মহরম লক্ষ্য করলাম। আমার এক পরিচিতজন, যিনি এক ডানপন্থী দলের সদস্য, চায়ের দোকানে পরিচয় করিয়ে দিলেন সৈন্যদের দলপতির সাথে। আমি একজন অপরিচিত মুখ, প্রথমে খরদৃষ্টিতে দেখলেন আমাকে সেনাপতি সাহেব। আখবারকে নোমায়ন্দা আমি একজন, একথা জানার পর তার দৃষ্টি একটু কোমল হলো।

নোয়াখালীতে গিয়ে অনেক লোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনলাম। তারই সাথে জানলাম জনগণের অসীম সাহসিকতার কথা। একটি নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম অনেকের কাছে। যার বীরগাথা শুনে মনে হলো, না এ জাতিকে কেউ দীর্ঘদিন পদানত করে রাখতে পারবে না। ঢাকায় থাকতে বামপন্থী এ রাজনৈতিক নেতার নাম শুনেছি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, যারা তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সাথে ছিল একমত। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি তাঁর নিজ জেলায় হয়ে পড়েন এক কিংবদন্তীর নায়ক। মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর নাম। নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে তোয়াহা সাহেবের দুর্ধর্ষ সহযোগীদের ভয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাক বাহিনীর সদস্যরা ঢুকতে সাহস পায়নি। মাঝে মাঝে তোয়াহা বাহিনী শহরাঞ্চলে এসে পাক সৈন্যদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতো। গোপন খবর পেয়ে কয়েকবার তোয়াহা সাহেবকে ধরবার জন্য গ্রাম ঘেরাও করেছেন পাক সৈন্যরা, কিন্তু পাখি উড়ে গেছে। আমার এক ভাগিনা তখন স্কুলের ছাত্র, আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এটা

কি সত্যি, তোয়াহা সাহেব জাদু জানেন। তার এ উদ্ভট প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলে সে বললো গোপন খবরের ভিত্তিতে পাক বাহিনী তোয়াহা সাহেবকে ঘেরাও করেছে কয়েকবার আর তিনি জাদুবলে উধাও হয়ে গেছেন ওসব জায়গা থেকে।

ছদ্মবেশ গ্রহণের ব্যাপারে তোয়াহা সাহেবের সুনাম ছিলো। আইয়ুব শাসনামলে আত্মগোপনকারী প্রয়াত সাংবাদিক বজলুর রহমানের সাথে এক গভীর রাত্রে দেখা করতে আসেন কালো শুশ্রুমণ্ডিত ও আজানুলম্বিত কুর্তা পরা এক মওলানা সাহেব। বজলুর রহমান সাহেবের সাথে একই বাসায় আমিও থাকতাম। বজলু ভাই আমাকে পরিচয় না করিয়ে দিলে কোনদিনই জানতে পারতাম না এই ব্যক্তিটি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, জিন্নার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এই সেই ব্যক্তি। চিরদিন তিনি ছিলেন মানুষের কাছের লোক।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য জনাব তোয়াহার হেলসিঙ্কির শান্তি সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর সাথে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সে সময়ে চরাঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তিনি জোতদারের ছেলে। নিজের বাড়ির খাদ্যশস্য বিলিয়ে দেন অভাবী মানুষের মধ্যে। তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য রামগতি-নোয়াখালী বেড়িবাঁধ তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁরই। ঐ অঞ্চলের মানুষ আজও তাঁর নাম স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে। ১৯৮৭ সালের ২৯ নবেম্বর এই মানব দরদী চলে যান ইহলোক থেকে। তাঁর আত্মা শান্তি পাক—এই কামনা করি আজ।

তিন

বাংলাদেশে গণহত্যার অপরাধে বিচারের জন্য অপেক্ষমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত লৌহমানব জেনারেল রাও ফরমান আলীকে গত বছর ১৬ ডিসেম্বর ঘটনাবহুল সকালে বাংকারের বাইরে আনা হলো। ঢাকার ইউএন লোকেশান-হেডকোয়ার্টারে পাওয়া আত্মসমর্পণের বার্তাটি পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে বাংকারের বাইরে আনলেন আনরোড (UNROD)-এর জন কেলী।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রাপ্ত এই বার্তা জন কেলীর একটি হ্যান্ডসেট রেডিও মারফত জানিয়ে দেয়া হলো পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময়সীমা পার হওয়ার দশ মিনিট আগে। এই বার্তা সকাল ন'টায় নয়াদিল্লিকে জানানো হয়। জাতিসংঘের নথিপত্রে এই তথ্য জানা যায়।

একটি বাংকারের ভেতর পাকবাহিনীর 'স্ট্রংম্যান' জেনারেল ফরমানকে সনাক্ত করতে জন কেলীর বেশ কষ্ট হলো। রেডক্রস-এর মিঃ ল্যাম্পেলসহ জন কেলী পাক আর্মির কর্নেল গফুরকে সাথে নিয়ে তার 'বস' জেনারেল ফরমান-এর আত্মগোপনের স্থান খুঁজে বের করলেন। কর্নেল গফুর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

মিঃ কেলীর বর্ণনায় ঐ মুহূর্তে পাকিস্তানী জেনারেলের চেহারা ছিল ভগ্ন ও ভস্মমলিন।

জেনারেল নিয়াজীকে ঐ সময় সেখানে পাওয়া গেল না। জেনারেল ফরমান, মিঃ কেলীকে জানান, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'আলটিমেটাম' গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা তার আছে। তবে, তিনি জানান, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান আর্মিকে তা জানাতে পারেন নি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগের সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জন কেলী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। কর্নেল গফুর তাঁকে জানান, পাকিস্তানী আর্মি খুব সম্ভবত ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে পারে নি।

এদিকে, গভর্নর হাউজে রকেট শেলিং-এর মধ্যে ডাঃ মালিক তাঁর কেবিনেটের এগারো জন মন্ত্রীসহ ১৪ ডিসেম্বর ইস্তফা দিয়ে বসেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঐ দিনই ডাঃ মালিক ও জেনারেল নিয়াজীকেও আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাঠান। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সপরিবারে আশ্রয় নেয়া ডাঃ মালিক জেনারেল নিয়াজীকে তা জানাতে পারেন নি।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী আর্মির শেষ দিনগুলো সম্পর্কে নিউ ইয়র্কে ইউএন হেডকোয়ার্টারে পাঠানো প্রতিবেদনে জন কেলী জানান, ডাঃ মালিক তাঁর পরিবারকে ১৪ ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের নিউট্রাল জোন-এ সরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ডাঃ মালিক নিজে পদত্যাগের ব্যাপারে এবং নিউট্রাল জোনে আশ্রয় গ্রহণে অত আগ্রহী ছিলেন না। ১৪ ডিসেম্বর সকালে তাঁর অনুরোধে গভর্নর হাউজে উপস্থিত হলে জন কেলী ও পিটার হুইলারকে ডাঃ মালিক বলেছিলেন, পাক সেনাবাহিনীর এমন এক সঙ্গিন অবস্থায় তাঁর পদত্যাগ ইতিহাসের দৃষ্টিতে পলায়নের মতোই মনে হবে।

জন কেলী ও পিটার হুইলার যখন গভর্নর হাউজে উপস্থিত হন ডাঃ মালিক তখন কেবিনেট মিটিং-এ ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি মন্ত্রিসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাদেরকে এডিসি'র কামরায় নিয়ে বসেন।

ডাঃ মালিক তাঁর সাথে বিশেষভাবে পরিচিত জন কেলীর কাছে ব্যক্তিগত পরামর্শ কামনা করেন। ঐ সময় গভর্নর হাউজের ওপর বিমান হামলা শুরু হয়। জন কেলী বলেন, 'প্রথম আঘাতেই বিল্ডিংটা কেঁপে ওঠে এবং আমি ও পিটার হুইলার খুব তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে কয়েক গজ দূরে কয়েকটি গাড়ির নিচে আশ্রয় নিই। মিগগুলো প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আক্রমণ চালাতে থাকে। আক্রমণের ফাঁকে আমি ও হুইলার গজ বিশেক দূরে প্রায় ভরে ওঠা এক খন্দে কিছু সৈন্যের সাথে আশ্রয় নিলাম।'

এই লোমহর্ষক অবস্থার মাঝেও মিঃ কেলী তাঁর হ্যান্ডসেটে ঘটনার ধারাভাষ্য দিয়ে চলে ছিলেন নটরডেম কলেজে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ইউএন লোকেশান হেডকোয়ার্টারে। কাছাকাছি আশ্রয় নেয়া জেনারেল ফরমান আলী ও তখনকার চীফ সেক্রেটারি মুজাফফর হুসেইনের উদ্দেশ্যে বরাভয়-জ্ঞাপক দু'একটি শব্দও উচ্চারণ করেছিলেন তিনি।

গভর্নর হাউজের ওপর পর্যায়ক্রমিক এই আক্রমণের পর মিঃ কেলী ও হুইলার

ইউএন লোকেশান হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে ঢাকায় তখনকার ইউএন চীফ পল মার্ক হেনরীকে তিনি বিষয়টা অবহিত করেন। সেখানে লন্ডনের 'দি অবজারভার'-এর গ্যাবিন ইয়াং-এর সাথে মিঃ কেলীর দেখা হয়। মিঃ গ্যাবিনের অনুরোধে কেলী তাঁর গাড়িতে করে আবারও গভর্নর হাউজে যান। গ্যাবিন তাঁকে বলেছিলেন, এক ঘন্টার মধ্যে অন্তত গভর্নর হাউজের ওপর কোন আক্রমণ হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর সে ধারণা পরে একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়।

গভর্নর হাউজে তাদের এসকর্ট করে একটি বাংকারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাঃ মালিক ও তার পুরো কেবিনেট তাঁদের ধরে বসেন, যে বার্তা তারা বহন করছেন তা যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানানো হয়। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ডাঃ মালিকের স্বল্পায়ু মন্ত্রিসভার বিদায় ঘটে। ডাঃ মালিক ও তাঁর মন্ত্রীরা কেলীর গাড়ীতে লিফ্ট চেয়েছিলেন যেন নিউট্রাল জোন-এ তাঁদের পৌঁছে দেয়া হয়। তাদের জানানো হয় যে নিজেদের গাড়িতে করেই তাঁদের সেখানে যেতে হবে।

কেলী ও গ্যাবিন ইয়াং ইউএন লোকেশান হেডকোয়ার্টারে এসে পুরো ঘটনা পল মার্ক হেনরীকে জানান। যা হোক ডাঃ মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁদের পরিবারসহ সেদিন দুপুরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ঠিকমত পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

পরদিন, ১৫ ডিসেম্বর, খুব দ্রুত সব ঘটে যায়। ডাঃ মালিক হোটেলে কেলীর রুমে গিয়ে জানান, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এক জরুরী তার পেয়েছেন। গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজী, দু'জনের কাছেই এই তার পাঠানো হয়। আগের দিন দুপুরে পদত্যাগ ও ইন্টারকন্টিনেন্টালের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ডাঃ মালিক এই তারবার্তা পান।

ডাঃ মালিক জানান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশ জেনারেল নিয়াজীকে তিনি জানাতে পারেন নি। জেনারেলের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়নি। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সদ্য-প্রাক্তন গভর্নর কেলীর সহায়তা কামনা করেন।

কেলী অতঃপর ডাঃ মালিক ও পাকিস্তানী আর্মির লিয়াজোঁ অফিসার কর্নেল গফুরকে সাথে নিয়ে তাঁর কামরায় যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা জেনারেল নিয়াজীকে টেলিফোন করেন।

জন কেলী তাঁর রিপোর্টে বলেন, ডাঃ মালিক জেনারেল নিয়াজীর কাছে জানতে চান প্রেসিডেন্টের নির্দেশমত তিনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। ঈস্টার্ন কমান্ড চীফ নিয়াজী ব্যাপারটা ডাঃ মালিকের সাথে আলোচনার জন্য তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে যেতে

অনুরোধ করেন।

কেলী বলেন, আমি তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে না যাওয়ার পরামর্শ দিই, কারণ তখন নিউট্রাল জোনের প্রোটেকশন তাঁর থাকবে না, আমি বরং তাঁকে বলি- আপনি নিয়াজীকেই হোটেলে ডাকুন।

ডাঃ মালিক কেলীর পরামর্শ মত কাজ করেন, কিন্তু নিয়াজী হোটেলে আসতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, আমি জেনারেল ফরমানকে পাঠাচ্ছি। গভর্নর-এর উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী খান ছিলেন তখন আসল শক্তিধর ব্যক্তি।

জেনারেল ফরমান ঠিক সময়ে হোটেলে আসেন এবং ডাঃ মালিক, কর্নেল গফুর ও মিঃ কেলীর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

মিটিং-এর আলোচনা অনুসারে একটি অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব-এর খসড়া করা হয়। এই প্রস্তাবে জেনারেল নিয়াজী সম্মত হলেও ইসলামাবাদ তা প্রত্যাখ্যান করে।

প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল যে- (ক) অবিলম্বে অস্ত্রবিরতি কার্যকর করা ও পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সকল বিরুদ্ধতার অবসান ঘটানো ও (খ) চারটি মার্কিন গ্যারান্টির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন হস্তান্তরিত হবে। সেগুলো হচ্ছে-(১) পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা, (২) পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা, (৩) অবাঙালি জনগণকে রক্ষা ও (৪) ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে যারা পাকিস্তানের স্বার্থে ভূমিকা রেখেছে ও পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকা।

জেনারেল ফরমান যখন মিঃ কেলীকে জিজ্ঞেস করলেন- জেনারেল নিয়াজীর সম্মতির পরও এ প্রস্তাবে ইসলামাবাদের অনুমোদন লাগবে কিনা, তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছিলেন। মিঃ কেলী স্মরণ করেন যে এক সপ্তাহ আগে দেয়া অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগাশাহী নাকচ করে দিয়েছিলেন। ঠিক হলো, নিয়াজীর সম্মতির পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবগুলো ইসলামাবাদের কাছে পেশ করা হবে। জেনারেল ফরমান প্রস্তাবগুলো নিয়ে হোটেল ত্যাগ করলেন এবং ডাঃ মালিকও মিঃ কেলীকে এ ব্যাপারে অগ্রগতি জানাতে আসবেন বলে কথা দিলেন।

১৫ ডিসেম্বর বিকেলে হোটেলে ফিরে তিনি জানান, ইসলামাবাদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, নিয়াজীর অ্যাপ্রুভালের পরও। ট্রান্সফার অব এডমিনিস্ট্রেশান বলতে বাংলাদেশের কাছে ট্রান্সফার অব পাওয়ার'ই বোঝানো হবে— ইসলামাবাদ তেমন ভাবতে প্রস্তুত ছিল না।

পাকিস্তানের একগুঁয়েমির মুখে এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল ১৫ ডিসেম্বরের অস্ত্রবিরতি প্রস্তাবও। এই একগুঁয়েমির পিঠে, পরদিন ১৬ ডিসেম্বর ইতিহাস দেখলো সাবেক

পূর্ব পাকিস্তানে পাক-বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং নতুন জাতির অভ্যুদয় ও বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ।

(১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান আর্মির সারেন্ডারের ওপর-প্রাথমিক তথ্যনির্ভর এই প্রতিবেদন ঠিক এক বছর পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশ অবজারভার-এ প্রকাশিত হয়, তখন লেখক ছিলেন সে পত্রিকার চীফ রিপোর্টার, এ নিবন্ধটি ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন রণজিৎ কুমার বিশ্বাস)।

চার

স্থানঃ ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা। সময়ঃ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। আকাশপথে ঢাকা থেকে পরাজিত পাক-সেনাপতি লেঃ জেঃ নিয়াজি, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও রিয়ার এডমিরাল শরীফকে নিয়ে আসা হলো যুদ্ধবন্দী হিসেবে। ওদের সাথে এলেন মেজর সিদ্দিক সালেক।

পূর্ব পাকিস্তানে আন্তঃ সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালেক রণক্ষেত্র থেকে গোপন আলোচনা সভায় ছিলেন নিয়াজির নিত্যসহচর। সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী প্রাক্তন সাংবাদিক সালেকের পক্ষেই তাই Witness to Surrender -এর মত গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

পরাজয় বরণ করার জন্য নিয়াজির কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। পাকিস্তানের এই দুর্গতির জন্য তিনি ইয়াহিয়াকে এককভাবে দায়ী করেন। কলকাতা পৌছার পর পরই সালেক তার 'বস্'-এর সাথে কথোপকথনে জানতে চান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সম্বন্ধে তার মতামত।

নিয়াজির সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সালেক তাঁর কথাবার্তায় খিস্তিখেউড় আসতো বলে মন্তব্য করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সালেক লিখেছেন, সেদিন বিকালে ভারতীয় অগ্রগামী সামরিক দলের প্রধান জেনারেল নাগরার সাথে সাক্ষাৎকালে নিয়াজি যেসব ডার্টি জোক বলেন, তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

চারদিক থেকে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা। নিয়াজি গেলেন এক সামরিক স্থাপনায়। ওখানে আহত পাকিস্তানী সৈন্যদের সেবায় নিয়োজিত আটজন পাকিস্তানী নার্স ঢাকার আসন্ন পতনের আশংকা করে ও

মুক্তিবাহিনীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানালে, নিয়াজি বললেন, মুক্তিদের হাতে পড়ার আগেই আমরা তোমাদের শেষ করে দেবো।

নিয়াজি সাহেব তার আত্মসমর্পণের আগের দিন রাতে ৪র্থ এভিয়েশন স্কোয়াড্রনের প্রধান লেঃ কর্নেল বোখারীকে আটজন নার্স ও আটাশটি পাকিস্তানী পরিবারকে বার্মার আকিয়াবে বিমানপথে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আহত মেজর জেনারেল রহিম খান ও আরো কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে দু'টি হেলিকপ্টার উড়ে গেল আকিয়াবে। কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত নার্সদের নিয়ে যাওয়া হল না। কারণ, ওদের নাকি 'সময়মত হোস্টেল থেকে আনা সম্ভব হয়নি'। সালেকের এ বর্ণনার মধ্যে রয়েছে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহের প্রকাশ। সাদেকের সন্দেহটা অযৌক্তিক নয়। নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের সময় পাক বাহিনীর হাতে তিনি এ দেশের অগণিত মহিলার সম্ভ্রমহানির ঘটনা দেখেছেন।

১৬ ডিসেম্বর বিকালে নিয়াজি ঢাকা বিমানবন্দরে যান লেঃ জেঃ জগজিৎ সিংহ অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে। অরোরা হেলিকপ্টারে করে সস্ত্রীক এসেছেন ঢাকায়। নিয়াজি অরোরাকে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট দিয়ে করমর্দন করলেন। সালেকের ভাষায় সে এক করুণ দৃশ্য। দুই ব্যক্তিত্ব— বিজয়ী ও বিজেতা, লাখ লাখ লোকের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, একজন পাচ্ছেন জনতার অভিনন্দন, অন্যজন ঘৃণা।

যে নগণ্য সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য ঢাকায় ছিল তা দিয়ে আরো কয়েকদিন যুদ্ধ চালানো যেতো— সালেকের এ মন্তব্যের জবাবে, নিয়াজির উত্তর, আমি ৯০ হাজার বিধবা না নিয়ে ৯০ হাজার সৈন্যকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছি। ৯০ হাজার বিধবার সাথে যোগ হতো আরো পাঁচ লাখ এতিম সন্তান, নিয়াজির উক্তি। তাছাড়া ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তূপ জমে উঠতো, সমস্ত নাগরিক সুবিধাদি হত ধুলিসাৎ, দেখা দিত প্লেগ ও অন্যান্য রোগ, নিজের বক্তব্যের পক্ষে বললেন নিয়াজি।

এত বড় ত্যাগ করে কোন লাভ হত না, ফলাফল হত একই, পরাজিত সেনাধ্যক্ষের নির্লিপ্ত জবাব।

ক্ষোভে ও অনুতাপের সাথে সিদ্দিক সালেক লিখলেন, ও রকম অবস্থান নিলে পাক সৈন্য বাহিনী ইতিহাসে অন্যভাবে স্থান পেত।

ভারতীয় বাহিনীর ঢাকা প্রবেশের কথা বলতে গিয়ে সালেক লিখেছেন, সন্ত্রস্ত অবাঙালিদের জানমাল রক্ষা করার সময় ভারতীয় সৈন্যদের ছিল না। তারা তখন ব্যস্ত ছিল, ট্রেন ও ট্রাকের বহরে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমরাস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, ফ্রিজ, কার্পেট ও টেলিভিশন সেটসমূহ স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার

ব্যাপারে। সালেকের মতে বাংলাদেশের রক্ত শুষে নিয়ে ভারতীয়রা রেখে গেল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি কংকাল।

দুঃখের বিষয় সালেক সাহেব তার আগে ২৪টি বছর বাংলাদেশকে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান শোষণ করেছে তার সঠিক বিবরণ দেননি। তবে তাঁর কিতাবের দুই এক জায়গায় তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ন্যায় বিচার করা হয়নি।

সালেক সদালাপী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যখন আমাদের সাথে (২৫ মার্চ, '৭১-এর নারকীয় ঘটনা শুরু হওয়ার আগে) অবজারভার হাউজে দেখা করতে আসতেন, তখন আমরা যদ্দূর সম্ভব সতর্কতার সাথে তাঁর সাথে আলাপ করতাম। ২৫ মার্চের পর তাঁর আচরণে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন।

একদিকে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী যখন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত তখন প্রবল পরাক্রমশালী ইয়াহিয়া খান মত্ত ছিলেন তার বিভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা পূরণ নিয়ে। অতি কাছের লোকও ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎ পেত না। ইয়াহিয়াকে কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছিলেন ঐ নয় মাসের মধ্যে একবার ঢাকা যেতে। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। ইয়াহিয়া বরং করাচিতে সেই 'কুত্তি'র কাছে যেতেই পছন্দ করতেন, বলেছেন তাঁর নিকটের এক পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা।

ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্য ডঃ জি ডব্লিউ চৌধুরী খুব কাছ থেকে ঐ সময় দেখেছেন ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া খান ধূর্ততার সঙ্গেই আইয়ুবকে ক্ষমতা তাঁর কাছে হস্তান্তরে বাধ্য করেন। দশ বছরের অধিককাল ক্ষমতায় থাকায় ও অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ কাজের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে তা নিরসনের লক্ষ্য নিয়ে ইয়াহিয়া আইয়ুবের অনুসৃত নীতির বদলে আপাতদৃষ্টিতে গ্রো-পিপল কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বাজিমাৎ করার চেষ্টা চালান। ইয়াহিয়ার আর একটি লক্ষ্য ছিল, আইয়ুবের বশংবদ লোকদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া। তবে ডঃ জি ডব্লিউ চৌধুরী ছিলেন ব্যতিক্রম। আইয়ুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে নিয়ে যান তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে। পলিটিক্যাল সাইনস্টিট ডঃ চৌধুরীকে নিয়োগ করে আইয়ুব চেয়েছিলেন তার ভরাডুবি থেকে বাঁচার উপায় বের করতে। কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ছাব্বিশ বছর আগের কথা হুবহু মনে রাখা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু কিছু লোক আছেন তাঁদের স্মরণশক্তি প্রখর। বিশেষ কোন ঘটনার সাথে সেই সব ব্যক্তির যদি ব্যক্তিগত যোগাযোগ থেকে থাকে তাহলে সে সব ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জীবনভর মনে থাকবে তাঁদের। পরে বলবো কেন আজ লিখছি এতদিন আগের ঘটনা।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে চলছে তুলকালাম কাণ্ড। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ বিদ্রোহে রূপ নিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। অনেক আগে থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে করে তুললো আরো প্রতিবাদী। ধীরে ধীরে প্রতিবাদ রূপ নিতে শুরু করলো গণঅভ্যুত্থানে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান। দু'নম্বর আসামী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তিন নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি ইুয়ার্ড মুজিব।

১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে বীর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে। পাকিস্তান নেভীর অতি সামান্য পদে চাকরিরত অসীম সাহসী বীর ইুয়ার্ড মুজিব নিহত হন মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সহকর্মীদের হাতেই দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর। ইুয়ার্ড মুজিবের অপরাধ তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কতিপয় ব্যক্তির নিরীহ লোকদের ওপর জোরজুলুম ও অপকর্মের প্রতিবাদ

করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিলো সোচ্চার। আমরা কেউ আজ আর শুনিনা ইুয়ার্ড মুজিবের নাম। অতি সাধারণ লোকটির চেহারা আবছা আবছা মনে পড়ে। পদে ছোট হলেও মনে ইুয়ার্ড মুজিব ছিলেন অনেক বড়। পাকিস্তানীদের মতে উনি ছিলেন খুব সাহসী সংগঠক। তাঁর বিরুদ্ধে যদ্দুর মনে পড়ে অভিযোগের ফিরিস্তি ছিলো বিরাট বড়।

ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের দু'জন তো ছিলো আমার অতি ঘনিষ্ঠ। একজন আমার স্কুলের সাথী ও একই স্কাউট টিমের টীম লিডার সার্জেন্ট জহুরুল হক। অন্যজন নেভীর লেফটেন্যান্ট রউফ। সুধী মহলে ডঃ জনসন নামে পরিচিত মরহুম আতাউর রহমান খান সাহেবের ছোট ভাই শামসুর রহমান খান, সিএসপি। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি যিনি সব সময় বন্দীদশায়ও তার স্বভাবসুলভ হাস্যরস বজায় রেখেছিলেন। অপর দু'জন সিএসপি অফিসার ফজলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুসের মুখে কখনো হাসি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত সেই বিশেষ আদালতে তাঁদের বিমর্ষ মুখের কথাই মনে পড়ে। প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী ফজলুর রহমান সাহেব চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা। আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতারের সময় রুহুল কুদ্দুস ছিলেন চাকরিতে নিয়োজিত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়াত রুহুল কুদ্দুস সাহেব হন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। স্বাধীন বাংলাদেশ চীফ সেক্রেটারির পদ তখন বিলুপ্ত। পরে শামসুর রহমান নিযুক্ত হন ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার। ফজলুর রহমান ফিরে যান তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে। স্বাধীনতার পর শ্রমিক নেতা মরহুম আবদুল মান্নান গঠিত 'লাল বাহিনী'র হাতে অন্য অনেক বিত্তবান ব্যবসায়ীদের মত ফজলুর রহমান সাহেবকেও লাঞ্ছিত হতে হয়। যদ্দুর মনে পড়ে পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কারারুদ্ধ হন শ্রমিক নেতা মান্নান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী লেঃ রউফ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কোন এক এনজিওতে কাজ করছেন উচ্চ পদে। পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা তাঁর সংস্থার উদ্দেশ্য হলেও রউফ নিজে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে তেমন কোন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেননি। রসিক রউফকে তার সন্তান সংখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলাম এক অনুষ্ঠানে। পাশে দন্ডায়মান তাঁর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রউফ বললো, আমার কোন দোষ নেই— উনাকেই জিজ্ঞেস করুন।

মনে পড়লো নয় সন্তানের জনক রোমান ক্যাথলিক জনাথনের গল্প। স্ত্রীর দশম সন্তান প্রসবের পর ডাক্তার জনাথনকে বললো, এবার থামুন। আর নয়। জনাথন সরলভাবে জানালো সবই ঈশ্বরের দান। ডাক্তারের জবাব, ঈশ্বর বৃষ্টি দেন ঠিকই,

কিন্তু বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য রয়েছে রেইন কোট।

উনসত্তর সালের কথায় ফিরে যাই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন না হলে যেমন বাংলার জনগণ সচেতন হতো না তাদের অধিকার সম্বন্ধে। তেমনি উনসত্তর-এর গণঅভ্যুত্থান না হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ উপ্ত হতো না এ দেশের মানুষের মনে। এ কথা আমি আগেও লিখেছি, কোন পত্রিকার একজন রিপোর্টারের পক্ষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিনের পর দিন কভার করা সম্ভব ছিল না। অত্যন্ত কঠিন ছিলো সে কাজ। সামান্য ভুলের জন্য দণ্ডিত হওয়ার ভয় ছিলো পত্রিকা ও তার রিপোর্টারের। মামলা চলার শেষ পর্যায়ে আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো বিশেষ আদালতে যাওয়ার। এর মধ্যে ভয় যেমন ছিলো তেমনি ছিলো থ্রিল। সুরক্ষিত দুর্গে ঢুকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া এবং তা সর্বসম্মুখে প্রকাশ করা কম গৌরবের কথা নয়। দিনের পর দিন আদালতে যাওয়ার ফলে প্রত্যেক অভিযুক্তদের আচার আচরণ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে গেছে।

আদালতের বিরতির সময় কথা হতো অভিযুক্তদের অনেকের সাথে। ১৯৬৯-র ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একদিন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, শোনো, হুজুরকে একটা কথা বলতে পারবা? হুজুর মানে মওলানা ভাসানী। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম পরবর্তী বক্তব্যের জন্য। শেখ সাহেব বললেন, হুজুরকে আমার মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়ে আন্দোলন করতে বলো। বিনয়ের সাথে বললাম, আমার কথা কি উনি শুনবেন। একটু উষ্মার সাথে শেখ সাহেব বললেন, যা বলি তা করবার পারবা কিনা। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। হ্যাঁ, উনাকে আরো বলো, এই মামলা থেকে বেরিয়ে এলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে উনাকে সাথে নিয়েই তো আন্দোলন করতে হবে। এ কথা শোনার পর মনের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনা দুটোই কাজ করতে শুরু করলো। প্রেসক্লাবে ফিরে কথাটা আমার সহকর্মী আতাউস সামাদ ও এনায়েতউল্লাহ খানকে বললাম। সাংবাদিক-কাম-রাজনীতিবিদ্ সিরাজুল হোসেন খান ছিলেন তখন মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠ লোক। তাঁর মারফত শেখ সাহেবের আর্জি পৌঁছে গেলো মওলানার ভাসানীর কাছে। একটি কথা এখানে বলা দরকার। মওলানা ভাসানীর কাছে শেখ সাহেবের আর্জি পৌঁছাবার কথা যখন তিনি (শেখ সাহেব) আমাকে বললেন, তখন আমি জানালাম মওলানা সাহেব তো ইতোমধ্যে মিথ্যা আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি করে বিবৃতি দিয়েছেন। মধ্যপথে আমাকে থামিয়ে শেখ সাহেব বললেন, আমি বলছি আমার নাম করে যেন বিবৃতি দেন। মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

এর মধ্যে আমি গেলাম পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক আমার প্রয়াত ভায়রা প্রফেসর জালাল উদ্দিনের বাসায়। ওখানে আমার দু'ছেলেসহ স্ত্রী বেড়াতে

গিয়েছিলেন। পাবনায় বসে শুনলাম সার্জেন্ট জহুরকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দীদশায় হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতারের খবর জহুর নাকি বন্দীদশা থেকে পালাতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর সাহসী পাহারাদারদের গুলিতে নিহত হয়। মনে পড়লো তার দিন কয়েক আগে জহুরের সাথে আদালতে স্কুল জীবনের কিছু স্মৃতি নিয়ে কথা হয়েছে। জহুর হাসতো মন খুলে, কথা বলতো উচ্চস্বরে। বেপরোয়া ও সাহসী বলে বন্ধু মহলে ওর খ্যাতি ছিলো।

স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বহারা দলের নেতা সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর খবরটি টেলিপ্রিন্টারে দেখে জহুরুল হকের কথা মনে পড়লো। সিরাজ শিকদারও বন্দী অবস্থায় পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এই ছিলো সরকারি ভাষ্য। এর অন্য ভাষ্য থাকলেও সেদিন লেখা সম্ভব ছিলো না। পাবনা থেকে দুপুরে ঢাকার পথে রওনা হয়ে মানিকগঞ্জ ফেরিঘাটে আমাদের বাস পৌঁছলো সন্ধ্যার পর। ঢাকা থেকে আগত যাত্রীরা বললো, ঢাকায় ভয়ানক গণ্ডগোল হচ্ছে। মওলানা ভাসানীর সভা থেকে মিছিল করে মানুষ রওনা দেয় ক্যান্টনমেন্টের দিকে শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের ছিনিয়ে আনার জন্য। মিছিল রেসকোর্সের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দক্ষিণ পূর্ব কোণ পার হওয়ার পর পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষিপ্ত মিছিলকারীরা আগরতলা মামলা পরিচালনার জন্য গঠিত আদালতের প্রধান বিচারকের বাড়িতে ও তৎসংলগ্ন চট্টগ্রামের অধিবাসী মন্ত্রী সুলতান আহমদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মামলার নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই সময় পশ্চিম পাকিস্তানী বিচারপতি আবদুর রহমান বাড়িতে ছিলেন না।

এর কয়েকদিন পরই প্রবল প্রতাপান্বিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেন ও শেখ সাহেবসহ মামলায় অভিযুক্তদের মুক্ত করার ফরমান জারি করেন। এই মুক্তির একটা শর্ত শেখ সাহেব আইয়ুব আহূত পিন্ডিতে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেবেন। এবং এ ঘোষণা পাকিস্তান বেতার থেকে দেয়া হয়।

এই ঘোষণায় মওলানা সাহেবের খুশী হওয়ার কোন কারণ ছিলো না। তিনি তখন ন্যাপ নেতা সাইদুল হাসান সাহেবের বাড়িতে তাঁর দলীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা নিয়ে ব্যস্ত। আলোচ্য বিষয়— এ অবস্থায় তাঁর দলের ভূমিকা কি হবে।

আমি ও আতাউস সামাদ বিব্রত বোধ করলাম। কারণ আমাদের খবরের ভিত্তিতে ও শেখ সাহেবের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রেখে মওলানা যে আন্দোলন করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ করলেন, তা কার্যকর হচ্ছে না। আমাদের বিশ্বাস ছিলো মুক্তির পর শেখ সাহেব মওলানা সাহেবের সাথে প্রথমে কথা

বলবেন। কিন্তু শেখ সাহেবের মুক্তির পর তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাড়িতে মানুষের ঢল নামলো। সাইদুল হাসান সাহেবের বাড়ি থেকে বারবার ফোন করে কোন কাজ হয়নি দেখে আমি ও সামাদ ছুটলাম ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে এবং শেখ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা হুজুরকে নিয়ে যাও পুরনো ঢাকার অমুক বাড়িতে, আমি যাবো সেখানে। আমরা জানালাম মওলানা সাহেব দলীয় সভা করছেন সাইদ ভাইয়ের বাসায়। উনি কি যাবেন অন্য জায়গায়? আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে শেখ সাহেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি সাইদ ভাইয়ের বাসায়। শেখ সাহেব তাঁর কথা রেখেছেন। ঘন্টাখানেক বাদে উনি যান ইস্কাটনে সাইদুল হাসানের বাসায় আর মওলানা সাহেবের সাথে একান্তে কথা বলেন। মওলানা ভাসানী পিন্ডিতে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে শেখ সাহেবের যাওয়া সমর্থন করতে পারলেন না। এর আগে প্যারোলে শেখ সাহেবের পিন্ডি যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর জন্য পুরনো বিমান বন্দরে প্রস্তুত ছিলো বিমান। তাজউদ্দিন সাহেব ও বেগম মুজিব-এর তীব্র বিরোধিতার ফলে ও জনগণের মধ্যে ভিন্ন মত থাকায় প্যারোলে শেখ সাহেবের পিন্ডি যাওয়া হলো না। এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মরহুম জহির উদ্দিন ও একজন প্রখ্যাত সম্পাদকের বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

যা হোক শেখ সাহেব পিন্ডি গেলেন ও গোলটেবিল বৈঠক থেকে উঠে চলে এলেন। ঢাকায় ফিরে নিজ বাসায় সাংবাদিকদেরকে বললেন, বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনীতিবিদ, যারা বৈঠকে গিয়েছিলো, তারা বাংলার স্বার্থের বিরোধী, অতএব তাদের এ দেশের রাজনীতি থেকে বিদায় নেয়া উচিত। এর মধ্যে তিনি বয়োবৃদ্ধ, তাঁর এক সময়ের নেতা মওলানা ভাসানীকেও রাজনীতি থেকে অবসর নিতে পরামর্শ দিলেন। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম ওখানে তারা বুঝতে পারলাম না মওলানা ভাসানী কি করে অন্য রাজনীতিবিদদের কাতারে পড়েন।

সাংবাদিকতায় আমার গুরু মুসা ভাই। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় মওলানা ভাসানী ও মুজিব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন শেখ সাহেব আতাউস সামাদের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করার জন্য। আতাউস সামাদ ও আমি একই সাথে অবজারভারে ছিলাম এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতাম। ভাই মুসা (এবিএম মুসা) ভাই তাঁর সুলিখিত নিবন্ধে দুই বিশিষ্ট নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার সময় আমার বদলে তাঁর খবরের সূত্র হিসেবে সামাদের নাম উল্লেখ করে থাকবেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির আর একটা ঘটনার কথা বলে আজকের বয়ান শেষ করবো। মানিকগঞ্জ থেকে কল্যাণপুর বিআরটিসি ডিপো পৌঁছার পর ঢাকার আরো ভয়াবহ খবর শুনলাম। জানতে পারলাম, ঢাকায় কারফিউ। অনেক কষ্টে অবজারভার অফিসে খবর পৌঁছালাম, আমি সপরিবারে কল্যাণপুরে আটকে পড়েছি। আমার সহকর্মীরা, তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব সালাহউদ্দিন সাহেবকে আমার অবস্থানের কথা জানিয়ে ও অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করলাম। এ সময় বিআরটিসির এক শ্রমিক নেতা বললেন, আপনাদের অসুবিধে না হলে আমাদের মেসের একটা রুম আপনার পরিবারের জন্য দিতে পারি। যদি আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন তা হলে খুশি হবো। এ রকম আন্তরিক আমন্ত্রণ কি প্রত্যাখ্যান করা যায়! আর এ রকম অবস্থায় কে কাকে এভাবে সাহায্য করে। কোন মতে রাত কাটালাম শ্রমিক ভাইদের অতিথি হিসেবে। সকালে শুনলাম যে রাতে আমাদের জন্য ঢাকা থেকে একটা গাড়ি এসে ফিরে গেছে।

বিআরটিসি'র শ্রমিক ভাইটির নাম আজ মনে নেই। এদের মত অসংখ্য শ্রমিক কৃষকের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কবে আমরা হাসি দেখতে পাবো এ জিজ্ঞাসা সকল সচেতন নাগরিকের।

অধ্যক্ষ হাসান তারেক

গণভবনের চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। সামনে খোলা ফাইল। কিন্তু মনোযোগ নেই। ফাইলে-এ রয়েছে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া ফোনালাপের আড়িপাতা রেকর্ড। তার পাশে ইলেকট্রনিক্সের একটি বোর্ডে রয়েছে কিছু সুইচ। সেগুলোর সঙ্গে ইথারনেট ক্যাবল দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে একটি ল্যাপটপ। ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে ফোনালাপের রেকর্ড। এই সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। তিনি বুয়েটের ইলেকট্রনিক্স বিভাগের অধ্যাপক। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তাঁর সহায়তায় ফোনালাপ আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি ছিলেন ফোনালাপ আড়িপাতার প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর নির্দেশেই ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এই কাজটি করেছিলেন। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়টি তিনি কখনোই গোপন করতে চাননি। তিনি বলেছেন, ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে। তিনি বলেছেন, ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে। তিনি বলেছেন, ফোনালাপ আড়িপাতার বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে।

হয়ে যেতে পারে না। তাই তাদের, অপরাধের ধরণের, মডুস অপারেন্ডি নিয়মিত হালনাগাদ করে যেতে হয়, চাহিদাসম্পন্ন পরিষেবা হালনাগাদ রাখতে হয়।

কথাটি একেবারে মিথ্যা নয়। একুশের সংকলনের সাধারণ সম্পাদক ও একুশ পদকপ্রাপ্ত হাসান হাফিজুর রহমানকে সাহায্যের পুরস্কার দেয়া হলো ৫ লাখ টাকা এক সংবর্ধনার সংবাদ পত্রে ছাপা হয়েছে।

পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রধান হাসান হাফিজুর রহমানের স্ত্রী। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় বাংলা একাডেমীতে।

হাসান হাফিজুর রহমানের পরিবারের লোকজন আপনি-এর (যার নাম নয়) কাছাকাছি পুরো বসা বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মোট ৫০ জনের সভায় একজন বিশেষ তাদিনজনের আয়োজন নিয়েছেন ইতিহাস সংরক্ষণ রাখেন।

নিজ তাদিনজ তাঁর পরিচিতির সংক্ষিপ্ত তাঁর নামে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে উল্লেখিত প্রশংসা করেন। তবে হাসান হাফিজুর রহমানের সাথে তাঁর যেমন পরিচয়তা ছিলো না সাথে তিনি অনেকদিন তা উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা।

বাংলাদেশ বর্তমানের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিল্পীর সাথে ছিলো হাসান হাফিজুর রহমানের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আত্মজনের প্রথাগত অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের উল্লেখ ও প্রচার ঘটে। হাসান হাফিজুর রহমানের একান্ত প্রতিবেশী কবি শামসুর রহমান, নৈয়ান শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, রোজান ইকবাল খান আবদুল্লাহ, মুনতাসা রশিদ, কবীর শাহাবুদ্দিন ও রেজাউল চৌধুরী এদের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া তাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের মধ্যেও হাসান হাফিজুর রহমানের আত্মজনের অসংখ্য প্রশংসাকারী। এদের বেশির ভাগই হাসান ভাই-এর কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। মৃত্যুর আগের উল্লেখিত জেল বাকিদের এই অনুষ্ঠানে দেখলাম না। এমনও হতে পারে তাদের কেউ কেউ এ অনুষ্ঠান বাকিরা নিয়ে টি.এসসিতে কবি শামসুর রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। দুটি অনুষ্ঠান একই দিন একই সময় করার 'দুর্ভাগ্য' যে কি তা আমার বোধগম্য নয়। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অবশ্য বহু সাধ্যসাধনা পরিচালনা করেছিলো, কিন্তু এত কম সময়ে কেন হলো তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বাংলা একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের কর্তা ব্যক্তিদের উপস্থিতি হলে তাঁর অভিযোগটির অন্তত আংশিক পূর্ণ হতো। অনুষ্ঠানস্থলে সমানা জনসমাগম হওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। নাম্বা না থেকে আজ মেটে পড়লেন এক বিশেষ ব্যক্তি। তিনি শামসুর রহমানের সংবর্ধনা সভায় তাঁকে ভাষণ দিতে হবে।

হাসান হাফিজুর রহমানের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানশেষে মিসেস হাসান হাফিজুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, আজকাল সাহিত্য আসরে একজন কবি সাহিত্যিকের কর্মের ওপর আলোচনা না হয়ে গুরুত্ব পায় রাজনৈতিক বক্তব্য। সে জন্য আমি ওরকম অনুষ্ঠানে যাই না, এবং সাথে যোগ করলেন, কেই বা আমাকে ডাকে! হাসানকে যারা মনে রাখে না, আমাকে কি করে মনে করবে তারা? হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেও ভাবী তার মনের দুঃখ গোপন করতে পারলেন না। আমার একটি বইতে হাসান ভাই সম্বন্ধে একটা লেখা ছিলো। বইটির এক কপি পেয়ে তিনি যত না খুশী হয়েছেন, আমি হয়েছি তার চেয়ে বেশি। করুণ হাসি হেসে ভাবী বললেন, আজ আপনাদের অনেককে দেখবো মনে করেছিলাম, কিন্তু সবাইতো এলো না। হাসানের বন্ধুদের দেখলে ভালো লাগে, করুণস্বরে উচ্চারণ করলেন ভাবী। পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থা ও বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাদের প্রশংসা করে ভাবী বললেন, তবুওতো ওরা হাসানকে সম্মান দেখিয়েছে। মখমলের ওপর লিখিত প্রশংসাপত্র হাতে রাজরাণীর মত হাসান ভাবী বাংলা একাডেমীর গাড়িতে গিয়ে বসলেন। গন্তব্যস্থল পুরনো ডিএইচএস-এর অর্ধসমাপ্ত শেওলা-পড়া নির্জন বাড়ি।

ঢাকায় কিছু কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী প্রতি বছর ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। এবং তার প্রচারও হয় প্রচুর পরিমাণে। সেদিনের শামসুর রাহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রচার শুধু সংবাদপত্রে নয়, টিভির নিউজেও হয়েছিলো। অথচ হাসান হাফিজুর রহমানের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিলো গুরুত্বহীনভাবে দু'একটি তুলানামূলকভাবে কম প্রচারিত সংবাদপত্রে।

সাহিত্য রাজনীতি বিবর্জিত হবে এ কথা কেউ বলবে না। কিন্তু যেখানে সাহিত্যের আসর হয়ে পড়ে রাজনৈতিক মঞ্চ তখন স্বভাবতই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

সাহিত্যই ছিলো হাসান হাফিজুর রহমানের সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের বাহন। তিনি ছিলেন মূলত কলম-সৈনিক। তার ক্ষুরধার কলমের মাধ্যমে সমাজ ও জাতিকে সজাগ করার প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান ছিলো অপরিসীম। নিরপরাধ হয়েও তাঁকে চাকরিচ্যুত হতে হয়েছিলো। এমন একজন নিরহংকার নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিক সাংবাদিক-শিক্ষককে যোগ্য মর্যাদা না দিতে পারলে, তাঁকে যেন আমরা অসম্মান না জানাই— এই হোক আমাদের কামনা।

মরহুম মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন হাসান হাফিজুর রহমান সম্বন্ধে হাসানের সাহিত্য জীবনের প্রথম অধ্যায় শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লেখেন, হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা (১৯৫৩) দলে দলে

এসে ভিড় জমালেন সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন তাঁদের জন্য প্রদত্ত স্থানটিতে। নাসিরউদ্দিন সাহেব আরো বলেন, হাসান নিজে লিখেছেন এবং কবি-সাহিত্যিকদের ধরে ধরে লিখিয়েছেন। ফলে অতি দ্রুত সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রগতিশীল ও শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। নতুন আশা উদ্দীপনা নিয়ে সওগাত ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে এবং এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান।

বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে হাসান হাফিজুর রহমানের অক্লান্ত অবদানের কথা উল্লেখ করে নাসিরউদ্দিন সাহেব বলেন, আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে হাসান হাফিজুর রহমানের এই কর্ম-পঞ্জীর স্মরণীয় অধ্যায়টি বাদ দেয়া যায় না।

নবীন, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সব বয়সের লোকের সাথে আন্তরিকভাবে মেশার এক দুর্লভ গুণ ছিলো হাসান হাফিজুর রহমানের। অজিত গুহ, আবদুল গনি হাজারী ও ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের খালেদ চৌধুরী, সঞ্জীব দত্ত ও মোহাম্মদ ইদরিস-এর মত ব্যক্তিদের তিনি হাজির করেছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহান ও আনিসুজ্জামানের মত তরুণ লেখকদের এক মঞ্চে।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্বন্ধে তাঁরই শিক্ষক সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য, হাসান হাফিজুর রহমানই তার সময়কালের কবিদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিসত্তা, যে তার পূর্বসূরীদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আলী আহসান সাহেবের মতে, হাসান রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারাক্রমের মধ্যে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতাকে স্থাপন করে তার স্বরূপ সন্ধান করেছে। তার কবিতার মধ্যে কবিসত্তাই শুধু নয়, তার ব্যক্তিসত্তাকেও আবিষ্কার করা যায়। হাসান হাফিজুর রহমানের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান আরো বলেন, পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে যে সমস্ত কবি কবি-কর্মে নিগূঢ় স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন, হাসান তাদের অন্যতম।

জীবন ও বীমা

সংবাদপত্রের রিপোর্টার, কাশীর পান্ডা ও বীমার দালালদের এড়িয়ে চলার জন্য নসিহত করেছেন এক বিদগ্ধজন। সৎ ব্যক্তিদের সৎ সাংবাদিক সম্পর্কে কোন ভয়ভীতির কারণ আছে বলে অন্তত আমি মনে করি না। মাজারের খাদেম বা তাদেরই সমগোত্রীয় কাশীর পান্ডাদের খপ্পরে পড়লে দণ্ড যে একটু দিতে হবে তাতে কারো কোন সন্দেহ নেই। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে দণ্ডের পরিমাণেরও তারতম্য হয়।

বীমার দালালদের নাছোড়বান্দা হিসেবে সুনাম বিশ্বব্যাপী। একজনের বীমা করতে পারলে বীমার দালাল পান যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আর বীমাকৃত ব্যক্তি শিঙ্গা ফুঁকলে তার নমিনির অর্থযোগটা মোটামুটি ভালই হয়। অবশ্য তা নির্ভর করে বীমাকৃত অর্থের পরিমাণের উপর।

১৯৬৩ সালের কথা। তদানীন্তন প্রেসক্লাবের লনে বৈকালিক আড্ডায় কায়রোতে পিআইএ-র বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক, ইত্তেফাকের সহযোগী সম্পাদক আহমেদুর রহমান, পাকিস্তান অবজারভারের ফরিদউদ্দিনসহ পাকিস্তানের আরো অনেক সাংবাদিক ও যাত্রী নিহত হন। পাকিস্তানের বেরসিক গোয়েন্দা পুলিশের অসামান্য অবদানের জন্য সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র ফয়েজ আহমদ বেঁচে যান ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে। না, তিনি দুর্ঘটনাকবলিত বিমান থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন, তা নয়। পিআইএ-র ইনঅগুরাল ফ্লাইটে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ফয়েজ আহমদ সাহেবের নাম থাকলেও হুকুমতের নিরাপত্তার খাতিরে পিআইএ-র সুপরিসর বিমানে উঠতে দেয়া হলো না তাঁকে। পিআইএ-র

এক ভাগ্যবান কর্মকর্তা ছাড়া সব যাত্রীই হন নিহত। নিহত অতিথি ও যাত্রীদের পরিবারবর্গ বিমানের কাছ থেকে মোটামুটি ভালোই ক্ষতিপূরণ পায়। ঐ দুর্ঘটনার দিনটির স্মরণে প্রতিবছর, এই কিছুদিন আগেও জাতীয় প্রেসক্লাবে সভা হতো। এখন আর হয় না। আজকের স্মরণীয় ঘটনাও সময়ের আবর্তে ডুবে যায় বিস্মৃতির অতলে।

দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত এমন কোন এয়ারলাইন্স-এর নাম আমার অন্তত জানা নেই। এয়ারলাইন্স নিয়ে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সবদেশেই হয়ে থাকে। পিআইএ ও এয়ার ইন্ডিয়ায় ভ্রমণের পর এক যাত্রী দুই সংস্থাকে তার মতে নতুন নামে ডাকতে বলেন। তাঁর মতে— PIA মানে হলো প্লিজ ইনফরম আল্লাহ, আর IA, অলরেডি ইনফরমড।

বলছিলাম বীমার কথা। ষাট দশকে ঢাকায় আড্ডার স্থান সীমিত থাকায় বহু শিল্পী-সাহিত্যিক ভদ্র-জুয়াড়ী ছিলেন প্রেসক্লাবে নিয়মিত অতিথি। ঐদিনের আড্ডায়ও ছিলেন সব ধরনের সদস্য। একজন বললেন, তিনি আকাশপথে ভ্রমণের আগে বীমা করেন মোটা অংকের। ঐ আড্ডায় এক অতিথির বিদুষিণী স্ত্রীও উপস্থিত। বন্ধুর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এক বন্ধু বললেন, ভাবী আপনার ভাবনা কি, এক্সিডেন্ট হলে আপনিতো ধনী হয়ে যাবেন। বন্ধুর স্ত্রীর শ্যামলা মুখটি বেগুনী হয়ে গেলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে করুণ স্বরে তিনি বললেন, আমার কি সে ভাগ্য আছে! যাহোক, শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের সন্ধানে ভদ্রমহিলা হিটলারের জার্মানিতে আছেন। জার্মান রমণীদের সৌন্দর্য চর্চায় তিনি বিশেষ অবদান রাখছেন বলে শুনেছি তার দেশে পরিত্যক্ত স্বামীর বন্ধুদের কাছে।

আল্লাহ সহায় হলে এবং ভদ্রমহিলার স্বামীপ্রবর যদি কোন বিমান দুর্ঘটনার শিকার হতেন, তা হলে হয়ত সেই সৃজনশীল মহিলাকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হতো না।

মার্কিন মুল্লুকে এক ভদ্রমহিলা পরপর বেশ কয়জন স্বামী হারিয়ে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। কিন্তু বিধি বাম। পঞ্চম স্বামীর অকালে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় পূর্বের সব স্বামীদের বীমার তিনিই ছিলেন একমাত্র নমিনি। পূর্বের স্বামীদের মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিলো না। অতঃপর শ্রীঘরেই হলো তার জীবনের শেষ পরিণতি। আগের সব মৃত্যুই অপমৃত্যু বলে প্রমাণিত হয়। সুঠামদেহী সুন্দরী মহিলার একক প্রচেষ্টাতেই স্বামীদের অপমৃত্যু ঘটে।

এক বীমার দালাল জাঁদরেল এক মক্কেলকে অহরহ বিরক্ত করে মারছিলো মোটা অংকের একটা পলিসি নেয়ার জন্য। নিউ ইয়র্কের এক অট্টালিকার এক শ' তলায়

মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির চেয়ারম্যানকে দালাল মহোদয় বোঝাতে চাইছেন বীমার ফজিলত। ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাসী চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন আর একটা কথা বললে আপনাকে আমি উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলবো। নির্লিপ্ত বীমাকর্মী বললেন, আমি মারা গেলে আমার সন্তান-সন্ততির কোন অভাব হবে না, কারণ, তাদের জন্য বিরাট অংকের বীমা রয়েছে। কিন্তু আপনার ফাঁসি হলে আপনার পরিবার না খেয়ে মরবে। চেয়ারম্যান সাহেব এরপর বিরাট একটা চেক লিখে দিলেন বীমার প্রথম কিস্তি হিসেবে।

তবে বীমার টাকা বেহাত হওয়ার খবরও সময় সময় শোনা যায়। সংঘবদ্ধ দল এ রকম ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত থাকে। ১৯৭৫-এর ঘটনা। মলিন বোরখা পরিহিতা এক মহিলাকে নিয়ে দু'জন লোক অনেকবার ধরনা দিচ্ছেন জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর ঢাকাস্থ সদর দফতরে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জাস্টিস সাত্তার তখন জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এক কাঠমিস্ত্রির স্ত্রী তার মৃত স্বামীর একমাত্র নমিনি। কিন্তু বার বার তদবির করেও বীমার টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। জাস্টিস সাত্তার সাহেব কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ওপর বিধবা মহিলাটির প্রতি তাদের হৃদয়হীন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। কর্মকর্তাদের কাছে চেয়ারম্যান সাহেব তাদের কর্তব্যকর্মেও অবহেলার জন্য ব্যাখ্যা চান। বীমার টাকা পাওয়ার সব ব্যবস্থা নিচ দিক থেকে প্রায় শেষ পর্যায়ে। উপরে এসে ঠেকে আছে। চেয়ারম্যানের ব্যাখ্যার জবাবে এক উর্ধ্বতন সাহসী কর্মকর্তা জানালেন, মহিলার দুই সঙ্গীর আচার-আচরণ সন্দেহজনক এবং এ সম্পর্কে আরো তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জাস্টিস সাত্তার এ মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও একজন দক্ষ কর্মকর্তার কথা একেবারে উড়িয়েও দিতে পারলেন না। সাত্তার সাহেব কর্মকর্তাকে সাবধান করে বললেন, এ বীমার দাবি মিথ্যা প্রমাণ না করতে পারলে কর্মকর্তাকে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

বিরাট চ্যালেঞ্জ কর্মকর্তার ওপর। মৃত কাঠমিস্ত্রির ঠিকানা মহাখালীর ঘিঞ্জি এক এলাকায়। স্থানীয় মসজিদের ইমামের সহায়তায় বীমা কর্মকর্তা কাঠমিস্ত্রির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিবার বীমা সম্পর্কিত কোন খবরই জানে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী রিকশাচালক এক সন্তান ও দু'কন্যাসহ এখনো ঐ এলাকায় বসবাস করে।

কাঠমিস্ত্রীর স্ত্রী বলে পরিচয়দানকারী মহিলার দুই পুরুষ সঙ্গীর একজন কোন এক অখ্যাত কলেজের খন্ডকালীন অধ্যাপক ও অপরজন এজিবি'র প্রাক্তন কর্মচারী। আরো অনুসন্ধানের পর কর্মকর্তা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পরিচয়দানকারিণীর আসল পরিচয় জানতেও সমর্থ হন।

সঙ্গীসহ মহিলা জাস্টিস সাত্তারের সামনে হাজির হয়ে তাঁর করুণ কাহিনী বর্ণনা করে বীমার টাকা অবিলম্বে প্রদান করার জন্য বিনীত আবেদন জানায়। উপরিউক্ত কর্মকর্তা মহিলা ও তার সঙ্গীদের জেরা করার অনুমতি আগেই সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বীমা কর্মকর্তা পূর্বেই কাঠমিস্ত্রীর স্ত্রীর ছবি তুলে নিয়ে এসেছিলেন। জেরা শুরুর প্রথমেই মহিলাকে বোরখা খুলতে বলা হয়। কিন্তু মহিলা বললো সে পর্দানশীন।

প্রবল ধমকের ফলে বোরখা তাকে খুলতে হয়। মহিলা স্বীকার করে, সে কমলাপুর রেল স্টেশনের এক কুলির স্ত্রী; নিজেও পরের বাড়িতে কাজ করে। সঙ্গী দু'জন ভদ্র লোক তাকে বীমা অফিসে প্রতিবার আসার জন্য ত্রিশ টাকা করে দিয়ে থাকে। অধ্যাপক সাহেব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, তিনি দুঃখী মানুষের জন্য তদবির করে দিয়ে সামান্য কিছু ফি নেন। এজিবি'র প্রাক্তন কর্মচারীটি ছিলেন নাটের গুরু। সামান্য চাকরি করে সে ছিলো দু'দু'টো মনোহারী দোকান ও একটি চারতলা বাড়ির মালিক। জাস্টিস সাত্তার অবাক বিস্ময়ে এক নাটকীয় দৃশ্য দেখে হয়ে গেলেন নির্বাক। বীমা কর্মকর্তা তিন অপরাধীকে পুলিশে সোপর্দ করতে চাইলে জাস্টিস সাত্তার ওদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়ার জন্য বলেন। পরে মৃত মিস্ত্রির স্ত্রীকে দেয়া হয় বীমার প্রাপ্য দশ হাজার টাকা।

এই সেদিন জীবন বীমা কর্পোরেশনের মৃত এক সহকারী ম্যানেজার-এর স্ত্রীকে বীমাকৃত দাবি পূরণের মুহূর্তে অপর দুই মহিলা মৃত বীমা কর্মকর্তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে বীমার টাকার অংশ দাবি করে। বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

বই মেলায়

হাওড়া স্টেশন। উদগ্রীব এক লোক রেলের টিকেট চেকারকে জিজ্ঞেস করলেন বোম্বে মেল ছাড়বে কখন? রেলকর্মচারী ট্রেন ছাড়ার সময় বললেন। পরের প্রশ্ন রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়বে ক'টায়? এরও উত্তর দিলেন চেকার মশায়। এভাবে আরো কিছু ট্রেনের সময়সূচী জানাতে গিয়ে চেকার সাহেব হাঁফিয়ে উঠেছেন। তবুও বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করলেন, মশায়, আপনি যাবেন কোথায়? আমি স্টেশনের ওপারে যাবো, জানালো লোকটি।

একুশে ফেব্রুয়ারির দিন বাংলা একাডেমীর বই মেলায় গিয়ে এমনি একটা ব্যাপার দেখলাম। একুশের উপর প্রামাণ্য কিছু বই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক বুক স্টলে ঢু মারলাম। এর মধ্যে ভারিক্কি চালের এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এলেন একই স্টলে। হুমায়ূন আহমদের নতুন বই কি কি এসেছে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। স্টলের এক চটপটে ইয়ংম্যান সামনে বিছানো হুমায়ূন আহমদের বইগুলো একে একে দেখালেন। আর কি আছে? জানতে চাইলেন আগ্রহী ক্রেতা। মিলনের কি কি বই বেরিয়েছে এবার? ভদ্রলোকের পুনরায় প্রশ্ন। যুবক সেলসম্যান খদ্দেরকে খুশী করতে পেছনের তাকে সাজানো বই এমন কি ভেতরের ট্রাঙ্কে রক্ষিত বইগুলো থেকে বের করে ইমদাদুল হক মিলনের সব ক'টি বই দেখালেন অতি যত্নের সাথে। সেলসম্যানের মনে হলো, যাক পাওয়া গেছে এক জাঁদরেল খদ্দের। এ কয়দিনের মন্দা বেচাকেনার কষ্ট আজ পুষিয়ে নেয়া যাবে। তাই যতটুকু সম্ভব সৌজন্য দেখাচ্ছে নতুন খদ্দেরকে। ভদ্রলোক বই ধরে প্রথমেই দেখেন বই-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা, পরে দেখেন দাম। প্রায় বই সম্বন্ধেই একই মত, দাম বেশি। তবু তার বই দেখার শেষ নেই। এদিকে স্টলে আরো লোকের ভিড় জমেছে। এ

স্টলে মোটামুটি সব ধরনের বইই রয়েছে। তাই ভিড় এখানে একটু বেশি হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজ এমনিতেই মানুষের ঢল নেমেছে বাংলা একাডেমী চত্বরে। কেউ গেছেন শুধু বই মেলা দেখতে, কেউবা কবিতার অনুষ্ঠান শুনতে। সন্ধ্যার ভিড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টানে।

উৎসাহী সেই ভারিক্কি খদ্দের বই দেখেই চলেছেন। একটা দেখছেন আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন দোকানীর হাতে। অন্য আর একটা চেয়ে নিচ্ছেন। স্টলের আর একজনের সাহায্যের প্রয়োজন হলো ভদ্রলোকের চাহিদা মেটাতে। এবার তিনি বিদেশী লেখকদের বই-এর দিকে মনোযোগী হলেন। তারাশঙ্কর থেকে শঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু থেকে বুদ্ধদেব গুহ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবার বই সম্পর্কে খোঁজখবর করলেন।

ভদ্রলোকের চাওয়া কিছু বই এই স্টলে রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে এরা অন্য বই পাশের দোকান থেকেও এনে দিতে পারবে বলে জানালো খদ্দেরকে বিনীতভাবে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বড় বড় লেখকের দিকে তাকালেন না। ছ'টাকা দিয়ে একটি কমিক বই নিয়ে বীরদর্পে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অবশ্যি দোকানীকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন এই বলে যে বইমেলা পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত চলবে, অন্য এক সময় এসে বেশ কিছু সংখ্যক বই নিয়ে যাবেন।

খানদানী এক লোক ঘি বিক্রেতার কাছে ঘিয়ের মণ কত জানতে চেয়েছেন। ঘি বিক্রেতার দোকানে মণ খানেক ঘি তখনকার মত মওজুদ নেই। তবুও সে ভাবলো এ রকম মালদার ক্রেতাকে হাতছাড়া করা যায় না। দরকার হলে পাশের ঘোষের দোকান থেকে এনে দেয়া যাবে। লোকটি খানদানী হলে কি হবে দরদস্তুর করার ব্যাপারে খুব হিসাবী। দর ঠিক হওয়ার পর দোকানি ক্রেতার কাছে ভান্ড চাইলেন, যাতে ঘি নেয়া হবে। পকেট থেকে ছোট একটি বৈয়ম বের করে খানদানি ক্রেতা বললেন, দিজিয়ে ইসমে এক ছটাক ঘি।

ঢাকাইয়া ঘি বিক্রেতা অবিচলিতভাবে প্রশ্ন করলো, সাব বাড়িতে কি বিয়া ওয়া আছে? উর্দুভাষী ক্রেতা যা বললেন তার সারমর্ম হলো, চার ভাই রোজগার করলে এক ভাই এমন একটু খরচ করেই থাকে।

বিভিন্ন ধরনের লোক নিয়ে কারবার করেন বইমেলায় স্টল কিপার, হরেক রকম খদ্দের দেখেন রোজ তাদের বাংলাবাজারের দোকানে। বইমেলায় ক্রেতাদের চরিত্র একটু ভিন্ন। বেশির ভাগ লোকই এখানে আসেন মেলা দেখতে, বই কিনতে নয়। এর মধ্যে কতিপয় ছাত্র নামধারী যুবক সুযোগ বুঝে স্টলের সামনে বিছানো দামী দু' একটি বই নিয়ে সটকে পড়ে। দোকানী টের পেলে হাতেনাতে ধরে ফেলেন ভদ্রবেশী চোরকে। কিন্তু এ নিয়ে হৈচৈ করেন না তেমন। কারণ এসব দুষ্কৃতকারীরা

মেলায় আসে দল বেঁধে। গন্ডগোল বাধিয়ে বই লুট করার ঘটনা আগে ঘটেছে বেশ কয়েকবার। এবার (১৯৯৫) মেলা কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টির ফলে বড় ধরনের তেমন ঘটনা ঘটেনি। স্টলের মালিকরাও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তাদের বইপত্রের ওপর।

আমি যে বই খুঁজছিলাম, তা পাচ্ছি না। এক অভিজাত প্রকাশক জানালেন, আমার প্রার্থিত বইটি আউট অব প্রিন্ট। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-এর ওপর লেখা বদরুদ্দীন ওমরের লেখা বই গত বছরও অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাইনি। তখনো শুনেছি, বইটি বাজারে নেই।

হঠাৎ দূরে, আমগাছের নিচে বাঁধানো শানের ওপর বসে এক লোক দেখলাম একটি বইতে সই করছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো ঝোলা কাঁধে এক ব্যক্তি দন্ডায়মান। বসা লোকটিকে মনে হলো চেনা চেনা। কাছে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, শুধু চেনা নয়, অতি চেনা। ভাষা আন্দোলনে যার ভূমিকা কিংবদন্তীর মত এই সেই ব্যক্তি। র‍্যালি সাইকেলে চড়ে সারা ঢাকা চষে বেড়াতো যে শৌখিন ছাত্রটি, সেই পরে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে স্থান করে নেয়। পিতৃপ্রদত্ত নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে সবাইর কাছে তিনি পরিচিত হলেন 'ভাষা মতিন' নামে। সেই তেজী নেতাকে আজ দেখে চেনার উপায় নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মতিন ভাই-এর কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। মুখটা তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, কেমন আছেন? নিজের নাম বলে, মতিন ভাইকে বললাম, আমাকে তো তুমি করেই বলতেন। একটু যেন লজ্জিত হলেন। কোথায় আছি, কি করছি জানতে চাইলেন। বললাম আমার খবরাখবর। জানতে চাইলাম তিনি কেমন আছেন। প্রসন্ন হাসি দিয়ে জানালেন ভাষা আন্দোলনের ওপর একটা বই লিখেছেন এবং আজই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আমার লেখা একটি বই ছিলো আমার হাতে। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মতিন ভাইকে বইটি নিজের সই দিয়ে বিনীতভাবে তাঁর হাতে দিলাম। পাশের দন্ডায়মান লোকটির ঝোলা থেকে তাঁর নিজের লেখা এক কপি বই নিয়ে লিখলেন, সচেতন সহকর্মী রহিমকে শুভেচ্ছাসহ। নিচে নিজের নাম সই করে তারিখ লিখলেন একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। পরম শ্রদ্ধাভরে বইটি গ্রহণ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম কোন স্টলে বই দিয়েছেন? না, কোথাও তো দিইনি, কাউকে তো চিনি না, বললেন একালের ডাকসাঁইটে ছাত্রনেতা, পরবর্তীতে বামপন্থী আন্দোলনের এক সাহসী সংগঠক। গায়ে পড়ে বললাম, দু'একটি স্টল মালিকের সাথে আমার পরিচয় আছে, ইচ্ছে করলে ঐসব স্টলে বই রাখতে পারেন। এই বলে উনাকে নিয়ে গেলাম চারটি স্টলে এবং স্টল মালিকদের সাথে মতিন ভাই-এর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওঁরা তাঁর নাম শুনেছেন, দেখেননি। তবু তাঁরা

তাঁর বইটি কয়েক কপি করে রাখলেন।

বাড়িতে গিয়ে বইটির কিছু অংশ দেখলাম। অনেক অজানা তথ্য রয়েছে এ বইতে। বইটি খুব বড় নয়। স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। ভাষা আন্দোলনের নাড়ির সাথে যার যোগ ছিলো সেই ভাষা মতিনের লেখা বই। "বাঙালি জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন" সুধী সমাজে আদৃত হওয়ার মতো বই।

কাকতালীয়ভাবে হাসান ভাই অর্থাৎ বিএসএস-এর হাসানুজ্জামান খানের সাথে একই দিন দেখা মেলায়। পাকিস্তান আমলের এক নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি মতিন ভাই-এর বইটি মেলা থেকে আমার সামনেই কিনে নেন। মতিন ভাই উল্লসিত মনে নিজের স্বাক্ষর দেন হাসান ভাই-এর কেনা বইটিতে। একনিষ্ঠ সাংবাদিক হাসানুজ্জামান এর আগের দিন অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানের জন্যে একুশে পদক গ্রহণ করেন।

সম্রাটের বিদায়

ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্স-এর সুপরিসর বিমানটি উড়ছে তো উড়ছেই। করাচি বিমানবন্দর থেকে আকাশযানটি ছেড়েছে সেই মধ্যরাতে। জানালার পাশের একটা সিট ভাগ্যগুণে পেয়ে গেলাম। নির্ধারিত সময়ের কিছু পর বিমান আকাশে পাখা মেললো। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের কথা। আমার পাশের সিটের যাত্রী করাচির এক সান্ধ্য পত্রিকার ওভার-স্মার্ট এক সাংবাদিক। পশ্চিম পাকিস্তানের ছয়জন আর আমরা বাংলাদেশের দু'জন সাংবাদিক-দল যাচ্ছি ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্স-এর উদ্বোধনী ফ্লাইটে। গন্তব্য স্থান ইথোপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায়। বাংলাদেশের অপর সদস্য স্বনামধন্য সাংবাদিক জনাব সানাউল্লাহ নূরী। তিনি তখন দৈনিক পাকিস্তানের সহযোগী সম্পাদক। আমি পাকিস্তান অবজারভারের সিনিয়র রিপোর্টার।

আমার যাওয়াটা আকস্মিক। ঐ যাত্রায় যাওয়ার কথা ছিল বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ অসম সাহসী সাংবাদিক সৈয়দ নজীউল্লাহর। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান অবজারভার-এর প্রতিনিধি সৈয়দ নজীউল্লাহ ছিলেন পাক শাসকগোষ্ঠীর ত্রাস। এই নির্লোভ ব্যক্তিটি উদ্বোধনী ফ্লাইটে তাঁর বদলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্য একজনকে নেয়ার জন্য বলেন। উদ্বোধনী ফ্লাইটের দু'দিন আগে, মরহুম মাহবুবুল হক (তিনি তখন অবজারভার-এর ম্যানেজিং এডিটর) জানতে চাইলেন আমি ঐ ফ্লাইটে যেতে ইচ্ছুক কিনা। মাহবুব ভাইকে বললাম ইচ্ছা হলেই কি যাওয়া যায়! প্রথম আমার পাসপোর্ট নেই। দ্বিতীয় বিদেশে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও কাপড়চোপড়-এর ব্যবস্থাই বা কি করে করি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে।

পাসপোর্ট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। প্রথমত পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণের ওপর ছিল কঠোর বিধিনিষেধ। তাছাড়া পূর্বে ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকলেতো কথাই নেই। পাক-আমলে ছাত্রদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক বিশ্বস্ত ইনফরমার ছিল, যারা কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে ছাত্র আন্দোলনের খবরাখবর সরবরাহ করতো বিশেষ বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থাকে। এদের মধ্যে একজন স্বাধীন বাংলাদেশের কোন এক মন্ত্রিসভা অলংকৃত করেছিলেন। যা হোক, পুলিশের খাতায় নাম থাকায় আরও দু'এক জায়গায় আগে হোঁচট খেতে হয়েছে। সে কথা মনে করে মাহবুব ভাইকে বললাম, পাসপোর্ট যদি আল্লাহর রহমতে যোগাড় করতে পারি তাহলে অর্থ ও কাপড়চোপড় ধার করতে অসুবিধে হবে না।

দুরু দুরু বক্ষে এসবি অফিসে পারিবারিক সূত্রে পরিচিত এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলে তিনি নিজ দায়িত্বে আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঐ সবুজ রঙের বইটিকে মনে হয়েছিল এক অমূল্য সম্পদ। পাসপোর্টটি বক্ষে ধারণ করে ফিরলাম অফিসে নিজ কক্ষে। অফিস থেকে ধার চাইলাম। একশর্তে মাহবুব ভাই পাঁচশ' টাকা ধার দিতে রাজী হলেন- তাহলো, ব্যাপারটা যেন হামিদুল হক চৌধুরী না জানেন। নিজের বিয়ের সময় কিছু টাকা ধার চাইতে স্বয়ং হামিদুল হক চৌধুরীর দ্বারস্থ হওয়ার পর তিনি নসিহত করে বললেন, দেখো, অনাবশ্যক টাকা খরচ করে মানুষ জনকে খাওয়ালে কোন লাভ নেই, কেউ তা মনে রাখবে না। যা তোমার আছে তাই দিয়েই কাজ সারো। এখন ধার নিলে পরে শোধ করতে গিয়ে পরিবারকে খাওয়াতে পারবে না বলে তিনি তাঁর বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করলেন। তাই মাহবুব ভাই-এর কথা মত পাঁচশ' টাকাই সই। সই দিয়ে নিলাম টাকা। শর্ত প্রতিমাসে একশ' টাকা করে ফেরত দিতে হবে। তবুও ভাল সুদ দিতে হবে না। চৌধুরী সাহেব জানলে হয়ত তা-ই চাইতেন।

টাকা যোগাড়ের পর সমস্যা তখনকার আমার শীর্ণকায় দেহের মাপের স্যুট একটাতো চাই। বিদেশে গেলে ডিনার লাঞ্চ-এ যেতে ধড়াচূড়ার প্রয়োজন। যদিও সাংবাদিকদের এসব রীতিনীতি মানার রেকর্ড তেমন ভাল নয়। কিন্তু বিদেশ বলে কথা। ওয়াপদার জনসংযোগ কর্মকর্তা তাজুল-এর সাথে আমার শারীরিক কিছু সাদৃশ্য ছিল। তার স্যুট ধার পেলাম, যদিও একটু ঢোলা। ভাবলাম ভালই হলো- এ স্যুটে দেখতে আমাকে একটু ভারিক্কিই মনে হবে।

করাচি বিমানবন্দরে পরিচয় হলো ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্সের স্থানীয় এক প্রতিনিধির সাথে, যিনি ছিলেন ব্যবহারে বিনয়ী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। ১৯৬৫ সালে কায়রো বিমান দুর্ঘটনার কথা আলোচনায় এলো। ওটাও ছিল উদ্বোধনী ফ্লাইট। এর মধ্যে এসে গেলো পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিকরা। আসর গুলজার হয়ে উঠলো।

বয়সে প্রবীণ ডন-এর এক সহযোগী সম্পাদক আক্ষেপ করে বললেন, বীমা করলে ভাল হতো। দুর্ঘটনা একটা ঘটে গেলে পরিবারের লোকজনের সুবিধে হতো। ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধি বললেন, তিনি বীমায় বিশ্বাস করেন না। কারণ বীমার নমিনিরা আপনার দীর্ঘায়ু থেকে মৃত্যুই বেশি কামনা করবে।

আমরা দু'জন বঙ্গ সন্তানকে পশ্চিমী ভাইরা তেমন কোন পাত্তা দিচ্ছেন না। আমরা দু'জন যেন উটকো লোক। ওদের ধারণা, মফস্বল সাংবাদিক যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। তবে বশির আহমদ— পাকিস্তানে ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্স-এর সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আচরণ ছিল শোভন।

নূরী সাহেব সরল সোজা মানুষ। নিজের কাজ সম্বন্ধে সচেতন। তার হাতে নোটবুক। পাশে এক সিটে বসে তিনি কি যেন লিখছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। সান্ধ্য দৈনিকের সুলতান সাহেব দু'একটা টিপ্পনি কাটলেন আমাদের সহযোগী নূরী সাহেব সম্বন্ধে। দু'একবার তা না শোনার ভান করলাম। কিন্তু সুলতান-এর এক বিশ্রী মন্তব্য আর গিলতে পারলাম না। ইঙ্গিতে বললাম, সান্ধ্য দৈনিকের সাংবাদিকদের ভদ্র ব্যবহার করা কি নিষেধ। ওষুধে কাজ হলো। আমার নাতিদীর্ঘ দেহটা আপদমস্তক দেখে নিয়ে সুলতান বললো, আরে ইয়ার হামতো মজাক করতা হ্যায়। আপকা গোস্বা হোনেকা কোই বাত নেহি। উর্দুতেই জানতে চাইলেন সুলতান, নূরী সাহেব কি খুব মশহুর সাহিত্যিক? আরও জিজ্ঞেস করলেন, কি এমন জিনিস আছে যে, সেই বিমানবন্দর থেকে নূরী ছাহাব টুকে নিচ্ছেন। সুলতানের পরের মন্তব্য, ছোড়দো উসকো বাত, আপতো হামারা দোস্ত হ্যায়। বুঝলাম জুৎসই ঠেলা দিতে পারলে দুশমনও দোস্ত হয়ে যায়।

বিমানের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ার সুবাদে আদর-আপ্যায়নের কমতি ছিল না। ইউনিফরমের ওপর চাদর পরা সুঠামদেহী আকাশ সুন্দরীরা বিমানের বিশেষ অতিথিদের সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত। ক'বার নাস্তা-পানীয় দিয়ে গেছে তা এখন এতদিন পর মনে করতে পারছি না। এরমধ্যে প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর হাতে এয়ারলাইন্স-এর পক্ষ থেকে টয়লেটরিজের এক ছোট ব্যাগ পৌঁছে গেল। সাথে ইথোপিয়ার প্রসিদ্ধ কফির মিনি এক থলি। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কফি রপ্তানিকারী দেশ ইথোপিয়ার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আসে কফি থেকে।

অনেক সমুদ্র পাহাড় পর্বত পেরিয়ে উড়ছে বিশাল আকাশযান। পশ্চিম দিকে সময় কমেছে। ঘড়ি দেখে আকাশে স্থানীয় সময় বোঝা মুশকিল। যখন ভোর হয়ে গেল, নিচে কখনও দেখছি বিশাল সমুদ্রের জলরাশি, আবার কিছুক্ষণ পাহাড় পর্বতের সারি। কোন শহর-বন্দর-জনপদ। কথা ছিল ইরিত্রিয়ার রাজধানী

আসমারায় যাত্রা বিরতি হবে ঘন্টাখানেকের জন্য। কিন্তু মার্কিনী বিমান চালক সম্ভবত আবহাওয়ার কারণে আসমারায় আর থামলেন না।

মুসলিম অধ্যুষিত ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। ১৯৬৬ সালে সম্রাট হেইলে সেলাসি'র ইথোপিয়ার অধীনে একটি অবহেলিত প্রদেশ ছিল ইরিত্রিয়া। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ইরিত্রিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিলো ১৯৯৩ সালের মে-তে। নবদীক্ষিত মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী হযরত বেলাল ছিলেন আবিসিনিয়ার (যা এখন ইরিত্রিয়া) বাসিন্দা।

আদ্দিস আবাবায় যখন পৌঁছি তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। হেইলে সেলাসি বিমানবন্দর থেকে সোজা হোটেলে। রুমে গিয়ে কাপড় বদলিয়ে, শাওয়ার শেষে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখলাম আমাদের সহযাত্রী পশ্চিম পাকিস্তানী বেরাদররা খাওয়া শেষ করে এসেছেন।

ইথোপিয়ার দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হলো। রাজধানী আদিস (আদর করে এই নামেই ডাকে) থেকে বহু দূরে এক মনোরম লেকের পাড়ে গিয়ে দেখলাম লোকে গিজগিজ করছে। বিত্তবানদের আরাম আয়েসের সবরকম বন্দোবস্ত রয়েছে ওখানে। হঠাৎ দৃষ্টি গেলো এক জায়গার দিকে। ওখানে সশস্ত্র ইউনিফরম পরা লোকের উপস্থিতি কৌতূহলী করে তুললো আমাদের। খবর নিয়ে জানলাম ওখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন মহান সম্রাট-এর জ্যেষ্ঠপুত্র যে নাকি পিতার বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সম্রাট হেইলে সেলাসি পরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। বিদ্রোহী পুত্রসহ সেনাবাহিনী প্রধান হন বন্দী। সম্রাটের শাসন ছিলো কঠোর। সেনা প্রধানসহ আরও কয়েকজন প্রাণ হারান ফাঁসির মঞ্চে। 'নিরপরাধ' পুত্র যায় বেঁচে। তবে এরপর থেকে পুত্রের চলাচলের ওপর সম্রাট পিতা বিশেষ নজর রাখতেন।

একদিন আমরা দল বেধে বিকেলের দিকে হাঁটতে বেরিয়েছি 'আদিসে'র এক 'পস' এলাকায়। হঠাৎ বাধা পেলাম। নিরাপত্তা রক্ষীরা জানালো এ পথ বন্ধ। সম্রাট এ পথ দিয়ে যাবেন। অপেক্ষা করলাম যদি ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিটিকে চর্মচোখে দেখতে পাই। হ্যাঁ, আমাদের আশা পূর্ণ হলো। যা চেয়েছি পেয়েছি তার চেয়ে বেশি। এ কি! স্বয়ং সম্রাট জনমানবহীন রাস্তায় নামলেন বুলেটপ্রুফ গাড়ি থেকে। সাথে দু'টি ছোট জাতের কুকুর ও দু'টি ছোট ছেলে। আমাদের গাইড জানালেন সাথের বালক দু'টি তার নাতি। সম্রাটের দেহাকৃতি সাধারণ ইথোপীয়দের তুলনায় খাটো। তাই বোধ হয় তার শরীরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'পুডল' জাতের কুকুরকেই 'পেট' হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সম্রাট রাজ্য হারিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে ফিরে আসেন দেশে মিত্রবাহিনীর সহায়তায়। পুত্রের কাছে সাময়িকভাবে ক্ষমতা হারিয়ে তা আবার ফিরে পান। কিন্তু এত কিছু করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না তিনি। দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জনগণের রোষানলে পড়ে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন ১৯৭৪ সালে। এরপরের কমিউনিস্ট সরকার দেশের অবস্থার উন্নতিতো করতে পারলোই না, বরং সোভিয়েট সামরিক সাহায্য নিয়ে দেশের মানুষের ওপর চালায় চরম নির্যাতন। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আগের মতই। সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট মেঙ্গিৎসু হেইলে মেরিয়াম ১৯৯১ সালে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যান।

এ সেদিন আদ্দিস আবাবায় অল্পের জন্য বেঁচে যান মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। আততায়ীরা তার গাড়িকে তাক করে প্রচণ্ড গুলি ছোঁড়ে। অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন হোসনি মোবারক। এ ঘটনার পর তিনি তার স্বদেশে ফিরে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

অশান্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ক্ষমতার লড়াই। কাতারের আমিরের জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সিংহাসন দখল করেছেন। সংগত কারণে তাঁর দেশের লোকজন ও রাজপরিবার নতুন আমিরকে স্বাগত জানিয়েছেন। সুখের ব্যাপার হলো, ক্ষমতার হাত বদলের ফলে কোন রক্তক্ষয় হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

সভ্যতার পীঠস্থান মিসরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সম্প্রতি মিসরে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন জারিতে সে দেশের সাংবাদিকরা সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত। হোসনি মোবারক বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থ অন্যের ক্ষতি করার অধিকার নয়।

সমঝোতা

সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে এক যাত্রী রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো মদনমোহন বসাক লেন যেতে কত নেবে? দশ টাকা, রিকশাওয়ালার ত্বরিত জবাব। যাত্রীটি মোটামুটি শিক্ষিত, খবর কাগজ পড়েন। চড়া ভাড়ার কথা শুনে যাত্রীটির আক্কেল গুড়ুম। রিকশাওয়ালাকে যাত্রী বললেন, মোরে বেকুব ভাবছো, মনু? মুই খবর কাগজে দেখছি, ভাড়া হইবো দুই টাহা। চল, চল মোরে লইয়া চল, তাগাদা দিলেন যাত্রী। বেশি হুজ্জত করলে রিকশাওয়ালা যে সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারে এই ভয় দেখিয়ে যাত্রী বললেন, এখন আইয়ুবের মার্শাল ল' চলছে। সব কিছু নিয়ম-কানুনের মধ্যে হবে, এ কথাও তিনি অশিক্ষিত রিকশাচালককে জ্ঞান দিতে গিয়ে সতর্ক করে দিলেন। খবর কাগজে যে ভাড়ার উল্লেখ আছে তাই তিনি দেবেন এমন অঙ্গীকার করার পরও রিকশাওয়ালার ভাবান্তর নেই। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঢাকাইয়া ত্রিচক্রযান চালক বললেন, কাগজে যখন লেখছে তহন কাগজে চইড়াই যান। হিসেবী যাত্রী পুনরায় বললেন, দিনকাল খারাপ রিকশাচালক যেন বুঝে শুনে কথা কয়।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো এক পশ্চিমা আর্মি সুবেদার। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শহরে সদ্য আগত ব্যক্তিটির মন্তব্য শুনে তিনি বেশি বাক্য ব্যয় না করে মার্শাল ল' শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করার অপরাধে লোকটিকে নিকটবর্তী কোতোয়ালী থানায় সোপর্দ করে দিলেন।

অহেতুক তর্ক না করে বেচারা যাত্রী যদি রিকশাওয়ালার সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছতো তা হলে তাকে তার সম্বন্ধীর বাসায় যাওয়ার পরিবর্তে রাত্রীয় অতিথি হতে হতো না।

আলোচনার মাধ্যমে কত জটিল সমস্যারই না সমাধান হয়ে যায়, তা প্রমাণের জন্য ইতিহাসের পাতা ঘাঁটতে হয় না। জেদ করে আলটিমেটলি কেউ কিন্তু খুব বেশি লাভবান হয় না। আলোচনায় বসলে কিছু দিতে হয়, কিছু নিতে হয়। দেয়া নেয়ার মধ্যে দিয়েই হয় সমঝোতা, তার ফলে বাড়ে সহযোগিতা, যা পরে রূপান্তরিত হয় বন্ধুত্বে।

কোরাইশদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের প্রথম স্বীকৃতি আসে হোদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে। হোদাইবিয়ার সন্ধি মানার ব্যাপারে চরম আপত্তি ছিল রসূলুল্লাহর কিছু সাহাবার। তাঁদের মতে এ সন্ধির শর্ত ইসলামের জন্য অবমাননাকর। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যশীল বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এই সন্ধি করে হানাহানির পথ বন্ধ করলেন, যা কালক্রমে ইসলাম প্রচারের পথ করে দিল প্রশস্ত। এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে হয় এর সফল পরিণতি।

মদিনা থেকে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চললেন মক্কায় ওমরাহ করতে। কিন্তু বাধ সাধলো মক্কার কোরাইশরা। মুসলমানদের মক্কায় ঢুকতে দিতে তারা নারাজ। দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর ঠিক হলো, পরের বছর মুসলমানরা ওমরাহ করার অনুমতি পাবে, এবার নয়। এ সম্বন্ধে একটি লিখিত চুক্তিও দু'পক্ষের মধ্যে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। গোল বাঁধলো হযরত আলীর স্বহস্তে লিখিত সন্ধিপত্রে হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নামের আগে রসূলুল্লাহ শব্দটি মেনে নিতে কোরাইশদের ঘোরতর আপত্তির ফলে। স্বয়ং হযরত আলী এবং সাহাবারা কোরাইশদের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার মেনে নিতে পারছিলেন না। এ মতানৈক্য থেকে সংঘর্ষ বাধাও ছিল খুব স্বাভাবিক ঐ সময়ে।

এই সংকটময় অবস্থায় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজে। হযরত আলীকে সন্ধিপত্র থেকে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অসীম সাহসী বীর হযরত আলী (রাঃ) সন্ধিপত্র থেকে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিতে বিনয়ের সাথে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলেন। তখন উম্মি পয়গম্বর আলীকে বললেন, সন্ধিপত্রের কোন স্থানে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি রয়েছে তা যেন তিনি তাঁকে (রসূলুল্লাহ) দেখিয়ে দেন। কারণ 'রসূলুল্লাহ' নিজে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া জানতেন না। হযরত আলী (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রিয় নবীজীকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। এরপর নবীজী স্বহস্তে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিলেন। এভাবেই হোদাইবিয়া নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের সন্ধি হয়। এ সন্ধির মধ্য দিয়েই মুসলমানরা একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পেল অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে। আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য এই অসম চুক্তিই ভবিষ্যতে তাদের জয়যাত্রার পথ সুগম করে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে বাধ্য করা হয় এক চরম অপমানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। পরাজিত শক্তিকে পদদলিত করে মিত্রশক্তি জার্মাইতে যে চুক্তি করে সেটাই পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ হিসেবে কাজ করে। হিংসা জন্ম দেয় প্রতিহিংসার। জার্মানি কখনও ভুলতে পারেনি তাদের জাতীয় অবমাননা, লাঞ্ছনা। তাই শক্তি সঞ্চয়ের প্রথম পর্বেই জার্মানি ঝড়ের বেগে মেজিনো লাইন অতিক্রম করে দখল করে নেয় ফরাসী দেশ। ফরাসীদের কাছ থেকে জার্মানি পরাজয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেয় সেই ট্রেন কম্পার্টমেন্টে বসে, যেখানে জার্মানিদের পরাজয়ের দলিল সই করতে হয়েছিল প্রায় তিন যুগ আগে।

কোন যুদ্ধে বিজয়ী বা বিজিত অক্ষত থাকে না। রণক্ষেত্রের বিজয়ে উল্লসিত বৃটেন-এর সাম্রাজ্য হারাবার লগ্ন শুরু হয় অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর থেকে। পরাজিত পরাভূত জার্মানি-জাপান যখন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটেন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

অন্যদিকে আমেরিকা যুদ্ধ করে বৃটেনের শৃংখলমুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বৃটেন হয় আমেরিকার চরম ও পরম মিত্র। দু'দু'টো বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য ও সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে হয়ত আজ বৃটেনকে হিটলার সাহেবের জার্মানির করদরাষ্ট্র হিসেবে থাকতে হত।

বৃটেন ঠেকে শিখেছে। আলোচনার মাধ্যমেই বৃটেন উপমহাদেশে স্বাধীনতা দিয়ে ফিরে গেছে নিজ দেশে। এ ছাড়া অন্যান্য কলোনী থেকেও বৃটেন সরে গেছে স্বাধীনতা দিয়ে। এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে বৃটেন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। ফলে তারা পুরনো কলোনীগুলোর সাথে আজও সুসম্পর্ক বজায় রাখছে।

কূটনীতি

বিদর্ভ রাজ্যের রাজা বৈমাত্রেয় ছোট ভাইকে পাঠালেন রাজ্যের দূরপ্রান্তে মানুষখেকো এক ব্যাঘ্র শিকারে। বাঘ যদি মরে তাহলে ঐ অঞ্চলের আতঙ্কিত প্রজারা সুখ্যাতি করবে রাজার। আর বাঘের হাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি উচ্চাভিলাষী বৈমাত্রেয় ভাইটির জীবন প্রদীপ নিভে যায় তবে তো ভবিষ্যতের কাঁটা দূর হয়।

রাজ্য চালাতে হলে কূটনৈতিক বুদ্ধির যে প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্য যত বড় হয় রাজার মাথাব্যথাও হয় তত বেশি। মামার জোরে রাজা হওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। তবে রাজ্য চালাতে হলে রাজার নিজের মস্তিষ্কে কিছু গ্রে মেটার থাকা একান্ত প্রয়োজন। জাতিসংঘের মত একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ডবল বুট্রোস (বুট্রোস-বুট্রোস) ঘালিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রচুর ধার-দেনা নিয়েও মিসরের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেঁচেবর্তে আছেন শক্তিধর সদস্যদের সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে। নিজের বুদ্ধির যে কিছু এর জন্য কাজ করেনি তা নয়।

মহা ধুমধামের সাথে এই সেদিন গ্লোবাল সিটি নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মহামিলন। মেলার মেইন হোস্টকে দেখলে কে বলবে যে তাঁর বয়স ৭২ বছর। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো ঘালি সাহেবকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে যাতে অতিথি আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না থাকে। বলা বাহুল্য, বিত্তবান মেহমানদের চিত্তের সুখের দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে একটু বেশি। কারণ এঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে তিনি সেকেন্ড টার্ম-এর জন্য মুরুব্বিদের দোয়া পাবেন কিনা।

এদিকে এক কালো আফ্রিকানকে নিয়ে ফিসফাস আওয়াজ উঠেছে যে উনি নাকি বিশ্বের সর্বোচ্চ পার্লামেন্টের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ পদটির জন্য প্রার্থী হিসেবে

কালো আদমীসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেকের সমর্থন পেতে পারেন। ঘানার কফি আননের রঙ কফির মত কালো হলেও তাঁর সার্ভিস রেকর্ড কিন্তু সাদা ধবধবে। এ ধারণা বলা যায় সবার। ইউএন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিভাগসমূহের কাজ করেও নিজেকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে পেরেছেন কফি আনন।

কফি আননকে ঘালি সাহেব পাঠাচ্ছেন বসনিয়ায় শান্তি স্থাপনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে। বসনিয়ায় শান্তি স্থাপনে কফি আনন কতটুকু সার্থক হবেন তা বলা না গেলেও এটা বলা যায়, ঘালি সাহেব সাময়িকভাবে হলেও শান্তি পাবেন নিজ মনে। দ্বিতীয় দফায় বর্তমান চাকরির মেয়াদ বাড়াবার জন্য তিনি প্রচারাভিযান চালাতে পারবেন এ সময়টায়। হ্যাঁ, কফি আনন যদি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে কোন অবদান রাখতে পারেন, তাহলে সেটা হবে ঘালির কূটনৈতিক বিজয় বলে চিহ্নিত। নতুবা কফি আননকে বসনিয়ায় ঘালির বিশেষ দূত ইউসিসি আকাশীর মতো পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরতে হবে জাতিসংঘ সদর দফতরের করিডোরে। ফলে তাঁর এতদিনের অর্জিত সুনামের মুখে পড়বে কলংকের কালিমা। কেউ কেউ মনে করেছেন, ঘালি সাহেব বাঘ মারতে শত্রু পাঠিয়েছেন। অনেকে কফি আননকে আফ্রিকানদের সত্যিকার প্রতিনিধি মনে করেন। মিসরের কপটিক খৃস্টান ঘালি সাহেব সেদিক থেকে রিয়েল আফ্রিকান নন বলে কালো ভাইরা মনে করেন।

বড় বড় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মনোরঞ্জন করে চলতে না পারলে বড় পদ পাওয়া দুষ্কর। একবার তো বিলুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন, বিশ্ব সংস্থার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ একক পদটি দখল করার চেষ্টা বৃথা জেনে, ঐ পদটির বিকল্প হিসেবে ট্রয়কা সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য জোর দাবি তুলেছিলো। এ নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিলো বিশ্বজুড়ে। ট্রয়কা মানে তিন জনের এক প্যানেল, যা নাকি যে কোন সিদ্ধান্ত নেবে যৌথভাবে। সোভিয়েট ব্লকভুক্ত দেশগুলো ছাড়া অন্যদের কাছ এ থিউরী গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এদিকে জার্মানি ও জাপানের পাশাপাশি ভারত ও নাইজেরিয়া চাচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা জার্মানি ও জাপানকে খতম করতে জান কোরবান করেছিলো, তারাই এই দুই পুনরুজ্জীবিত ধনী দেশের এখন পরমাত্মীয়। যুদ্ধ, রাজনীতি ও প্রেমের ব্যাপারে শেষ কথা বলে কিছু নেই। 'মেরেছে কলসীর কাণা তাই বলে কি প্রেম দেবো না'— এই সর্বজনগ্রাহ্য নীতি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

এই সেদিন কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত ১১৩ জাতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারতের পরোক্ষ বাধার ফলে জাপান ঐ সম্মেলনে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত

হওয়ার আবেদন করে ব্যর্থ হয়। জাপান যদি স্থায়ী সদস্য পদ পায় তাহলে এশিয়ান গ্রুপ থেকে আর কাউকে একই মর্যাদায় সদস্য করা সম্ভব হবে না। অথচ নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, টোকিওতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় ভারতের রাধা বিনোদ পাল জাপানকে যুদ্ধাপরাধের জন্য এককভাবে দায়ী করে দেয়া ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে একলা জোরালো মত প্রকাশ করেন। কূটনীতি হলো এনলাইটেন্ড সেলফ ইন্টারেস্ট।

কালকের শত্রু আজকের বন্ধু হতে পারবে না, এমন কথা কোন কেতাবে লেখা নেই। তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে মারি-অরি-পারি সে কৌশলের নীতি চলে আসছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। আর যদি বিরোধীয় এক পক্ষ বেশি শক্তিধর হয় তাহলে যুদ্ধের সময়কার প্রচলিত নীতিমালা মানা তার পক্ষে ফরজ বলে গণ্য করা হয় না।

বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা অনেক দেশ স্বদেশে ঐ শান্তির ব্যাপারটাকে তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। নিজ দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রকাশ ও বিকাশ বন্ধ করতে তথাকথিত শান্তিবাদী দেশসমূহ যে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেয় বিনা দ্বিধায়। চোখ বুলালেই এদিকে সেদিকে এর উদাহরণ দেখতে পাই অনেক। ধর্ম বর্ণ গোত্র ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষে মানুষে। আর তারই ফলে লক্ষ-কোটি মানুষের ভাগ্যে জুটছে চরম দুর্দশা। আজ বিশ্বে প্রায় পৌনে তিন কোটি লোক জীবন বাঁচাবার কার জন্য স্বদেশ থেকে পালিয়ে জীবনধারণ করছে পরদেশে সাহায্য শিবিরে, যার খরচ যোগাচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা।

নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে অনেক রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে সংঘাত জিইয়ে রাখতে মদত যোগায়। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সর্বত্রই এ কালচার চলে আসছে। যার ফলে দ্বিতীয় যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলেও আঞ্চলিক সংঘাতসমূহ আগের চেয়ে বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এতে মদদ যোগাচ্ছে কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ বা পরোক্ষভাবে। দিন কয়েক আগে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, অবৈধ সার্ব বাহিনী অস্ত্র পাচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী এক রাষ্ট্রের মাধ্যমে। এটা দুঃখজনক যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র বসনিয়া যেখানে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে না, সেখানে অবৈধ একটি বাহিনী শান্তির প্রবক্তা এশীয় একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র সরবরাহ পাচ্ছে।

সেবরেনিতসা'র গণকবরে সমাহিত হয়ে আছে অগণিত নিরীহ মানুষ। তাদের অপরাধ তারা একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী, ইউরোপীয় হলেও তারা খৃস্টান নয়। অবৈধ সার্বরা তাদের সংগৃহীত অস্ত্র ব্যবহার করেছে নিরস্ত্র বসনীয়দের ওপর।

জাতিসংঘের করিডোরে দু'জন ভারতীয়ের নাম শোনা যায়। একজন বিশ্ব

সংস্থার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। অন্যজন এক সাধুবাবা। দু'জনের এক নাম চিন্ময়। প্রথম জন চিন্ময় গারেখান, বুট্রোস ঘালির অতি কাছের মানুষ। দ্বিতীয় জন, গুরু চিন্ময়েরও ইউএনএ খুব প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। জাতিসংঘে ভারতীয় মিশনের প্রাক্তন কেরানী গুরুজীর আশ্রমে যান কেউ যোগাভ্যাস করতে। অনেক রথী-মহারথীরা যান তাদের ভাগ্য গণনা করতে, গুরুজীর আশীর্বাদ নিতে।

গুরুজীর ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গুরু শ্রী রজনীশের মতো সাম্রাজ্যের অধিকারী যদি আজকের সাধুবাবা হয়ে পড়েন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে রজনীশকে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ছাড়তে হয়েছিলো তার অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের খবর প্রকাশ হওয়ার পর। প্রয়াত রজনীশ স্বদেশ ভারতে ফিরে এসে তন্ত্রমন্ত্রের জোরে নিজের আসন টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু অনেক দিন ধরে বহু আমেরিকানদের অর্থানুকূল্যে তিনি রাজার হালে জীবনযাপন করেছিলেন পৃথিবীর সবচে' ধনী দেশে। তার ভক্তদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ছিলো একটু বেশি পরিমাণে। এদের মধ্যে আবার তার দক্ষিণ হস্ত বলে কথিত ব্যক্তিও ছিলো একজন সুন্দরী সুঠামদেহী যুবতী। তিনি বর্তমানে সম্ভবত কোন আমেরিকান কারাগারে যোগাভ্যাস করে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন।

অনেক কথা হলো। ফিরে যাই কফি আননের কথায়। বন্ধু মহলে কেউ কেউ বলেন, কফির আদৌ কোন ইচ্ছে নেই জাতিসংঘের প্রধান পদটি পেতে। তবে বলাতো যায় না কফির রঙ সাদা হতে কতক্ষণ! তিনি হয়ত সেই জুরিহতে অনিচ্ছুক মহিলার মত নিজের মত পরিবর্তন করতে পারেন।

জুরি বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য এক বিদুষী মহিলাকে অনুরোধ করার পর তিনি বললেন, আই ওনট্ লাইক টু বি এ জুরি। বিকজ আই অ্যাম এগেনস্ট ডেথ পেনালটি। তাকে জানানো হলো, কেসটি একটা সিভিল স্যুটের। এক মার্কিন গৃহবধূ অনেক কষ্টে টাকা জমিয়েছে ছোট একটা বাড়ি কেনার জন্য, কিন্তু তার গুণধর স্বামী টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া খেলে। এ কথা শোনার পরই সেই বিদুষী মহিলা বললেন, ডেথ পেনালটি সম্পর্কে আমি আমার মত পরিবর্তন করলাম। আমাকে জুরি বোর্ডে নিতে পারেন।

সময় কথা কয়

লেখালেখির কথা উঠলেই জহির রায়হানের মুখ ভেসে ওঠে মনে। 'হলে' আমার সিনিয়র রুমমেটদের মধ্যে একজন ছিলেন এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র। মানুষ ভালো কিন্তু ব্যবহারে কাঠখোট্টা। চলনবলনে সাদাসিধে তবে স্পষ্টভাষী। অনেক কাজেই রুক্ষসুক্ষ হিসেবে চিহ্নিত। নিজের সহপাঠীদের সাথে তেমন মেলামেশা ছিলো না তাঁর, হলের কালচারাল ফাংশনেও যেতেন না তিনি। নাচ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য হলো, হাত পা এদিকে ওদিক নাড়াচাড়া আর লম্ফজম্পর মধ্যে দিয়ে কি যে বলতে চায় নর্তক বা নর্তকী তা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। এ নিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ রুমমেটের সাথে তর্ক করা বেয়াদবি। তাই চুপ করে তাঁর মতামতের সাথে একমত না হলেও শুনতে হতো। সম্প্রতি প্রয়াত সেই রুমমেট স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

জহির রায়হানের সাথে ঐ রুমমেটের গল্পের কি সম্পর্ক স্বভাবত এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ছোটগল্প লেখক হিসেবে জহিরের সুনাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই ছিল। বামপন্থী রাজনীতির সাথে ছিল জহিরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সুবাদে এক বছরের জুনিয়র হলেও জহিরের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় লাগেনি। জহিরের আর একটি বিশেষ গুণের জন্য সে বন্ধুমহলে ছিল খুব আদৃত। সেকালের অবগুণ্ঠনবতী ছাত্রী মহলেও তার ভক্তের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। মুখ ফুটে না বললেও সেজন্য জহিরকে অনেক বন্ধুই ঈর্ষা করত। সেই বিশেষ গুণটি ছিলো, জহির মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারত। বিশ্বাস করুক না করুক যে কোন ভবিষ্যৎ বক্তাকে সামনে পেলে হাতটা বাড়িয়ে দেয় না এমন লোকের সন্ধান অন্তত আমার জানা নেই। যারা আল্লা খোদায় বিশ্বাস করে না তারাও পড়েন এ গোত্রে।

যে রুমমেটের কথা বলছিলাম, তিনি একদিন প্রাত্যহিক নিশিকালীন আড্ডায় বসলেন, দেখিতো তোমার বন্ধু জহির রায়হানকে আমাদের রুমে নিয়ে আসতে পার কিনা। অবাক কাণ্ড। একি শুনি আজ মন্থরার মুখে। রাজনীতির নাম যিনি শুনতে পারেন না, সাহিত্য সম্পর্কে যার কোন আগ্রহ নেই তিনি আজ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিক এক ব্যক্তিকে নিজ রুমে আনার জন্য আমার সাহায্য চাইছেন। কৌতূহল বশে এর কারণ জানতে চাইলাম।

আনই না, পরে বলব, জানালেন রুমমেট হাসিমুখে। আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা খোলসা না হলে জহিরকে কিভাবে আমন্ত্রণ জানাবো। আমার পীড়াপীড়িতে রুমমেট মুচকি হেসে বললেন, তোমার বন্ধুকে হাতটা দেখাবো। বুঝলাম, রুমমেট আমার সুপেরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এম এ পরীক্ষার পরপরই সিএসএস-এর পরীক্ষা। সেই সময়ের নিয়মানুযায়ী সিএসএস পরীক্ষার্থীরা ধরনা দিতেন ভাগ্য গণনাকারীদের কাছে। এরমধ্যে সেমি প্রফেশনালদের কাছেই যেতো বেশির ভাগ ভাবী সিএসপি'রা। যারা মুখচোরা তারা শরণাপন্ন হতো বন্ধু মহলে পরিচিত হস্তরেখা বিশারদদের কাছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন সেই শুভমুহূর্ত এসে গেলো। জহিরকে নিয়ে এলাম ফজলুল হক হলের তিন তলায় আমাদের রুমে। অধীর আগ্রহ নিয়ে রুমমেট প্রতীক্ষায় ছিলেন। খুশী হলেন জহিরকে আমার সাথে রুমে ঢুকতে দেখে। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর রুমমেট লাজনম্র মুখ করে হাতটি বাড়িয়ে দিলেন জহিরের দিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতটি দেখছে জহির, কপালে তার কুঞ্চন রেখা। দু'মিনিট সময়, মনে হলো কয়েক ঘন্টা। রুমমেট-এর চোখেমুখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। অর্থাৎ বলুন না কিছু একটা। জহির চুপ, মনে হলো ধ্যানমগ্ন। কিছু একটা বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে রুমমেট অনুনয়ের স্বরে জহিরকে কিছু একটা বলতে অনুরোধ করলেন। না বললেই কি নয়? জহিরে উত্তর। যা হয় বলুন, রুমমেটের অনুরোধ। তিনটি শব্দ উচ্চারণ করলো জহির: ক্রুড, শ্রুড, ক্রুট। এগুলি শব্দ নয়, যেনো তিনটি বুলেট। রুমমেট অট্টহাসি দিয়ে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিলেন। আমিও বেঁচে গেলাম।

ভদ্রতার খাতিরে সিনিয়র রুমমেট জহিরকে আমার হাতটা দেখতে বললেন। ওর হাত কি দেখবো! জহিরের নির্লিপ্ত উত্তর। ওকে তো দেখছি সব সময়। আজ না হয় আবার দেখলেন, আমার হয়ে ওকালতি করলেন রুমমেট।

হাতটা বাড়ান তা দেখি, জহির বলল আমাকে। মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও ভাব দেখালাম ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত। অগত্যা হাতটা এগিয়ে দিলাম। আর প্রমাদ গুণলাম কি বলে ফেলে জহির। ও যেরকম স্পষ্টভাষী। ওর যা মনে হবে তাই বলে

ফেলতে কুণ্ঠাবোধ সে করবে না। একটু আগেই তো তার প্রমাণ সে দিয়েছে। আমার ভাগ্যে কি আছে, সে জানে বিধাতা ও জহির। আপাতত জহিরকেই সামনে দেখছি, ভয় তাকে, অন্তত এ সময় বিধাতাকে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। অন্য হস্তরেখা বিশারদরা রেখেটেকে কথা বলেন। কারণ, জাতককে অসন্তুষ্ট করলে জ্যোতিষীর লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। তাই তারা এমন কথা বলবে যার অর্থ দু'রকম করা যায়। স্বভাবত জাতক ভালো দিকটাই দেখে জ্যোতিষীর কথার মধ্যে।

আমার হাতটি ছেড়ে দিয়ে জহির বলল, জীবন আপনার লেখালেখির মধ্যেই কাটবে। হাসি চাপা সম্ভব হয়নি, জহিরের এ অবাস্তব আজগুবি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। রুমমেটের মত অট্টহাসি না হলেও শব্দ করেই হাসলাম। জহিরও হাসল। তার হাসির মধ্যে ছিল তার বক্তব্যের দৃঢ়তা প্রমাণের প্রত্যয়, আর আমারটার মধ্যে অবিশ্বাসের সুর। টিউটোরিয়াল ক্লাসের লেখা দেয়ার আগের রাতে প্রায়ই জ্বর আসতো। আর সেই আমিই নাকি লেখালেখির মধ্যে থাকবো। কি অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী!

মনে পড়লো সেই হিন্দী ছবির কথা। জন্মের পর এক শিশু সম্বন্ধে গণক বলেছিল ওর আগে পিছে গাড়ি চলবে। যৌবন প্রাপ্তির পর জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। ঐ ছেলে হয়েছিলো ট্রাফিক পুলিশ। আমার জীবনেও যে জহিরের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেনি তা নয়। সংবাদপত্রের টেবিলে কত লোকের লেখালেখি দেখতে হয়েছে। রিপোর্ট লেখা, অন্যের লেখা রিপোর্টের ওপর শিরোনাম দেয়াটাতো এক ধরনের লেখালেখি। হেডিং করতে বার বার কাটাছেঁড়া করতে হয়। অনেক সময় রিপোর্টারের বিশুদ্ধ লেখাকে ঠিক করতে গিয়ে অশুদ্ধ করেছি। পরের দিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা বুঝে পেয়েছি। কম্বল ছেড়েছি কিন্তু কম্বল আমাকে আজো ছাড়েনি। এখনো লেখালেখির ধারে কাছে ঘোরাফেরা করি।

লেখালেখির জগতে আসবো কোনদিন ছাত্রজীবনে ঘুণাক্ষরেও তা মনে হয়নি। সংবাদপত্র অফিসে যেতাম দু'চারজন বন্ধু বান্ধব, যারা ছাত্রাবস্থায় পত্রিকায় ঢুকে পড়েছে তাদের কাছে। তাছাড়া ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিয়েও গেছি পত্রিকা অফিসে। কিন্তু এর পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে সংবাদ জগতের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে তা কি ভাবতে পেরেছিলাম।

মোহন মিয়ার মিল্লাতের পথ ধরে অবজারভারে আটকে গেলাম প্রায় তিন যুগ। এর মধ্যে ঢাকায় ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। নতুন এক পত্রিকা বেরুচ্ছে দেশের সেরা সাংবাদিকদের নিয়ে। চারদিকে সাজ সাজ রব। প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলোর

কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। নতুন পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আকর্ষণীয়। যাঁরা এ পত্রিকায় আসছেন তাঁদের নাম মুখে মুখে ফিরতে লাগল। অবিলম্বে পত্রিকার প্রকাশনার ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। এ পর্যায়ে এক সূত্র থেকে আমার মতামত চাওয়া হল আমি রিপোর্টিং টিমে আসতে ইচ্ছুক কিনা। চীফ রিপোর্টারের পরের পদটিই আমি পেতে পারি। আর বেতন অবজারভার-এ যা পাচ্ছি তার চেয়ে কিছু বেশি। যারা ওখানে চাকরি নিয়েছেন তাদের বেশির ভাগই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমার রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য নতুন পত্রিকায় যাওয়া হল না। কিন্তু ঐ পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে পড়লাম অল্প দিনের মধ্যে। আজও সেই অভ্যাস বলবৎ আছে। তদুপরি এ পত্রিকাটির সাথে নানাভাবে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে দিনে দিনে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দৈনিক পাকিস্তান রূপান্তরিত হল দৈনিক বাংলায়, যেমন হয়েছে পাকিস্তান অবজারভার থেকে বাংলাদেশ অবজারভার।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে আজকের মতো জন্মের পর থেকে দৈনিক পাকিস্তান পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল তার সচিত্র করুণ বিবরণ প্রকাশের মাধ্যমে দৈনিক পাকিস্তান নিঃসহায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের চিত্র এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে— যার প্রতিফলন ঘটে প্রথম ১৯৭০-এর নির্বাচন ও পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তদানীন্তন দৈনিক পাকিস্তান যে অবদান রেখেছিল সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরা আজও তা অম্লান রেখেছেন। এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

স্বাধীনতার পর হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন কলেবরে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যায় দৈনিক বাংলা। মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিক ঘটনাবলির বর্ণনা দিয়ে দৈনিক বাংলা অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে পত্রিকাটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞ জাতির শ্রদ্ধা জানায়।

বিক্ষোভকালে ঢাকায় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও তার ফলে এক ছাত্রের মৃত্যুর পর দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের জানুয়ারির একদিনে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার পর পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান ও সম্পাদক তোয়াব খান তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি থেকে বিতাড়িত হন। যাক, সে অন্য ইতিহাস। অনেক চড়াই-উৎরাই-এর মধ্য দিয়ে যে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু,

আজ সে পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ।

স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এর জন্য বহু কিছু দায়ী ছিল। জহির রায়হান দেশে ফিরে নিখোঁজ অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের সন্ধান জানার জন্য সম্ভাব্য সকল স্থান চষে বেড়ায়। এক জ্যোতিষী (?) জানায় মীরপুরে কোন এক জায়গায় বন্দী করেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার। মীরপুর তখন ভারতীয় বাহিনীর পাহারায় ছিল। জহির ভাইয়ের সন্ধানে গেল, আর ফিরল না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জহিরের যোগাযোগের কথা আগেই বলেছি। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ঘন ঘন পট পরিবর্তন হচ্ছিল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে। একবার আওয়ামী লীগ একবার কৃষক শ্রমিক পার্টি ক্ষমতায় আসছিল যাচ্ছিল। কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী আবু হোসেন সরকারের বাসায় গেল রাজবন্দী মুক্তির দাবি নিয়ে। নানা ধরনের শ্লোগানে মুখরিত রমনা এলাকা। আবু হোসেন সরকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, দাঁড়ালেন বাড়ির বারান্দায়। শ্লোগানের স্বর তখন উচ্চগ্রামে।

ইশারায় ছাত্রছাত্রীদের থামতে বললেন বয়স্ক মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কে শুনে কার কথা! এক মেয়েলি কণ্ঠ থেকে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উঠল- রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি ছাড়া কোন কথা আমরা শুনতে চাই না। মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণের জন্য মূক হয়ে গেলেন। মুখ খুললেন একটু পরে। এক কোনায় জড়ো হওয়া মেয়েদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, তোমাদের ভেতর কে কথা বলছিলে, সেই বল। মেয়েরা চুপ। তারা তো কিছু বলেনি। অন্য দিক থেকে হাত তুলল এক ছেলে এবং একই মেয়েলি কণ্ঠে বলল, আমি বলছিলাম। হাত না তুললে আব্রাহাম লিংকন থেকে এক ফুট খাটো জহিরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হতো না মোটা চশমা পরিহিত মুখ্যমন্ত্রীর (আব্রাহাম লিংকন-এর উচ্চতা ছিল ছ'ফুট চার ইঞ্চি)।

হরতাল

এই যে সাংবাদিক সাহেব, শুনছেন? পেছনে ফিরে দেখি এক আলট্রা মডার্ন মহিলা। ববকাটা চুল এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্প কাপড়ে তৈরী ট্রান্সপারেন্ট ব্লাউজ পরা মহিলা তার কৌতুক মিশ্রিত স্বরে তির্যকাত্মক সম্বোধনটি যে আমার উদ্দেশ্যে করা তা বুঝতে কষ্ট হল না। কারণ আশপাশে আমার স্বগোত্রীয় কারও চেহারা নজরে পড়ল না। পাকিস্তান আমলের কথা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ (বর্তমান শেরাটন) এক বিদেশী অতিথির সম্মানে দেয়া পার্টিতে অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান সাংবাদিকের মধ্যে আমি ছিলাম অন্যতম। রাত তখন ন'টা। কিন্তু অফিসে যেতে হবে না আজও। সারাদেশে পত্রপত্রিকায় ধর্মঘট চলছে সাংবাদিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে। সাংবাদিকরা তখন ছিল ঐক্যবদ্ধ। অনেক মালিক সাংবাদিকদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে কাগজ বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

সকালে চা-নাস্তা খাওয়ার মতো কাগজ পড়া যাদের অভ্যাস তাদের জন্য এ ছিল এক দুঃসহ যন্ত্রণা। কবে কাগজ আবার বেরুবে তা জানার জন্য বহু পরিচিতজন প্রশ্ন করতেন। আজ এমন উচ্চকণ্ঠে ভদ্রমহিলার আমাকে 'সাংবাদিক' বলে সম্বোধন করার কারণ জানার জন্যে আমাকে প্রশ্ন করতে হল না। স্বয়ং এগিয়ে এলেন মহিলা। বললেন, সাহেব আর কয়দিন এভাবে চলবে? তার বক্তব্যের শানে নজুল বোধগম্য না হওয়ায় বোকার মতো চেয়ে রইলাম তার দিকে কিছুক্ষণ। ভদ্রমহিলার ধারণা হয়ত তার রূপ দর্শন করছি। আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তো জানতেন এটা হবে, তবে আগে ব্যবস্থা নেননি কেন? এখনও হেঁয়ালি। সুতো ছাড়ছেন তিনি আস্তে আস্তে। আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম, কি ব্যবস্থা আমরা নিতে পারতাম দয়া করে বাতলাবেন কি? বিজ্ঞের হাসি হেসে বঙ্কিম দৃষ্টি হেনে বললেন,

এতদিন খবর কাগজ ছাড়া কি মানুষের চলে? (মনে মনে বললাম মেয়েমানুষের তো চলার কথা)। যখন ঠিকই হল সাংবাদিকরা ধর্মঘটে যাবে তখন আপনাদের উচিত ছিল কাগজ অ্যাডভান্স ছাপিয়ে রাখা, তা হলে এ অসুবিধা আমাদের হতো না, ভদ্রমহিলা তার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে আমার উত্তর জানার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। ফ্যাশন পেজ ও কমিক স্ট্রিপস তিনি খুব মিস করেন বলে তাঁর খুব আক্ষেপ। ভদ্রমহিলার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া কি উপায়!

ধর্মঘট হলে কারও না কারও অসুবিধা তো হবেই। শফিক রেহমানের হিসাব মতে আমরা শিগগির সারা দুনিয়া থেকে এগারো দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। ছ'দিনের হরতাল-এর সঙ্গে দুই শুক্রবার ও পরের শনি, রোববার যোগ দিলে মোট দশ দিন হয়। এগারো কি করে হয়, বুঝলাম না। যা হোক হরতাল মানে কাজ কাম বন্ধ। যা নাকি ভারতীয় ভার্সানে বন্‌ধ। কল-কারখানা চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। কিন্তু ছাপোষা লোকদের কি করে চলবে, এ প্রশ্ন সংশ্লিষ্টদের। কেউ বলছে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আসছে অগণিত মানুষ আবহমান কাল ধরে। কলকাতার পত্রিকা 'সচিত্র ভারতে' একটা কার্টুন-এ দেখা গেল, বিরাট বোঝার ভারে কুলি মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর বাবু বলছেন, দেখ, পরিশ্রম না করলে কেউ বড় হতে পারে না। ঐ কুলি জীবনে কত বড় হয়েছিল সে খবর আমাদের জানা নেই।

কিন্তু আমাদের এখানকার ক্ষুদ্র অফিসের বড় সাহেব আম্বর আলীকে দিগম্বর হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও যেতে হয় তার দফতরে। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, আর ভাগ্য ভাল হলে রিকশা, রিকশা ভ্যানে। অযান্ত্রিক শকট হরতাল মুক্ত হলেও, শকটের যাত্রীরা সংকট মুক্ত নন। হরতালের এ কয়দিন কি করে অফিস করবো সেই ভাবনায় নিজের মনই হরতাল করে বসে আছে। আমার মন আমার সঙ্গে একেবারেই কো-অপারেট করছে না। তাই লেখালেখি এবার হল না। এই ফাঁড়া জাতির সঙ্গে সঙ্গে এ অধমও যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, তা হলে আগামী সংখ্যায় লেখার এরাদা আছে। কেন লিখতে পারছি না তার ব্যাখ্যা দিতেই এ লেখা।

রাজনীতি সচেতন প্রয়াত এক সাংবাদিক ইপিইউজে'র এক সভায় ৪৫ মিনিট বক্তৃতা দিলেন একটি পয়েন্টের ওপর। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল, প্রত্যেকের সংক্ষেপে বক্তৃতা দেয়া উচিত।

দুঃখের মাস

বেইজিং-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের অনেক আগের কথা। তখনও সমাজে নারীর সমান অধিকার নিয়ে জোরালো আন্দোলন চলছিল, বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে। উইমেন লিব মুভমেন্টের এক প্রথম সারির নেত্রী ক্যাথেরিনের চার কন্যার পর প্রথম পুত্রসন্তান লাভে তিনি যারপরনাই খুশি। ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য শরণাপন্ন হন তিনি এক জ্যোতিষীর দরবারে। ছেলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, বললেন জ্যোতিষী। মায়ের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। আর একটু খোলাসা বয়ান শুনতে চান নবজাতকের মাতা। ছেলের হাতে এত টাকা আসবে যে সে তা গুনে শেষ করতে পারবে না, জানালেন বিজ্ঞ জ্যোতিষী। নির্ধারিত ফি ছাড়াও একটু বেশি দক্ষিণা দিলেন ক্যাথেরিন জ্যোতিষীকে।

বিলেত-আমেরিকা এমনকি হালে আমাদের দেশেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়ের ভাবনার অন্ত নেই। তাই তিনি অন্য আরেকজন প্রখ্যাত জ্যোতিষীর দুয়ারে হাজির হলেন। দ্বিতীয় জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মা নিশ্চিত হলেন যে তার সোনামানিক জীবনে বহুত সোনাদানার মালিক হবে। জ্যোতিষী জানালেন, এ ছেলে জীবনে ব্যাংক খুলবে। দুই জ্যোতিষীর কথাই ফলেছিলো। টেক্সাসের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক ব্যাংকের শাখায় ছেলেটি চাকরি পায়। প্রতিদিন তাকে প্রচুর টাকা গুনতে হয় এবং সকালে এসে তাকেই ব্যাংকটি খুলতে হয়।

মানুষ যা আশা করে তা বিভিন্নভাবে ফলে। ফলাফল সব সময় যে মঙ্গল বয়ে আনে তা বলা যায় না। এক সময়ের খুব জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল "জাগো, জাগো

বাঙালি জাগো"। আমার এক বালক বন্ধু অফিসে এসে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে জাগাবার পর সে বললো, এমন জাগাই জাতি জেগেছে যে, রাতেও ঘুমাবার উপায় নেই। গত ক'দিন থেকে এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে দুই মাস্তান গ্রুপের লড়াই চলছে। হরেক রকম আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজে কান ঝালাপালা। এর আগে চলছিলো সপ্তাহব্যাপী রাতভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সরব প্রচার।

এছাড়া তো রয়েছে বিয়ে-শাদী উপলক্ষে মাইকে উগ্র দেশী-বিদেশী সংগীতের তাণ্ডব। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের ভোট হলে তো কথাই নেই। বন্ধু ক্ষোভের সাথে বললো, ইচ্ছে করলে পাড়ার লোকেরা তো একত্র হয়ে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বন্ধুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললাম। আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বন্ধু, তার মুখ থেকে কোন বাক্য বেরুচ্ছে না। অথচ আসর জমানোর ব্যাপারে এই বন্ধুর সুনাম ছিলো কিছুদিন আগ পর্যন্ত। লক্ষণ ভালো নয়, বন্ধু আজকাল চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে, হৈচৈ এড়িয়ে চলে। কৈ কিছু বলছো না যে? পাড়ায় হৈচৈ বন্ধ করার ব্যাপারে আমার দেয়া প্রেসক্রিপশান সম্পর্কে তার মতামত জানার জন্য তাগাদা পেয়ে বন্ধু করুণ সুরে বললো, না ভাই, কেরামত আলীর মতো মেরামত হতে আমি পারব না।

সন্ধ্যাবেলায় একদিন কেরামত আলী পাড়ার ক্লাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঢুকলেন পাড়ার কুতুবদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিতে। প্রথম ঘুষিটার কথা আবছা আবছা মনে পড়ে কেরামত আলীর। এরপর তার আর জ্ঞান ছিল না। পাড়ার ডাক্তার যথাসাধ্য চিকিৎসা করে সারিয়ে তুললেন কেরামত আলীকে। আর রাতের অন্ধকারে মাস্তান-কাম-কন্ডাক্টর ভ্রাতুষ্পুত্রের ট্রাকে করে কেরামত আলীকে সপরিবারে পাড়া ত্যাগ করতে সাহায্য করেন ডাক্তার সাহেব। বাইবেল বলেছে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। শত্রুকেও ভালবাসতে বলেছে একই ধর্মগ্রন্থ। এক পশ্চিমা মনীষী বলেছেন, প্রতিবেশী ও শত্রু একই ব্যক্তি তাই বাইবেলের এই উপদেশ।

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় বিচিত্র সব খবর। ভাই-এর হাতে ভাই খুন। ছেলের ছুরিকাঘাতে মা নিহত। কোথাও শ্বশুর কর্তৃক জামাই লাঞ্ছিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখলকে কেন্দ্র করে এত জন হত এত জন আহত। স্বামী হত্যার দায়ে স্ত্রী গ্রেপ্তার। দা দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রী হত্যা। বোমার আঘাতে রিকশাচালক আহত। এ ধরনের খবর দেখতে দেখতে মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে মা-বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। আক্র রক্ষা করে স্বামী অফিসে পৌঁছলো কিনা তা নিয়ে স্ত্রীর ভাবনার অন্ত নেই। অস্থির ও অশান্ত অবস্থার অবসান হোক-এটাই সকলে কামনা করে।

কিন্তু জাগ্রত ব্যাঘ্রকে সামাল দেবে কে? জাতি যে জেগেছে, ঘুমাবার নাম নেই। বাঘকে জ্যান্ত ধরতে হলে শিকারীরা ট্রাংকুলাইজার বুলেট ব্যবহার করে থাকে। ঐ বুলেটের আঘাতে বাঘ মরে না, মরার মতো পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে, বাঘকে শিকারী খাঁচায় ভরে নেয়, আস্তে আস্তে বাঘের হুঁশ ফিরে আসে। আমাদের অশান্ত সমাজকে প্রশান্তির মায়াডোরে বাঁধার জন্য কি কোন ট্রাংকুলাইজার বুলেট প্রয়োগ করা যায় না! কথায় আছে পৃথিবীতে সমস্যার চেয়ে সমাধান রয়েছে বেশি। নাকি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ, "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, / শান্তির ললিত বাণী শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস" শুনে যেতে হবে অনাদিকাল।

বেইজিং নারী সম্মেলনের মূল মন্ত্র, ক্ষমতায়নে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। আর আজ আমাদের দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের আকুল আর্তি হলো সুস্থ, স্বাভাবিক ও মানবিক জীবনযাপনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। অস্থির, অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন সমাজ জাতির অগ্রগতির পথে অন্তরায়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের শতাব্দীকালের বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে উভয়পক্ষের সত্য উপলব্ধির পর। একইভাবে প্যালেস্টাইনীদের চরম শত্রু ইসরাইলের সাথে হয় শান্তি চুক্তি। রক্তাক্ত বসনিয়া শান্তির অন্বেষায় ছুটে যায় সুদূর ওহিও'তে। কিন্তু আমরা পারছি না আমাদের দ্বন্দ্ব মিটাতে। প্রশ্ন সবার, কেন এ দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়? সংঘাতে লিপ্ত অশান্ত সমাজকে লক্ষ্য করে নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।" আমাদেরও প্রত্যাশা রাত্রির অমানিশা কেটে গিয়ে পূর্ব আকাশে দেখা দেবে সোনালী সূর্য।

কলেজ জীবনে দেখা বলরাজ সাহনী অভিনীত 'হামলোগ' ছবির একটি বিখ্যাত ডায়লগের কথা আজ মনে পড়ছে। যিস দিয়া মে তেল নেহি হ্যায় উসকি জ্বলনে কি কৈই অধিকার নেহী। নায়ক বলরাজ সাহনী এ প্রশ্নের উত্তরে বলছে, দিয়াতো খোদ নেহি জ্বলতি, উসকি তেল জ্বলতি।

তৈল জ্বলকে যব পুরা হো জায়গা তব কেয়া হোগা? পুনরায় প্রশ্ন।

তব সুবাহ্ হো জায়গা, নায়কের জবাব।

খোন্দকার ইলিয়াস

কাজী সিরাজুল হক ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তিনি যেমন ছিলেন কড়া, তেমনি স্নেহপ্রবণ। তাই সকলে তাঁকে ভয় করত। তাঁর কথার অবাধ্য জেলা স্কুলের কোন ছেলে হয়েছিল কিনা অন্তত আমার জানা নেই। তবে প্রয়াত কাজী স্যারের একটা নিষেধ মানতে পারিনি। কিশোর মনে ঐ নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ইচ্ছা দমন করা আমার মত আরও কয়েক জনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে কিভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, যতো পারবে পড়বে, তবে পড়ার মধ্যে বিষয় নির্বাচনটা করতে হবে সতর্কতার সাথে। কিছু কিছু বিষয় আছে যা পড়লে মঙ্গলের চেয়ে জীবনে চলার পথে ক্ষতিই হয় বেশি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। "ললিতা" ও "লেডী চ্যাটার্লী'স লাভার" বই দু'টির উল্লেখ করেছিলেন তিনি এ প্রসঙ্গে। সাপ্তাহিকটির নাম 'যুগের দাবী'। এমনিতে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তখন আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু 'যুগের দাবী'র নামটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল সে দিনই। কি করে যেন 'যুগের দাবী'র পুরনো দু'একটা কপি দেখার সুযোগ জুটে গেল ক্লাসের এক সেয়ানা বন্ধুর বদৌলতে। বন্ধু এক শর্তে পত্রিকার কপি দেখালেন, কাউকে বলতে পারবো না। সবচেয়ে বড় ভয়, কাজী সাহেব জানলে কম্ম কাবার। ছাত্রদের পিতা বা গার্জেনরাও শেরোয়ানী রুমি টুপি পরিহিত কাজী সাহেবকে সমীহ করতেন। 'যুগের দাবী' সে সময়ে এক ধরনের যুবকদের ইচ্ছা পূরণে কিছুটা সফল হলেও সুধী মহলে সাপ্তাহিকীটি মোটেই কল্কে পায়নি।

ঢাকায় চলে এলাম কলেজে পড়ার জন্য। এখানে ওখানে 'যুগের দাবী' চোখে পড়লেও ওটা পড়ার তেমন উৎসাহ বোধ করতাম না। বাহান্ন সালের রক্তাক্ত

একুশে ফেব্রুয়ারির পর দেখি সাপ্তাহিকীটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সাহসী শিরোনাম দিয়ে জোরালো সব লেখনী বেরুচ্ছে এ সাপ্তাহিকীটিতে। আমরা বিস্মিত 'যুগের দাবী'র এ ভূমিকা দেখে। পত্রিকাটির মালিক সম্পাদককে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হল গণচীনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন থেকে প্রত্যাগতদের সম্মানে দেয়া, সম্ভবত ঢাকা জেলা পরিষদ ভবনে সংবর্ধনা সভায়। সম্পাদক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস-এর নাম শুনেছি আগে দু'একজন বন্ধুর মুখে। মাও সেতুং যে ধরনের পোশাক পরতেন, সে রকম পোশাকে ভূষিত লোকটিকে প্রথম দর্শনেই ভাল লাগল। বিশেষ করে তাঁর উদাত্ত হাসি ও সরল সোজা কথাবার্তা আকর্ষণীয়। একদিনের কথায়ই মনে হল তিনি যেন কতদিনের পরিচিত। এর পর বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তার জন্য নিরলস পরিশ্রম করতে তাঁর জুড়ি তখন দেখিনি। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যখন ছিলেন তখন ছিলেন মওলানা সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত।

স্বদেশে বিদেশে ইলিয়াস ভাই ছিলেন মওলানা ভাসানীর বিশ্বাসী সহচর। ১৯৫৪ সালে হেলসিংকী শান্তি সম্মেলনে খোন্দকার ইলিয়াস ছিলেন মওলানা সাহেবের সফরসঙ্গী। যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। ৯২-ক ধারা জারির পর সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। হেলসিংকী থেকে তখনকার মত আর দেশে ফেরা হল না মওলানা ভাসানী, খোন্দকার ইলিয়াস ও প্রফেসর মুজাফফর আহমদের। মওলানা সাহেব লন্ডনে ছিলেন কিছু দিন, ঘুরলেন ইউরোপের কয়েকটি দেশ। সঙ্গে ছায়ার মত খোন্দকার ইলিয়াস। সেই ঐতিহাসিক সফরের ওপর ভিত্তি করে খোন্দকার ইলিয়াস লিখলেন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ভাসানী যখন ইউরোপে'। পাকিস্তান সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। ইলিয়াস ভাইকে কখনও যেতে হয়েছে কারান্তরালে, কখনও তাঁকে করতে হয়েছে আত্মগোপন।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের সময় খোন্দকার ইলিয়াসের অবদান ছিল অসামান্য। রূপমহল হলে চলছে সম্মেলন। সারা পাকিস্তান থেকে নেতা কর্মীরা হাজির ভাসানীর ডাকে। নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগ থেকে মওলানা ভাসানী সরে এসে সমমনা লোকদের নিয়ে দল গড়ার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন। সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান, সিন্ধুর জিএম সাইদ, পাঞ্জাবের কাসুরী, মিয়া ইফতেখার উদ্দীন, গফুর বালুচ, জানজুয়াসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের এ রকম সমাবেশ, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ সুলতান ও খোন্দকার ইলিয়াসসহ বহু সাংবাদিক লেখক সংস্কৃতিসেবীকে সে সময়ে দেখেছি সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে। তখন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের ১২ জন এমপি'র সমর্থনে রিপাবলিকান দলীয় নেতা ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন। গণতন্ত্রী দল ও কিছু বামপন্থী সংসদ সদস্যের সমর্থন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী সরকারের পেছনে। বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থানরত সিলেটের মাহমুদ আলী ছিলেন আতাউর রহমান মন্ত্রিসভায় গণতন্ত্রীদলের প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদক। হাজী মোহাম্মদ দানেশ সভাপতি।

বলছিলাম রূপমহল হলে অনুষ্ঠিত ন্যাপ গঠন প্রস্তুতি পর্বের সম্মেলনের কথা। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে এসেছে এ সম্মেলনে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শহরে উত্তেজনা, একে বানচাল করার লক্ষ্যে হামলা হয়েছে প্রস্তুতিপূর্ব মিছিল সভা সমিতিতে। নির্যাতনের শিকার হয়েছে সদ্য প্রয়াত মণ্টু খান, রিকশা শ্রমিক নেতা সেলিম ও আরও অনেকে।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট প্রথা বাতিল ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করা হল রূপমহল হলে। এর সভাপতি হলেন মওলানা ভাসানী আর পশ্চিম পাকিস্তানের সভাপতি নির্বাচিত হলেন গাফফার খান। মাহমুদ আলী তখনো মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত। নবগঠিত দলের পূর্ব পাকিস্তান সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার শর্তে তিনি মন্ত্রীত্ব ছাড়লেন।

রূপমহল হল সরগরম। মুহুর্মুহু শ্লোগান উঠছে বাংলা উর্দু সিন্ধী ভাষায়। শ্লোগানের ভাষা ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির পক্ষে উচ্চারিত শ্লোগানে মুখরিত সম্মেলন হল। হঠাৎ খবর এল, সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আগত কয়েকটি খন্ড মিছিলের ওপর আক্রমণ হয়েছে। কয়েকজন আহতকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সম্মেলনে আসার পথে খোন্দকার ইলিয়াস আক্রান্ত হয়েছেন। একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের লেলিয়ে দেয়া গুন্ডাদের আক্রমণে তিনি আহত হয়েছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সম্মেলন স্থলে এলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে। পাঠান বেলুচ স্বেচ্ছাসেবকরা মওলানা ভাসানীর অনুমতি চাইলেন বাইরে গিয়ে বদলা নিতে। মওলানা সাহেব বললেন, 'খামুশ'। সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সম্মেলন ব্যর্থ হবে, তিনি বললেন, এটাই কাম্য প্রতিপক্ষের। ধৈর্যের পরিচয় দিতে তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানালেন।

ইতোমধ্যে আবার দুঃসংবাদ, মিয়া ইফতেখারের গাড়ির ওপর আক্রমণ হয়েছে। যাহোক, এসব সত্ত্বেও সম্মেলন সমাপ্ত হল ন্যাপ গঠনের মাধ্যমে।

পরের দিন পল্টনের জনসভায় লোক সমাগম হল প্রচুর। এর প্রস্তুতির পেছনে ছিল ইলিয়াস ভাইসহ বহু নেতা-কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম। সভা আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সভামঞ্চের ওপর চড়াও হল ভাড়াটে গুন্ডারা। তাদের পরিচালনা করছে কতিপয় চিহ্নিত প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক দলের মধ্যম সারির নেতা। গুন্ডাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন মন্টু খান, সেলিম, ইলিয়াস ভাই। এর মধ্যে সুদর্শন এক ব্যক্তিকে দেখলাম বেপরোয়াভাবে ঘুষি মেরে কুপোকাত করেছেন জনাদু'য়েক আক্রমণকারীকে। পরে জানলাম এই ব্যক্তিটি বর্তমান সংবাদ সম্পাদক আহমেদুল কবির। ডিআইজি আবদুল্লাহ সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসার হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। শান্তি রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, কিন্তু ইতোমধ্যে এক ম্যাজিস্ট্রেট অকস্মাৎ ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা দিয়ে সভা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত বলে অনেকে ধারণা করেন।

স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মওলানা ভাসানী, গাফফার খান ও অন্যান্য নেতা চললেন সদরঘাটে মওলানা সাহেবের ঢাকায় তখনকার আশ্রয়স্থল ব্যারিস্টার শওকত আলীর বাসায়। সঙ্গে চলেছে হাজার হাজার কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রও ছিলাম ঐ দলে। জাতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদউদ্দীন, প্রাক্তন ধর্ম সচিব আবদুল আওয়াল যাচ্ছিলেন মিছিলের সঙ্গে। হঠাৎ নওয়াবপুর রোডে ফুলবাড়িয়া স্টেশনের দিক থেকে মিছিলের ওপর ইট নিক্ষেপ করলে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের কর্মী। তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে পালাবার আগেই মিছিলের কয়েকজন তাকে ধরে ফেলে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়। তার চোখের চশমা জোড়াটি সম্ভবত এনামুল হকের হাতে দেখেছিলাম। সভা ভন্ডুল করে দেয়ায় আমরা সকলে ক্ষুব্ধ, তদুপরি সম্মানিত নেতাদের ওপর এ রকম আক্রমণ ধৈর্য ধরে সহ্য করার অবস্থা তখন আর কর্মীদের নেই।

যাহোক, ন্যাপ প্রতিষ্ঠার পর এর কার্যক্রম শুরুর কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের ওপর আসে চরম আঘাত। ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর দোসর জেনারেল আইয়ুব খান অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ইস্কান্দার মির্জার ভার লাঘব করে নিজেই দেশ শাসনের গুরু দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেন। সুদীর্ঘ দশ বছর দাপটের সঙ্গে দেশ শাসন শেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, গণঅভ্যুত্থানে বিপর্যস্ত আইয়ুব রাজদন্ড তুলে দেন সুরাসক্ত দোসর

ইয়াহিয়া খানের হাতে।

এসব ইতিহাস সর্ববিদিত। তবুও কিছু পুনরাবৃত্তি করছি ইয়াহিয়া ঘোষিত ১৯৭০-এর নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে। ১৯৭০ সালের বারোই নবেম্বর-এর ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয় দক্ষিণ বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদ। অসুস্থ শরীরে ডাক্তারের উপদেশ উপেক্ষা করে মওলানা ভাসানী ঐ অঞ্চল ভ্রমণ করে দেশের এ দুর্দিনে নির্বাচন না করার পক্ষে মত দেন। ন্যাপ প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ঢাকা শহরের শাহজাহানপুর, খিলগাঁও এলাকা থেকে খোন্দকার ইলিয়াস ছিলেন ন্যাপ মনোনীত প্রার্থী। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী গাজী গোলাম মোস্তফা। ভোটের সময় ব্যালট পেপারে খোন্দকার ইলিয়াসের নাম ছিল। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকরা খোন্দকার ইলিয়াসকে ভোট দিয়ে আসে। সেদিন সন্ধ্যায় অবজারভার অফিসে এসে ভোট সংক্রান্ত খবরাখবর নিতে গিয়ে একটি প্রেসরিলিজের প্রতি দৃষ্টি আটকে যায়। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দু'বার পড়ে দেখলাম। না, নির্ভুল বাংলায় লেখা খোন্দকার ইলিয়াসের সই করা বিজ্ঞপ্তি। তিনি ন্যাপ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। এরপর কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ পদ না পেয়েও আজীবন ঐ দলে তিনি রয়ে গেছেন। এর জন্য তাঁর মনে ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ ছিল না।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর এক সময়ের একনিষ্ঠ ভক্ত খোন্দকার ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন মওলানা ভাসানীর মতো একই দিনে ১৭ নবেম্বর। উনিশ বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেন মওলানা ভাসানী।

নবেম্বর মাস বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ঘটনাবহুল। পঁচিশ বছর আগে এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত হয় অগণিত মানব সন্তান। পাকিস্তানী শাসকদের অবহেলায় এরপর বহু লোক মারা যায় রোগে আর ক্ষুধার জ্বালায়। একাত্তরের নবেম্বর মাস ছিল বিভীষিকাময়। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে। দিন গুণছিলাম কবে হবে এ অমানিশার অবসান, কবে মুক্তি পাব নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণের যাঁতাকল থেকে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর ইলিয়াস ভাইয়ের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তাঁর লেখা 'মুজিববাদ' বইটি তিনি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। বইটি সম্পর্কে তাঁর এক ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন, আপনার বইতে মুজিবকেই বাদ দিয়ে সব মতবাদের কথা বলেছেন। এ কথায় ভীষণ মর্মাহত হন ইলিয়াস ভাই। শান্ত সমাহিত ইলিয়াস ভাই রেগে গিয়ে ঐ ভক্তকে বলেছিলেন মনোযোগ দিয়ে পড়লে ও বুদ্ধি থাকলে বুঝবে আমি কি বলতে চেয়েছি।

একটি কথা ঠিক, ইলিয়াস ভাই মনেপ্রাণে কামনা করতেন সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের। শ্রদ্ধেয় সন্তোষ গুপ্তের লেখায় জানতে পারলাম শেষ জীবনে ইলিয়াস ভাই ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন খুব। কোরান শরীফ অনুবাদও নাকি শুরু করেছিলেন। ইলিয়াস ভাইয়ের আত্মা শান্তি পাক এই কামনা করি।

নবেম্বর মাস আমার জন্য খুব দুঃখের মাস। লেখাটি শেষ করে এনেছি এমন সময় প্রেস ইনস্টিটিউটের (PIB) নাসিম জানালো, লুৎফর রহমান গত রাতে মারা গেছে। অবজারভার পত্রিকার প্রাক্তন নিউজ এডিটর ও পিআইবি'র প্রাক্তন ডাইরেক্টর এক সময় শ্রমিক আন্দোলন করার সুবাদে ইলিয়াস ভাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। লুৎফর ও আমি এক সময় একই বাসায় থাকতাম উত্তর শাহজাহানপুরে। আমাদের একই এলাকায় ছিল ইলিয়াস ভাইয়ের বাসা।

নবেম্বর মাস বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসের ২১ নবেম্বর আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দিবস। পঁচিশ বছর আগে এই দিনে আমাদের তিন সশস্ত্র বাহিনী যুগপৎ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে চরম বিজয় অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সে বিজয় অর্জিত হয় বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নয়া দিল্লিতে সাম্প্রতি হেনরী কিসিঞ্জার এক বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

কিসিঞ্জার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ১৯৭১ সালে ভারত যেমন চেয়েছিল, ঠিক তেমনি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হোক তা চেয়েছে আমেরিকা। নয়া দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ২ নবেম্বর প্রাক্তন বুরোক্র্যাট, শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে কিসিঞ্জার বলেন, ভারত এর বিরোধিতা করে, কারণ ভারত চায়নি যে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হোক। ভারত চেয়েছে তার ক্ষমতাবলয় বজায় রাখার জন্য নিজ শক্তি দ্বারা তার উদ্দেশ্য সফল করতে।

প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি হিন্দু'র দিল্লি সংবাদদাতা কে কে কাটাওয়াল পত্রিকার ৩ নবেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছেন, কিসিঞ্জারের এ দাবির পেছনে কোন দালিলিক প্রমাণ নেই।

গুণীজন সংবর্ধনা

সবাই চুপচাপ। বিষাদের ছায়া হলের মিলনায়তনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটু পরেই শুরু হবে নিজামের মৃত্যুতে শোকসভা। গতকাল ফজলুল হক হলের পুকুরে ডুবে মারা গেছে সদালাপী ও স্বল্পভাষী নিজামউদ্দীন। আজ থেকে চার দশক আগের কথা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলো নিজামদের পরিবার দেশ বিভাগের পর। বিজ্ঞানের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র নিজাম হতে চেয়েছিলেন ডাক্তার, বিএসসি পাসের পর। পানি থেকে উদ্ধারের পর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফজলুল হক হলের নতুন তিনতলার প্রথম বাসিন্দাদের মধ্যে আমার মত নিজামও ছিল অন্যতম, যদিও আমরা আলাদা রুমে থাকতাম। যথাসময় শুরু হল সভা। যারা নিজামের নিকট-বন্ধু ছিল তারা বলল নিজামের গুণাগুণ সম্পর্কে। দু'একজন তার সহপাঠী অন্য হল থেকেও এসেছিল আজকের শোকসভায়। সভা প্রায় শেষ পর্যায়ে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মিলনায়তনে ঢুকলেন এক বয়স্ক ছাত্র নেতা। তিনি থাকতেন ঢাকা হলে, যাকে তখন ফজলুল হক হলের এক্সটেনশন বলা হতো। যে পুকুরে নিজাম মারা যায় তার পূর্বপাড়ে ফজলুল হক হল আর পশ্চিম পাড়ে ঢাকা হল। এই পুকুরের পাড়ে শান বাঁধানো ঘাটে আমাদের অনেক বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত কেটেছে আড্ডা দিয়ে। তুমুল রাজনৈতিক আলোচনাও হত ওখানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা। শোকসভার সভাপতির কাছে সদ্য আগত ভারিক্কি ছাত্রনেতা একটি চিরকুট পাঠালেন। সভাপতি চিরকুটের ওপর কিছু একটি লিখে ফেরত পাঠালেন। ছাত্রনেতা এরপর উঠলেন মঞ্চে, আর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শুরু করলেন জ্বালাময়ী ভাষণ। বয়স্ক ছাত্রনেতার বক্তৃতার সাথে আমরা সম্যক

পরিচিত। কিন্তু আজ এই সভায়ও তিনি সেই একই ভাষণের পুনরাবৃত্তি করবেন তা ভাবিনি। তিনি শুরু করলেন, ভাইসব, আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিশিয়ার স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতি রয়েছে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ছাত্র সমাজ সর্বদা সোচ্চার।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে যে সভা চলছিল, ছাত্রনেতার বক্তৃতার শুরুতেই সকলে হতভম্ব। একি বলছেন নেতাজি! সকলের চোখে মুখে একই প্রশ্ন। আজকের সভাতেও আলজিরিয়া, মরক্কো ও তিউনিশিয়ার উল্লেখ উপস্থিত ভাবগম্ভীর পরিবেশকে কেমন যেন হাল্কা করে দিল। সভাপতি বক্তার কাছে ছোট একটি স্লিপ পাঠালেন। স্লিপটি খুলে পড়বার আগেও বক্তা সাম্রাজ্যবাদী কলোনিয়াল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য জোরালো উদাত্ত আহবান।

মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে স্লিপটি তিনি চোখের খুব কাছে নিয়ে দেখলেন। কিছুক্ষণের জন্য সংগ্রামী নেতার বাকরুদ্ধ। এই ছাত্রনেতা ছিলেন শর্ট-সাইটেড এবং তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল বলেও শোনা যায় না। বক্তৃতায় তিনি কখনও সমঝদার পাত্র নন। ঘটনাটাকে সহজ করার জন্য নেতাজি বললেন, সংগঠনের কাজে ঢাকার বাইরে গিয়েছিলাম, তাই নিজামের মৃত্যু সংবাদটি জানতে পারিনি। তিনি স্বীকার করলেন, তিনি মনে করেছিলেন, এটা ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক গতানুগতিক কোন সভা। পরে তিনি নিজামের বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা শেষ করেন।

ছাত্রনেতার বক্তৃতায় মুখবন্ধে আলজিরিয়া, মরক্কো ও তিউনিশিয়া অবধারিতভাবে এসে যেত। ইতোমধ্যে মরক্কো ও তিউনিশিয়া ফরাসী শাসনমুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ ছাত্রনেতার বক্তৃতার মধ্য থেকে সদ্যমুক্ত দুই দেশ মরক্কো ও তিউনিসিয়া বিমুক্ত হতে পারেনি। দু'এক সহবক্তা নেতার বক্তৃতার মাঝে দু'একবার তার কানে কানে সংশোধন করে দেয়ায় তেমন কোন ফল হয়নি। সরল সোজা প্রকৃতির ছাত্রনেতাটি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রতিমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলজিরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়ার প্রতি ঐ ছাত্রনেতার দুর্বলতার কারণ উদঘাটন করল এক সাধারণ ছাত্র। তিন দেশের নামের আদ্যাক্ষর বক্তার তিন-শব্দের নামের আদ্যাক্ষরের সাথে মিলে যায় বলে ঐ গোবেচারা ছাত্রটি আবিষ্কার করে। আবদুল মোমেন তালুকদার-এর আদ্যাক্ষর ও তিন আফ্রিকান দেশের আদ্যাক্ষর-এ এম টি ছিল অভিন্ন।

এ সময় ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন থাকলেও যারা বয়সে বড় তাদের সাথে তুলনামূলকভাবে নবীনদের সম্পর্ক ছিল বড় ভাই-ছোট ভাই-এর মত। তাই আমরা

মোমেন তালুকদারকে মোমেন ভাই বলে ডাকতাম। যারা ছাত্র রাজনীতি করত তাদের মধ্যে মানসিক উদারতা লক্ষ্য করা যেত আজকের তুলনায় অনেক বেশি।

হল ইলেকশনের সময় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সরগরম হয়ে উঠত। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে মোর্চা গঠিত হত। নির্বাচনের আগের দিন রাত থেকে চলত মাইকে জোর প্রচারণা, আর মাঝে মাঝে বাজত জনপ্রিয় গানের রেকর্ড। পোস্টার ফেস্টুনে এখনকার মতই ভরে যেত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন। হলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে নির্মিত হত তোরণ। এমনি এক ইলেকশনের আগে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের তোরণ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি স্থান দখলের জন্য ত্বরিত গতিতে যাচ্ছিলাম আমরা কয়েকজন বন্ধু। বন্ধুদের মধ্যে ছিল জালাল, আওয়াল, আনোয়ার ও আরও কয়েকজন। দু'তিনজন বন্ধুসহ মোমেন ভাই যাচ্ছিলেন ঢাকা হলের দিকে। তাগাদা দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যবান বন্ধু জালালকে একটু জোরেই বললাম, গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়। কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য জালালের নাম বার দু'য়েক উচ্চারণ করতে হল। যা হোক, আমরা আমাদের মনজিলে মকসুদ পূরণ করে পুকুর পাড়ে আড্ডায় বসলাম। মোমেন ভাই হঠাৎ দেখি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার সাথে একটু কথা আছে, চল রেস্টুরেন্টে যাই। কাছেই রেস্টুরেন্ট। বললাম, চলুন। মোমেন ভাই-এর চেহারা মলিন। মনে হল ইলেকশনের ব্যাপারে দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে একটু যেন কাবু হয়েছেন। আমতা আমতা করে মোমেন ভাই শুরু করলেন, দেখ, তোমাকে ছোট ভাই-এর মত দেখি, তোমার কাছে এমন ব্যবহার আশা করিনি। আমিতো ভ্যাবাচেকা। কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। বুঝতে একেবারেই অক্ষম কি এমন ব্যবহার করেছি যে এই মানুষটি ব্যথিত হয়েছেন। অনুরোধ জানালাম, ব্যাপারটা খোলাসা করে বলার জন্য। কুণ্ঠিত স্বরে মোমেন ভাই বললেন, আমাকে দালাল বলে সম্বোধন করাটা তোমার কি উচিত হয়েছে? তখনকার দিনে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষাঙ্গনে চালু হয়নি। দালাল শব্দটি ছিল তখনকার দিনে কঠিন এক গাল। জানতে চাইলাম দিনক্ষণ স্থান, যে সময়ে আমা-কর্তৃক এ হেন একটি শব্দ একজন সিনিয়র ছাত্র রাজনীতিবিদ্ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সন্ধ্যাকালে পুকুর পাড়ে আমাদের কর্মোদ্যমের সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সত্যি আমি আজ দুঃখ পেয়েছি, তোমার মুখ থেকে এরূপ একটা গালি শুনে। মনে পড়ল, হ্যাঁ, আমাদের সামনে দিয়ে, মোমেন ভাই যাচ্ছিলেন, আর আমি জায়গা দখলের জন্য তাড়া দিচ্ছিলাম জালালকে। গোল বেঁধেছে, 'জালাল' আর 'দালালে। কথা বুঝিয়ে বলার পর উদাত্ত কণ্ঠে হেসে

মোমেন ভাই বললেন, তাইতো বলি, তোমার মত ভাল ছেলে এমনতো ব্যবহার করতে পারে না।

মোমেন ভাই প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে গিয়েছিলেন কক্সবাজার সফরে। ওখানে থাকেন পর্যটনের মোটেলে। মোটেলের রক্ষণাবেক্ষণ দেখে তিনি যারপরনাই নাখোশ হলেন ওখানকার কর্তৃপক্ষের ওপর। মোটেল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির প্রমাণ হিসেবে তিনি ঢাকায় নিয়ে আসেন ভিআইপি রুমের জন্য বরাদ্দকৃত বালিশের ওয়াড়। এরপর উনি আর বেশি দিন ওজারতি করেননি।

এক শোকসভার কথা দিয়ে শুরু করেছি, শেষ করছি এক গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দিয়ে। শহরের এক আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের বলরুমে বেশ কয়েকজন অখ্যাত গুণীজনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিদেশী দূতাবাস ও দাতা সংস্থার অনেক নামীদামী ব্যক্তি ছিলেন আমন্ত্রিত। রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে পরিচিত ধনী এক শিল্পপতি হলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। শিল্প-সাহিত্য জগতে সবার জন্য দান-খয়রাত করার জন্য ঐ শিল্পপতির সুনাম রয়েছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। অনুষ্ঠান শুরু হল এক টিভি তারকার উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে। সভাপতির সামনে রয়েছে জগ ভরতি পানি ও ক্রিস্টালের গ্লাস। সভাপতি কিছুক্ষণ পর পরই খাচ্ছিলেন পানি। পূর্ণ জগ প্রায় শূন্য হয়ে এল। এরমধ্যে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন গুণীজনদের গুণগান গেয়ে উপস্থিত অতিথিদের কাছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কথা বললেন। সভাপতি সাহেবকে কেমন যেন বিচলিত মনে হল। তিনি অস্বস্তিবোধ করছেন। নড়েচড়ে বসলেন কয়েকবার। পাশে উপবিষ্ট এক উদ্যোক্তা সভাপতির দিকে ঝুঁকে কি যেন বললেন বা শুনলেন। সভাপতি সাহেব হুট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ত্বরিত গতিতে দরজা দিয়ে যেই বেরিয়ে যাচ্ছেন, অমনি উনার পেছনে ছুটলেন তার সাথে আসা লোকজন ও উদ্যোক্তাদের কয়েকজন। অতি স্মার্ট এক মহিলাও ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে। সবাই বিস্মিত, সভাপতির এরূপ আচরণে— কথা নেই বার্তা নেই হুট করে চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পেছনে তাঁর মিছিল। কেন তিনি উঠে এলেন, সকলের চোখমুখে একই প্রশ্ন। তাঁর গন্তব্য স্থানই বা কোথায়? কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সভাপতি সড়সড় করে ঢুকে পড়লেন পুরুষ মানুষের মুখাকৃতি অংকিত ছোট ঘরে নিজেকে হালকা করতে। বাইরে দন্ডায়মান মিছিলের লোকেরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বিলম্বিত শোকসভা !

দশ ক্রোশ দূরে আবেদ আলী যাচ্ছে কুটুম্ববাড়ি। রাস্তায় দেখা কলিমুদ্দির সাথে। কিছু একটা কথা দিয়ে তো আলাপ শুরু করতে হয়। আবেদ আলীর নিজের বুদ্ধির ওপর খুব আস্থা। তার বিশ্বাস, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সে পারঙ্গম। নিজের স্বরটাকে যদ্দূর সম্ভব মোলায়েম করে আবেদ আলী কলিমুদ্দিকে শুধালো, হুনছিলাম তুমি না মরছো? না, আমি না, আমার ভাই মরছে সাপের কামড়ে, কলিমুদ্দির সংক্ষিপ্ত উত্তর। অবিচলিত আবেদের পুনরায় প্রশ্ন, কামড়াইলো কোন হানে। ভাই হুইয়া আছিলো কাচারী ঘরে, গোখরা হাফ ছোবল মারলো কানের লতির পাশে। এ্যার পরই সব সাবাড়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জানালো ভ্রাতৃবিরহে কাতর কলিমুদ্দি। এরপরও পথ চলতে চলতে আবেদ আলী উচ্চারণ করলো সান্ত্বনার বাণী- আল্লাহর রহমতে চোখ বাঁইচা গেছে।

আবেদ আলীরা এখন গ্রাম ছেড়ে শহরে ঢুকেছে। এদের সদম্ভ পদচারণায় নগর জীবন প্রকম্পিত, কখনো বা স্তম্ভিত। এদের কেউ বা অধ্যাপক, কেউ আইনজীবী বা শিল্প-সাহিত্যের কারবারী। পোপের সার্টিফিকেট নিয়ে হেভেনে যাওয়া যায় বলে কোন কোন ধর্মান্ধর যেমন বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি কতিপয় রেজিস্টার্ড গুণীজনের কৃপাধন্য হয়ে সমাজে সংস্কৃতিমনা বলে আখ্যায়িত হওয়া যায়, কারো কারো রয়েছে এমন ধারণা। উঠতি টাকাওয়ালাদের মধ্যেও এ মনোভাবটা প্রকট।

গত রমজানের শেষের দিকে এক জমজমাট ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে এক উঠতি ধনীর বাড়ির বাড়তি জায়গায়- লনে। নাতিদীর্ঘ লনটি শামিয়ানা দিয়ে ঢাকা। টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে থরে থরে বিভিন্ন রকমের খাবারের আইটেম। হালিম জাতীয় খাদ্য ও চিরাচরিত পেঁয়াজ ছোলাভাজি বেগুনী

ছাড়া ওর মধ্যে রয়েছে ধামাভর্তি মুড়িচিড়া, কোরানো নারকেল। দেশজ ভাব আনার জন্য চিড়া রয়েছে ভেজানো, বরফের টুকরো ভাসছে এর ওপর। আরো রয়েছে কুল-বরই এবং তখনকার মত দুষ্প্রাপ্য পেয়ারা। বঙ্গ সংস্কৃতির একজন বড় 'কনসিয়ার' বলে ইতোমধ্যে এই ধনী লোকটির নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছুতানাতা ধরেও তাঁর বাড়িতে পার্টি হয় ঘন ঘন। দুর্লভ পাটিসাপটা, চিতই পিঠা, তালের বড়া থাকে ঐ সব পার্টির মেনুতে। তবে বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়নের হরেক রকম ব্যবস্থা রাখতে অতিথিপরায়ণ নব্যধনী লোকটি ভোলেন না।

ইফতার পার্টিতেও আজ অবধারিতভাবে উপস্থিত রয়েছেন ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের কূটনীতিকবৃন্দ ও দাতা সংস্থার সম্মানিত প্রতিনিধিরা। উদার অতিথিপরায়ণ, ধর্মপ্রাণ, নব্যধনী ব্যক্তিটি স্বধর্মের রোজাদারদের থেকে অন্য ধর্মাবলম্বী আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের দিকে নজর রাখছেন বিশেষভাবে। তাঁর সুযোগ্য স্ত্রীও স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে বিদেশী মেহমানদের সাথে হ্যালো, হাউডু ইউ ডু করে যাচ্ছেন। যেসব দেশের সাথে হোস্ট-এর ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে সে সব দেশের কূটনীতিকরা আজকের ইফতার পার্টির বিশেষ আকর্ষণ।

দ্বিতীয় সারির সমাদৃতরা হলেন যারা সকল জাতীয় সমস্যার ওপর তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়ে থাকেন। ফারাক্কা, পুশ-ইন, কাশ্মীর সমস্যার মত 'নগণ্য' ব্যাপার নিয়ে ঐসব কৃতী পুরুষরা মাথা ঘামান না। মাগরেবের আজান পড়ার সাথে সাথে অতিথিদের বিশেষ একটি অংশ কোনরূপ সময় নষ্ট না করে সরাসরি হামলা করলেন খাওয়ার টেবিলের ওপর। অল্পক্ষণের মধ্যে ইফতার খতম, মানে ইফতারের মূল আইটেমগুলো শেষ। রোজাদাররা রোজা খোলার দোয়া শেষ করার আগেই টেবিল মোটামুটিভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, একটা কলা হস্তগত করতে সক্ষম হলাম। পাশে ধামায় রক্ষিত কিছু মুড়ি দিয়ে কলার সদ্ব্যবহার করলাম। ইচ্ছা ছিলো নারকেল আর গুড় দিয়ে চিড়া-ভিজা ভক্ষণ করবো। কিন্তু সে গুড়ে 'স্যান্ড'। চিড়ার বাটিতে রয়েছে শুধু অনেকগুলো ভাসমান বরফখণ্ড। আর কোরানো নারকেল তো আগেই উধাও।

তৃপ্তির সাথে ইফতার শেষ করে এক কোণায় আড্ডার দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে গেলাম। ও দিকে যাবো কি যাবো না, এ সংশয় মনে। কারণ যারা ওখানে অধিষ্ঠিত তারা সব সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের নামজাদা ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল নক্ষত্র। এমন সময় বন্ধু শফিক রেহমান গলদঘর্ম হয়ে ভাঙা হাটে আগমন করলেন। বিশেষ এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শফিক রেহমানকে এত দেরীতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে শফিক বললেন, কল্পনা দত্তের শোকসভা থেকে আসতে দেরী

হলো। অনেক বক্তা, শেষ না দেখে আসা সম্ভব হলো না।

এক সংস্কৃতিসেবী ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন, কল্পনা দত্তের জন্যে এবার হঠাৎ শোকসভা করার মাজেজা কি? এর আগে বাংলাদেশে তো কল্পনা দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়নি। প্রশ্নটি ছুঁড়ে মেরে সংস্কৃতি ক্ষেত্রের মহান ব্যক্তিটি হিমালয় প্রমাণ গাম্ভীর্য নিয়ে উত্তর পাওয়ার প্রতীক্ষায় রইলেন। হৈচৈ করা আড্ডায় নীরবতা নেমে এলো। শফিক কিছু বলার আগেই তাঁর এক বন্ধু এগিয়ে এলো তার সাহায্যে। বন্ধুটি বললো, কল্পনা দত্ত এবারই প্রথম মারা গেলেন কিনা তাই আগে তার জন্য শোকসভা করা হয়নি। বহু গুণে গুণান্বিত সংস্কৃতিসেবী অধ্যাপকটি মনে হলো হাজার ভোল্ট-এর ইলেকট্রিক শক খেলেন। কলা অনুষদের সম্মানিত অধ্যাপকের হাতে ছিলো একটি অর্ধসমাপ্ত কলা। কি এক কাজের কথা মনে পড়ায় কলাটি সমাপ্ত না করেই তিনি আড্ডা থেকে 'রোকসুদ' হয়ে গেলেন।

বিপ্লবী নেত্রী কল্পনা দত্তের নামের সাথে ছোটকাল থেকে পরিচয় হয়, প্রবাসী বসুমতী জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির অন্যতম নেত্রীকে চর্মচোখে দেখার সুযোগ হয় একবার। তখন আমি স্কুলের নিচের ক্লাসের ছাত্র। নদীগর্ভে বিলুপ্ত নোয়াখালী জেলা শহরের নাগপাড়া ছিলো কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, আরএসপি পার্টিসমূহের ঘাঁটি। অরুণ স্কুল ও কল্যাণ স্কুলও ছিলো ঐ এলাকায়। কল্যাণ স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনুশীলন দলের সদস্য। এসব কথা জেনেছি পরে।

অরুণ স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছিলাম। আমি ছিলাম একমাত্র সংখ্যালঘু ঐ খেলায়। বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলে মাইনর পরীক্ষা পাস করার পর, নিয়মমাফিক মুসলিম ছাত্ররা যেতো জেলা স্কুলে আর হিন্দু ছাত্ররা অরুণ বা কল্যাণ স্কুলে। বঙ্গ বিদ্যালয়ের সহপাঠী মানু, সুভাষ এবং আরো দু'একজন বন্ধুর বদৌলতে সম্ভ্রান্ত অরুণ স্কুলের ছাত্রদের সাথে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার।

খেলা চলছিলো। আর অদূরে চলছিলো এক রাজনৈতিক দলের সভা। মাইকে শোনা যাচ্ছে অনলবর্ষী বক্তৃতা। কণ্ঠস্বর এক মহিলার। এক পর্যায়ে বক্তৃতা থেমে গেলো। সোরগোল শুরু হলো সভাস্থলে। ফুটবলের চেয়ে গণ্ডগোলটা অল্পবয়সী বন্ধুদের আমার মতই বেশি আকর্ষণ করলো। ছুটলাম নিকটবর্তী সভাস্থলের দিকে। মাইক তখন স্তব্ধ। হট্টগোলের সময় মাইকের তার ছিঁড়ে গেছে। সভামঞ্চে দু'হাত জোড় করে এক রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছেন, বন্ধুগণ, আপনারা কল্পনা দত্তকে ভুল বুঝবেন না। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি; তিনি অখণ্ড ভারতের কথা বলতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন ভারতমাতার দু'সন্তান- হিন্দু মুসলমানদের বিভক্ত করা যাবে না। মুসলমানদের

লক্ষ্য করে ঐ সৌম্যদর্শন বক্তা বললেন, আমি মোজাফফর আহমদ এই নোয়াখালীরই সন্তান। কল্পনা দত্ত এখানে মেহমান। তিনি যদি কোন অন্যায় করে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি।

সেদিনের সেই সভায় কল্পনা দত্তের উক্তির প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন প্রয়াত সাংবাদিক বজলুর রহমান। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। এরপর প্রতিবাদ ওঠে সভাস্থলের অন্যান্য দিক থেকে। কল্পনা দত্ত হয়ত হিন্দু মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে যে দু'টি সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে আলাদা অবস্থানে বিরাজ করতো সেই অবধারিত সত্য সম্পর্কে তাঁর মত নেত্রীও ছিলেন উদাসীন। তাঁর রাজনৈতিক সততা ছিলো প্রশ্নাতীত, কিন্তু কঠিন বাস্তবতাকে তাঁর মত ব্যক্তিত্বও মেনে নিতে পারেননি। তারই অবধারিত পরিণতি উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

কল্পনা দত্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সাথে সাথে এও আশা করবো, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক মানুষ যেন তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য নিগৃহীত না হয়।

কলকাতায় ড. শহীদুল্লাহ

মধ্যরাত অতিক্রান্ত। বিমান যাত্রীদের অনেকের চোখেই ঘুম। শুধু যারা প্যারিসে নামবেন তারা তল্পিতল্পা গোটাচ্ছেন। সুদীর্ঘ পথ উড্ডয়নের পর ডিসি-১০-এ নতুন করে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ বিমানের সুপরিসর উড়োজাহাজটি ফ্রান্সের আকাশ সীমায় প্রবেশ করেছে। অর্লি বিমানবন্দরে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বাংলাদেশ বিমানের পাইলটকে স্বাগতম জানিয়ে ফরাসী সিভিল অ্যাভিয়েশনের এক অফিসার বললেন, বোঁজো, বিজি-জিরো জিরো থ্রি। অর্লি, কলিং। দি টারমাক ইজ রেদী ফর ল্যান্দিং। বিজি বাংলাদেশ বিমানের সাংকেতিক নাম, যেমন টিজি হলো থাই এয়ার, আইএ-ইন্ডিয়ান এয়ার, জাল-জাপান এয়ার, আল ইটালিয়া-ইটালিয়ান এয়ার ও বিএ-ব্রিটিশ এয়ার লাইন্স।

অর্লি বিমানবন্দরের উষ্ণ আহবানের ভাষায় বাংলাদেশী বিমানচালক তেমন প্রীত হতে পারলেন না। প্রথম কথাতেই তার মনটা খিচড়ে গেছে। বেটা টাওয়ার থেকে বলছে, 'বোঁজো'। পাইলট কালবিলম্ব না করে বললেন, বুঝবো না মানে! দশবছর থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে আছি, টাওয়ারের সিগনাল বুঝবো না, তা কি করে মনে করলে? অর্লির অফিসারটির আক্কেল গুড়ুম। মনে মনে তিনি বললেন, জানালাম ওয়েলকাম অথচ বাংলাদেশী বন্ধু পাইলট কি মনে করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন! পাইলটের সহকর্মী নেভিগেটর 'বোঁজো' যে এক উষ্ণ সম্ভাষণ তা না বলে দিলে অর্লির কন্ট্রোল টাওয়ার আর আমাদের টাওয়ারিং পার্সোনালিটি সম্পন্ন পাইলটের মধ্যে হয়ত আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলতো, আর তার ফলে বিমানের ল্যান্ডিং-এ বিলম্ব ঘটতো। এখন আবহাওয়া ভালো। বলা যায় না কখন আবার 'ফগ'-এ বিমানবন্দরটি ঢেকে যায়। তাহলে যান্ত্রিক নির্দেশনার ভিত্তিতে

নামতে হবে আকাশযানটিকে যাত্রীদের জানকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। এ রকম অবস্থায় 'ভিজিবিলিটি' থাকে প্রায় শূন্যের কোঠায়। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে বিমানটি নামলো। আর পুনরায় 'বোঁজো' সম্বোধনের প্রত্যুত্তরে সুন্দর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর বাংলাদেশ বিমানের পাইলট ডিসি-টেনটি নিয়ে লন্ডনের পথে পাড়ি জমালেন।

বাংলাদেশ বিমানের এক সুরসিক পাইলট লন্ডনে আমার অ্যাপার্টমেন্টে বসে এ টুটকিটি বললেন। বছর পাঁচেক আগের কথা। পাইলট বন্ধুটি বিমান বিষয়ক আরও মজার মজার গল্প শোনালেন।

ভাষা মানুষে মানুষে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান বাহন। ভাষার ব্যবহার যেমন সৃষ্টি করে নৈকট্য কিন্তু তার বেঠিক প্রয়োগ দুর্বল ভাষা ব্যবহারকারীকে করতে পারে বিড়ম্বিত।

বাংলার এক কৃতী সন্তান যাচ্ছিলেন ফরাসী দেশে। সরকারি বৃত্তি নিয়ে সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৯২৬ সালের কথা। ফরাসী দেশে যাওয়ার আগে ও দেশের ভাষাটি মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন ছোটখাটো আকৃতির কৃতী মুসলিম বিদ্যোৎসাহী যুবকটি। সুদীর্ঘ যাত্রায় মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও আলাপপ্রিয় যুবকটির পাশের সিটে রয়েছেন শিশু-কোলে এক ফরাসী অল্পবয়স্কা মাতা। যাত্রার কিছু পরেই শিশুটি জুড়ে দিল কান্না। মা যতোই থামাতে চান, শিশুটির কান্না ততোই বেড়ে চলেছে। পরোপকারী পাশের সিটের বঙ্গসন্তান মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাদমোয়াজেল, বাচ্চাটি কাঁদছে কেন? তিনি প্রশ্নটি ফরাসী ভাষাতেই করেছেন। মহিলার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। কটমট করে মহিলা তাকালেন প্রশ্নকর্তার দিকে। অনলবর্ষী সে দৃষ্টি। যুবকটি মহিলার আচরণের গূঢ় রহস্য বের করতে সমর্থ হলেন পরে। উচ্চারণের হেরফের হওয়ার ফলে প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে, ছেলেটির কি পিতা আছে? এই বিড়ম্বিত যুবকটি সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সর্বমোট আঠারোটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ্বের এক অন্যতম প্রধান ভাষাবিদ্ হিসেবে পরিচিত লাভ করেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যাঁর নাম।

এই সেদিন বাংলা একাডেমীতে বহুভাষাবিদ্ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মরণে আয়োজিত দায়সারা গোছের এক সভায় যাওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। আমাকে নিয়ে উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা ছিল তেতাল্লিশ। এর মধ্যে ছিলেন এক বিদেশিনী। সভা চলার এক পর্যায়ে দু'জন শ্রোতা চলে গেলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বাংলা একাডেমীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিসভায় এসে মহামূল্যবান সময়

নষ্ট করার সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বহু গুণমুগ্ধ অধ্যাপকের সেদিন হয়নি।

সাহিত্য জগতের বহু কৃতী পুরুষদের সেই একই দিন সন্ধ্যাবেলায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ও জাঁকজমক সম্পন্ন এক অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছিল। ধানমন্ডির বিলাসবহুল এক বাড়িতে কোন এক ধনী সংস্কৃতিসেবীর মূল্যবান এক কিতাব প্রকাশনা উৎসবে যেতে হয়েছিল স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের। এই বিরল কিতাব নিয়ে শুনেছি অনেক সারগর্ভ আলোচনা হয়েছে। প্রকাশনা উৎসবটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানকেও হার মানিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ ওখানে বেশি হবে। খানাপিনার ব্যবস্থাও ছিল ওখানে উঁচুদরের। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ বিলুপ্তপ্রায় পৃথিবী থেকে। কিন্তু সামন্তবাদী মনোভাব লালিত হয়ে আসছে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মনেপ্রাণে। এরকম পরিস্থিতিতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত গুণীজন হন অবহেলিত, মীর মুশাররফ হোসেন বিস্মৃত। কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তো স্মৃতি থেকে প্রায় বিলুপ্ত।

প্রকাশনা উৎসবের খবর খুব ফলাও করে পরের দিন প্রচার করা হয়েছে। এক পত্রিকাতো ডবল কলম বক্স আইটেম করেছে এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানটির। একই কাগজে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিসভার সংবাদটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।

প্রচারবিমুখ ভাষাবিদ্ শহীদুল্লাহর জীবন শুরু হয় অবহেলা ও লাঞ্ছনা দিয়ে। সংস্কৃতি নিয়ে বিএ অনার্স পাস করার পর শহীদুল্লাহ চেয়েছিলেন সংস্কৃতে এমএ পড়তে, কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হতে পারলো না। শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাঁকে সংস্কৃতে এমএ পড়তে দেয়া হলো না। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জীর শরণাপন্ন হয়েও তাঁর প্রার্থিত বিষয়ে শেষ পর্যন্ত এমএ পড়তে পারলেন না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, এমএ ক্লাসে শহীদুল্লাহ ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু ক্লাস করতে পারলেন না। যে পন্ডিত এমএ ক্লাসে বেদ পড়াতেন তিনি শহীদুল্লাহর মতো অহিন্দু ছাত্রকে বেদ পড়াতে রাজি হলেন না। অগত্যা শহীদুল্লাহকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগ থেকে এমএ পাস করতে হয়। বেদের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী শহীদুল্লাহর প্রতি যে অবিচার করেছেন তা বিশ্বের যে কোন সভ্য সমাজে একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শহীদুল্লাহকে জার্মানিতে বৃত্তি দিয়ে পাঠাবার লোক দেখানো প্রচেষ্টাও বিফলে যায়। স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে শহীদুল্লাহর জার্মানিতে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয়া হয়নি। ব্রিটিশ রাজ্যের অত্যন্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তাঁর সদিচ্ছা থাকলে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত নিয়ে এমএ পড়া

বা বৃত্তি নিয়ে জার্মানিতে যাওয়া অসম্ভব ছিল বলে অনেকেই মনে করেন না।

১৯০৫ সালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন মেনে নিতে পারেনি উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ। তাদের তুমুল আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হল ব্রিটিশ রাজকে। তারই খেসারত দিতে হয়েছে শহীদুল্লাহর মতো আরও অনেক সম্ভাবনাময় মুসলিম যুবকদের। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, উদারমনা বলে পরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়সহ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। যা হোক ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর একই বছর শহীদুল্লাহ সাহেব সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষকের পদে নিয়োজিত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তখন ঐ বিভাগের প্রধান ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহর কর্মক্ষেত্র এত প্রসারিত হতে পারতো কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মহাভারতের সাগরতীরে কত শহীদুল্লাহ হারিয়ে গেছে তার খবর ক'জন রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিকালে তিনি ফরাসী দেশে যাওয়ার সুযোগ পান। সুখের কথা, এ সময় স্বাস্থ্য বা ধর্মগত কারণে তাঁর ফরাসী দেশে যেতে বাধার সৃষ্টি হয়নি।

ধার্মিক অথচ অসাম্প্রদায়িক ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন এক অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর শিক্ষক ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি জ্ঞানকে শুধু গ্রহণ করেছিলেন না, সর্বত্র সেই জ্ঞানকে ছড়িয়ে ছিলেন। করুণাপ্রবণ ও মানবহিতৈষী বলে ডক্টর শহীদুল্লাহকে বর্ণনা করে আলী আহসান বলেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধ নন।

পিতার দুর্লভ চরিত্রের কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সফিউল্লাহ সাহেব লিখেছেন, আদমজী ও দাউদ সাহিত্য পুরস্কার বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে করাচিতে পাকিস্তান লেখক সংঘের এক সভামঞ্চে ডক্টর শহীদুল্লাহ বসেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পাশে। আইয়ুব খান জানতে চাইলেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ আগামীকাল কি করাচিতে থাকবেন। উত্তরে তিনি সদরে রিয়াসতকে জানালেন, না, তিনি কালকেই ফিরে যাচ্ছেন ঢাকায়। পুনরায় আইয়ুব সাহেবের উক্তি, আগামীকাল আমি উর্দু কলেজে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলবো, শুনে আপনার কেমন লাগলো বলবেন। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহর সিদ্ধান্ত একটাই, তাঁর পক্ষে পরের দিন থাকা সম্ভব নয়।

কুদরুতুল্লাহ শাহাব ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব। শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর পদচারণা। তিনি ডক্টর সাহেবকে অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনে যাওয়ার জন্য। এর উত্তরে ডক্টর সাহেব বললেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন কোন বিশেষজ্ঞ নন যে তার বক্তৃতা শুনতে রয়ে যাবো।

হাজার হলেও মোনেম খাঁ ছিলেন বঙ্গসন্তান। তিনি আইয়ুবের ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী সুবেদার। মোনেম খাঁ ডক্টর শহীদুল্লাহ তনয় সফিয়ুল্লাহকে বলেছেন, আইয়ুব খানের কাছে স্যারকে 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব দেয়ার সুপারিশ করতে গিয়ে ধমক খেয়েছেন তিনি। আইয়ুব খান নাকি মোনেম খানকে বলেছেন, তুমি বেতমিজের শিষ্য, তাঁকে (শহীদুল্লাহকে) আমি কোন খেতাব দিব না। তবে আইয়ুবের গদিচ্যুতির পর ইয়াহিয়া খান ডক্টর সাহেবকে 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব দেন। কিন্তু তখন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহজীবনের কর্ম শেষে চলে গেছেন পরজগতে।

করাচিতে উর্দু অভিধান প্রকল্পে ভাষাতাত্ত্বিক উপদেষ্টা হিসেবে ডক্টর শহীদুল্লাহ আসছেন শুনে উর্দু ভাষার একনিষ্ঠ সেবক বাবায়ে উর্দু বলে আখ্যায়িত মরহুম আবদুল হক সাহেবের এক ভক্ত বললেন, বাবায়ে উর্দুর সাথে বাবায়ে বাংলাও আসছেন শুনে ভাল লাগছে। বয়োবৃদ্ধ 'বাবায়ে উর্দু' আবদুল হক বললেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ বাবায়ে জুবান, বাবায়ে বাংলা বললে তাঁকে ছোট করা হবে।

জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ জাতির কাছ থেকে কি কিছুটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেতে পারেন না?

পুনশ্চ: আমার লেখাটি শেষ করার পর সুপন্ডিত ডঃ সুকুমার সেন-এর একটি মন্তব্য আমার চোখে পড়ে। ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্বন্ধে অনেক সাধুবাদ উচ্চারণের পর সুকুমার বাবু লিখেছেন, "তিনি (ডক্টর শহীদুল্লাহ) যদি ঢাকায় না যেতেন বা অল্পস্বল্প রাজনীতির আবর্তে না পড়তেন, যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন জিনিস পেতুম, কোন সন্দেহ নেই।" সুকুমার বাবুর লেখাটি হুমায়ূন কবির সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে "চতুরঙ্গে" প্রকাশিত হয়েছে।

সুকুমার বাবুর মত পন্ডিতজনের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ওপর শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই। যে কৃতী ছাত্রটি শুধুমাত্র অহিন্দু হওয়ার অপরাধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এমএ পড়তে পারলো না, "স্বাস্থ্যগত" কারণে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, সেই একই ব্যক্তি কলকাতা থাকলে 'জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহ' হিসেবে নন্দিত হওয়ার সুযোগ কি পেতো? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রভাষকের চাকরি কি জুটতো শহীদুল্লাহর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে? পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কলকাতা থেকে শহীদুল্লাহর প্যারিস যাওয়া কি সম্ভব হয়েছিল? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের দেশের খাঁটি সন্তানদের জানা একান্ত প্রয়োজন। একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, ইতিহাসবিস্মৃত জাতি কখনো বড় হতে পারে না।

শেষ কথা: হুইল চেয়ারের আকৃতিতে তৈরী বাংলা একাডেমীর ক্রটিযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রক্ষিত চেয়ারে বসে সেদিন মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা কি সুস্থ হয়ে চলতে পারবো না? নাকি চাকাহীন হুইলচেয়ারই হবে আমাদের শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক?

চোর আর লাঠি দু'জন

চোর আর লাঠি দু'জন, আমি আর কালা একলা'। দু'দু'জন প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে তস্কর কি করে পালালো, গৃহস্বামীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে জ্যেষ্ঠ প্রহরীর বিন্দুমাত্র দেরী হয়নি। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সশস্ত্র জাতিসংঘ বাহিনী নেহায়েত একলা, আর সার্ব বাহিনী মুরুব্বীদের বদৌলতে শুধু বলীয়ানই নয়, তারা জাতিসংঘ বাহিনীর নাকে-মুখে যে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে দিয়েছে, তা ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ত্রিকালদর্শী সুরসিক পন্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী জীবিত থাকলে হয়ত বলতেন, জাতিসংঘ সৈন্যদের এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তলোয়ার— ওরা যুদ্ধ করবে কি করে! তবে কথা হলো বেচারা জাতিসংঘেরই বা দোষ কি! যাঁরা এর চাবিকাঠি নাড়ান তাঁরা যদি না চান, তা হলে বিশ্বের মানুষের দেয়া চাঁদায় গঠিত জাতিসংঘের সৈনিকরা অন্যায়-অত্যাচার, নির্মম হত্যা ও মানবতার অবমাননা নীরব দর্শকের মত দেখা ছাড়া কিই বা করতে পারে!

এক নিবন্ধকার বসনিয়ায় নিয়োজিত জাতিসংঘ বাহিনীকে 'খোজা'দের সাথে তুলনা করেছেন। 'খোজা' প্রহরীদের প্রজনন ক্ষমতা না থাকতে পারে, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য হাতিয়ার ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু সশস্ত্র জাতিসংঘ তাদের বসনিয়ার নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা করতে অসমর্থ। কারণ, আক্রমণকারী দস্যু সার্বদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি নেই তাদের। তাছাড়া, জাতিসংঘ বাহিনীর সদস্যদের হাতকড়া পরিয়ে সার্বরা 'হিউম্যান শিল্ড' হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থার প্রতি এ রকম চরম অপমানকর ব্যবহার পৃথিবীর প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে।

শুধুমাত্র তাদের নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে থাকতে চাওয়ার অপরাধে অগণিত অসহায় নিরস্ত্র মানুষ শিকার হচ্ছে বর্বর সার্বদের হামলার। একটির পর একটি মুসলিম ছিটমহল করতলগত হচ্ছে সার্বদের আগ্রাসনের মুখে। দূরে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের সৈন্যরা দেখছে দৈত্যের তান্ডব নৃত্য। ক্ষমতা মদমত্ত সার্বরা কোথা থেকে পাচ্ছে এসব অস্ত্রশস্ত্র? তাদের মুরুব্বী কারা? রাশিয়া জাতিসংঘে ভেটো দিয়েছে যাতে বসনিয়ার মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য কোন স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারে। প্রায় অর্ধ কোটি লোক অধ্যুষিত বসনিয়া-হারজেগোভিনার শতকরা ৪৪ ভাগ মুসলমান। অথচ শতকরা ৩১ ভাগ সংখ্যালঘু সার্বরা দখল করে রেখেছে ৭০ ভাগ এলাকা। তাবৎ বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সার্বরা তাদের নরমেধ যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে অবলীলায়।

মাঝে মাঝে বড় বড় সম্মেলন থেকে হুংকার শোনা যায়, সার্বরা আর একটু বাড়াবাড়ি করলে চরম আঘাত হানা হবে তাদের ওপর। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে তার চতুর কৌসুলি বলেছিলেন, তুমি ফাঁসিতে ঝুলে পড়ো, দেখি আমি কি করতে পারি।

রাজধানী সারায়েভো অবরুদ্ধ। একটার পর একটা মুসলিম ছিটমহল জাতিসংঘের চোখের সামনে দখল করে নিচ্ছে সার্ব দস্যু বাহিনী। দখলকৃত অঞ্চলে চলছে হত্যা, ধ্বংস ও মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির মতো জঘন্য অপরাধ।

মানবাধিকার সংস্থার মুরুব্বীরা আজ কোথায়? স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে জনতার কাতারে এসে যুদ্ধ করেছেন আর্নেস্ট হেমিংওয়েসহ বহু বিশ্ববরেণ্য কবি-সাহিত্যিক। কোথায় আজ সেই সব বরেণ্য সাহিত্যিক শিল্পীর উত্তরসূরীরা?

চিলির শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আমাদের স্বাধীনতার পরপরই ধ্বনি তুলেছিলেন দেশের এক জাতীয় বুদ্ধিজীবী। দেশে তখন চলছিলো দুর্ভিক্ষাবস্থা। সে সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন নিশ্চুপ। আজ কি আমাদের দেশের জাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের বলার কিছু নেই? নেই কি কিছু করার?

সার্ব দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে অনেক মুসলিম মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ছিটমহল তুজলা'র পতনের পর ছবির মেয়ে নিজের হাতে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। কেউ এর নাম জানে না। মেয়েটির জন্য কেউ কাঁদেনি। দাবি করতে আসেনি কেউ তার লাশ। গত ১৫ জুলাই লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় মেয়েটির ছবিও প্রকাশিত হয়। আগের দিন ঐ হতভাগ্য অনামিকা মেয়েটি নিজ হাতে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

বসনিয়া সম্পর্কে উন্নত দেশসমূহের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নবনির্বাচিত ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফরাসী জাতীয় দিবস বাস্তিল দিবসের ভাষণে বলেছেন, ত্রিশ দশকে

ব্রিটিশ ও ফ্রান্স একইভাবে 'হিটলার তোষণনীতি' নীতি গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মধ্যে শিরাক'ই সার্বদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবি করে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি প্রার্থিত সাড়া পাননি বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে। জাতিসংঘ বাহিনীর নীরব ভূমিকার নিন্দা করে শিরাক এই বাহিনীকে নপুংসক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামী ঐক্যজোট মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা না মানার কথা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণা অবিলম্বে কার্যে পরিণত না হলে ইউরোপে মুসলিম অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।

অত্যাচারীকে লাই দেয়া হলে কি পরিণতি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জন মেজর সাহেবের এক পূর্বসূরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে ফুয়েরার হিটলারের সাথে কথা বলে দেশে ফেরেন বীরের মতো। বৃটেনবাসী চেম্বারলেনকে দিয়েছিল তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিকের সম্মান। কারণ, তিনি নাকি উত্তপ্ত ইউরোপকে ঠাণ্ডা করতে সমর্থ হয়েছেন। বৃটেনবাসী তথা সারাবিশ্বের জনগণ অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেল যে, হিটলারের আগ্রাসী ভূমিকা শুধুমাত্র ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের দিকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুত হলোও তাই। পূর্বের কিছু রাষ্ট্র করতলগত করে পরে হিটলার সাহেব পশ্চিমের দিকে হাত বাড়ালেন। আর ফ্রান্সসহ একটার পর একটা দেশ পাকা আমের মত হাতে পেয়ে গেলেন হের হিটলার।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। কিন্তু শ্বেত ভল্লুক রাশিয়া তো রয়েছে দীপ্ত পদভারে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ যোগাচ্ছে সার্ব আগ্রাসীদের। যেমন হিটলার যুগিয়েছিলেন স্পেনের ফ্রাঙ্কোকে। সেই ফ্রাঙ্কো সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সদর্পে শাসন করে গেছেন স্পেনে। সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচ রাশিয়ার অতি প্রিয়পাত্র। রাশিয়ার কাছ থেকে তিনি পাচ্ছেন সব রকম সাহায্য। মনে করার কারণ আছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মরণ হলেও রাশিয়া তার কর্তৃত্ব হারাতে চায় না, অন্তত ইউরোপে। মানুষের রক্তের স্বাদ একবার যে বাঘ পায়, অন্য শিকারে তার রোচে না। তাই বৃটেনসহ আরও কিছু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাশিয়া বলকান অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষ জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী। অতীতেও রাশিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রক্সিওয়ার চালিয়েছে। তাছাড়া রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার চিত্র দেশের মানুষের কাছে ঢাকবার অন্যতম মোক্ষম অস্ত্র, জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দেয়া। চেচনিয়া তার আর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কি ক্ষতি হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত।

মুসলিম অধ্যুষিত চেচনিয়া'র স্বাধীনতা মানতে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী নেতারা রাজি নন। অথচ রাশিয়ার দেশপ্রেমিক বেশ কয়েকজন সমরনায়ক এ প্রশ্নে রাষ্ট্রনায়ক ইয়েলৎসিন-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে পদত্যাগ করেছেন। আবার তাঁর নির্দেশমত কাজ না করার ফলেও তিনি কিছু সমরনায়কের চাকরি খেয়েছেন।

জনমতকে পদদলিত করে কিছু লোক কিছুদিনের জন্য একটি জনপদকে শাসন-শোষণ করতে পারে কিন্তু তা টিকিয়ে রাখা যায় না। হিটলার, মুসোলিনি, নেপোলিয়ান, তোজো— সবাই প্রাণ দিয়ে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন।

আত্মসচেতন কোন জাতিকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা যায় না। অতি বড় শক্তিধর অনেক ইউরোপীয় দেশকে জান নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে কলোনিগুলো থেকে কলংকের কালিমা মুখে মেখে। প্রবল প্রতাপান্বিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ বছর পর এক সময়ের চরম শত্রু ভিয়েতনামের সাথে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। মূল কথা হল, যুদ্ধ, প্রেম আর রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

বসনিয়া'র ঘটনাবলী যদি আরও খারাপের দিকে মোড় নেয় তাহলে এর উত্তাপ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। বসনিয়া সমস্যা সমাধানের সাথে জাতিসংঘের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। বিবেকবান সকল মানুষ আশা করবে, জাতিসংঘের পরিণতি যেন 'লীগ অব নেশনে'র মত না হয়।

ছিটমহলের বাসিন্দারা সব সময় আতংকে থাকে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে পরিবেষ্টনকারী শক্তির মর্জির ওপর। হোক না সেই ছিটমহল বিহাচ বা দহগ্রাম বা আঙ্গরপোতা। নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস দলিত-মথিত করছে নিরীহ আদম সন্তানদের। সেখানে শান্তির ললিতবাণী যেন ব্যর্থ পরিহাস হিসেবে রূপ না পায়, এই হোক আজ আমাদের কামনা।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী

স্নেহময়ী মা সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে গল্প করছে এক কিশোর। একটু কাশলে মা মনে করেন, আমার ব্রংকাইটিস হয়েছে। গা গরম দেখলে ধরে নেন, নিউমোনিয়ায় আমি আক্রান্ত। আর যদি ছোটখাটো মিথ্যা কথা বলি, তখন তিনি নিশ্চিত— আমি বড় হলে রাজনীতিবিদ্ হব। মায়ের সে ধারণা একেবারে ভুল হয়নি। বড় হয়ে সেই কিশোর হয়েছে ব্যবসায়ী-কাম-রাজনীতিবিদ্। টু-ইন-ওয়ান। এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। ব্যবসা রাজনীতির পরিপূরক না তার উল্টো, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য অনাদিকাল থেকে এক স্বীকৃত প্রফেশন, যা সমাজ, দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত। তবে সমাজসেবা করতে গেলে খালি পেটে করা যায় না। বর্তমান জগতে স্বেচ্ছাসেবীরাও তাদের অমূল্য শ্রমের জন্য যৎসামান্য হলেও, সম্মানী পেয়ে থাকেন। তবে এনজিও (নন-গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন) প্রতিনিধিরা যে যৎসামান্য সম্মানী পান তা দেখে অনেকের মর্মপীড়ার কারণ হয়। বাণিজ্যের কথা বলছিলাম। বাণিজ্য করতে গিয়ে ন্যায্য মুনাফা করা কোন গুনাহর কাজ নয়। এটা শাস্ত্রসম্মত প্রাপ্য। কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মানুষের গলাকাটার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। মুনাফাখোর ও মজুতদারদের কোন জাত নেই, নেই ধর্ম। মুনাফাই তাদের ধর্ম ও কর্ম, ধ্যান ও জ্ঞান। অতিরিক্ত মুনাফার জন্যে তারা হেন কাজ নেই, যা করতে পারে না। প্রয়োজনবোধে, আক্ষরিক অর্থে মানুষের, এমনকি নিজ বিজনেস পার্টনারের জীবননাশ করতেও একজন অতি লোভী ব্যবসায়ী সামান্যতম বিবেকের দংশন অনুভব করে না। যদি ঐ লোভী ব্যবসায়ী পার্টটাইম রাজনীতিবিদ্ হয়ে থাকেন তা হলে তো সোনায় সোহাগা। সেই নরঘাতককে ধরে

কার সাধ্য! অর্থবিত্ত ও প্রতিপত্তি সহায় হলে বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ছত্রচ্ছায়ায় চিত্তহীন বিত্তবান আইনের শাসনকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু একদিন তাকে তার অপকর্মের মাশুল সুদে আসলে দিতে হয়। আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী অগাধ সম্পত্তির মালিক আদনান খাশোগী'র আবাস হল মার্কিন কারাগার। যে খাশোগী নিজ জেট বিমানে ঘুরতেন বিশ্বময়। একজন স্বাধীন নরপতিরূপে সেই খাশোগীকেই আটলান্টিক পাড়ি দিতে হয়েছে হাতকড়া অবস্থায় এক যাত্রীবাহী বিমানে করে।

অর্থনীতি শাস্ত্রে বলা হয়, ওয়ান্ট হ্যাজ নো লিমিট। চাওয়ার কোন শেষ নেই। বল্গাহীন চাওয়ার পরিণতি একটি জাতি ও সমাজের জন্য ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

পাকিস্তানের প্রথম দিকের একটি ঘটনা। তৎকালীন মুসলিম লীগের ইসলামী লেবাসধারী এক নেতার আয়ের উৎস ছিল তেজারতি। ঢাকার চকবাজারে ছিল সেই নেতার কর্মস্থল। তার তেজারতির মূল আইটেম ছিল স্নেহজাতীয় পদার্থ, যাকে সাধারণ ভাষায় আমরা তেল বলে থাকি। তেলের ব্যবসাতে ঐ নেতার তরক্কি হচ্ছিল শনৈঃ শনৈঃ।

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকের অবস্থা। মুসলিম লীগের এক ধরনের নেতারা মনে করতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বক্ষেত্রে নানারূপ সুযোগসুবিধা পাওয়ার তাঁরা দাবিদার। ঠিক ঐ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল রাষ্ট্রভাষা ইস্যুকে কেন্দ্র করে। তবে তখন পর্যন্ত তা ছিল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে দেখা দিল লবণ সংকট। দু'আনা সের লবণের দাম গিয়ে দাঁড়ালো ষোল টাকায়। পূর্বোল্লিখিত মুসলিম লীগ নেতা তেল ব্যবসার সঙ্গে যোগ করলেন লবণ ব্যবসা। কথিত আছে, তার দুই সহযোগী একজন নারায়ণগঞ্জে ও অপরজন ঈশ্বরদীতে— ব্যবসা ক্ষেত্রে অভিন্ন মতাবলম্বী হলেও ধর্মের দিক দিয়ে ছিল অন্য ধর্মাবলম্বী। অর্থ ও স্বার্থ তাদের এক করেছে, ধর্ম সেখানে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এই ত্র্যহস্পর্শে মানুষের দুর্দশা বেড়েছে একদিকে, আর অন্যদিকে সম্পদের পাহাড় বেড়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের।

এর পরে আর একটি ঘটনা ঘটে ১৯৭৪ সালে। তাও লবণ নিয়ে। লবণের বিরাট এক মজুতদার কয়েকবার চেষ্টা করেছিল একচেটিয়া বাজার দখল করে বেশুমার মুনাফা লোটার। কিন্তু তার সে চেষ্টা সর্বাত্মকভাবে সফল হয়নি। নারায়ণগঞ্জের লবণ ব্যবসায়ী একই সঙ্গে ছিলেন চালের আড়তদার। রাজনীতিবিদ্ ও বিশেষ বিশেষ মহলে ছিল ঐ মহারথীর গতায়াত। লবণের দাম আস্তে আস্তে

বাড়ছিল। রেশনে লবণের দাম পুনঃনির্ধারিত করার খবর সংবলিত এক বিজ্ঞপ্তি এল সংবাদপত্রগুলোতে। পুনঃনির্ধারিত দাম কিন্তু খোলাবাজারে পাওয়া লবণের দামের চেয়েও বেশি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, খবর কাগজের অফিসে ঐ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আসে আইন প্রণয়নকারী এক সংস্থার সদস্যরা। কেমন যেন রহস্যের ব্যাপার মনে হল।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রয়াত ড. সাত্তার ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, রেশনে কেন খোলাবাজার থেকে দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ড. সাত্তার বললেন, লবণের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধের জন্যই এই আগাম ব্যবস্থা। যুক্তিটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় জিজ্ঞেস করলাম, দ্রব্যটির দাম যে আরও বাড়বে তার পেছনে কোন লজিক আছে কি? অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জানালেন, তাঁরা এ খবর পেয়েছেন লবণ ব্যবসায়ী সমিতির তৎকালীন এক কর্ণধারের কাছ থেকে। পত্রপত্রিকায় লবণ নিয়ে কিছুদিন লেখালেখি চলল এবং সরকার সচেষ্ট হল, মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী লোকদের উৎস সন্ধানে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, সরকারি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্যকারী কর্ণধারটির কর্ণ ধরে পুলিশ নিয়ে গেল তাকে শ্রীঘরে।

সব সময় সব দেশে এ ধরনের মুনাফাখোর ও চোরাচালানীরা বিরাজ করে। দেশ ও দশের চেয়ে নিজের স্বার্থ তাদের কাছে বড়। এদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব না হলেও এদের লিপ্সাকে কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে না রাখতে পারলে সমাজে অস্থিরতা বাড়বে। এর ফলে জনজীবন হয়ে পড়ে দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্ত। অতি লোভী, মজুতদার, চোরাচালানী ও তাদের সহযোগীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেই, তবে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। মনে রাখতে হবে, অপরাধীর কোন জাত বা ধর্ম নেই, নেই কোন নীতিজ্ঞান। ভেক ধরে তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে বাস করে। এসব নীতি বিবর্জিত লোকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব দল মত নির্বিশেষে সকলের।

সেতুবন্ধন

নৈনিতালের কাছে এক সার্কিট হাউজের পরিদর্শন বইতে একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর মন্তব্যে লেখেন, সার্কিট হাউজের বারান্দার ভাঙা রেলিং অবিলম্বে ঠিক করা উচিত। বারান্দায় বসে একটি সেতু নির্মাণের এস্টিমেট তৈরি করার সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ভেতরে যান। পরে এসে দেখেন একটি গরু বারান্দায় ঢুকে টেবিলে রক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এস্টিমেটটি খেয়ে ফেলেছে। বিভাগীয় কমিশনার একই রেষ্ট হাউসে আসেন কিছুদিন পর ইঞ্জনিয়ারের মন্তব্যের নিচে কমিশনার লেখেন, এটা অবিশ্বাস্য এমন কি গরুও পিউব্লিউডি'র এস্টিমেট খেয়ে হজম করতে পারে।

এ চুটকিটি স্থান পেয়েছে শিখ সাংবাদিক-লেখক খুশবন্ত সিং-এর লিখিত গ্রন্থ "নট ও নাইসম্যান টু নো" তে।

২ বৈশাখের খর দুপুরের রৌদ্রে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে উড়লো বিমানবাহিনীর এক হেলিকপ্টার। আকাশ যানটির গন্তব্যস্থল টাঙ্গাইল জেলার এক অখ্যাত স্থান যা ভূঁয়াপুর নামে পরিচিত। প্রয়াত শিক্ষাবিদ্-সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর জন্মস্থান হিসেবে ছাড়া যমুনা-পাড়ে ঐ স্থানটির পরিচয় দেয়ার মত উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। ওখানে যাচ্ছেন কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক। উদ্দেশ্য, নির্মীয়মান যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখা। পত্রিকায় নানা রকম জল্পনা-কল্পনা এই বিশাল প্রকল্পটি নিয়ে। ত্রিশ বৎসরাধিককাল ধরে এ প্রকল্পটির কথা শুনে আসছিলাম। স্বাধীনতার পর এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিলেও নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার জন্যে এই বিশাল কাজটি তখন হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই খুব ইচ্ছা

ছিলো গত বছর প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন স্বচক্ষে তা দেখার। হরতালের কারণে তা হয়ে ওঠেনি।

নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে হেলিকপ্টারে উঠে আমরা যে যার স্থানে গিয়ে বসার পর যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদসহ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ককপিটের কাছে দাঁড়িয়ে এয়ার চীফ বিশিষ্ট যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের অনুমতি পেলে আমি আজকের এ যাত্রায় হেলিকপ্টার চালকের দায়িত্ব পালন করতে চাই। ছোট্ট করে তিনি বললেন, যদি অবশ্য আমার ওপর আপনাদের আস্থা থাকে। মিষ্টভাষী এয়ার চীফকে সকল যাত্রী সহাস্যে জানালেন অভিনন্দন। তিনি ককপিটে গিয়ে হাল ধরলেন নিখুঁতভাবে। পাশে বসা নেভিগেটর, তাঁর হাতে ম্যাপ।

ঢাকা শহরকে পিছে ফেলে শোঁ শোঁ আওয়াজ করে উড়ছে হেলিকপ্টার। বিলীয়মান মহানগরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। সিট বেল্ট বাঁধার ব্যবস্থাও রয়েছে বিমানবাহিনীর এ হেলিকপ্টারে। মাথার ওপর স্টীলের টানা দড়ির সঙ্গে অনেকগুলো রিং দেয়া রয়েছে বসার দু'সারি সিটের ওপর। এক সামরিক বিমানে করে দিন কয়েক আগে ঘুরে এলাম যশোর। উপলক্ষ্য, মার্কিন ফার্স্ট লেডী হিলারী ক্লিনটনের যশোরে গ্রামীণ ব্যাংক ও 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' প্রকল্প পরিদর্শনের অনুষ্ঠান দেখা। হঠাৎ একবার বিমান 'বাম্প' করার পর এক তরুণ ফরেন সার্ভিস অফিসার বিমানবাহিনীর এক কর্মীকে বললেন, তাকে রিং-এর একটা এনে ধরিয়ে দিতে। বিমানবাহিনীর কর্মীটি বললেন, এগুলো প্যারাট্রুপাররা 'জাম্প' করার সময় ব্যবহার করে। ফরেন অফিসের চটপটে অফিসারটি রিং ব্যবহার করার ইচ্ছে আর প্রকাশ করলেন না। তার অনতি দূরে বসা মধ্যম স্তরের ফরেন সার্ভিস-এর আর এক অফিসার অতি যত্নের সঙ্গে হাতে ধরে রেখেছেন তাঁর স্যুট ক্যারিয়ার। তিনি ছিলেন যশোরের গ্রামে হিলারী ক্লিনটনের ভিজিট-এর ব্যবস্থাদি দেখার জন্যে যাওয়া অগ্রগামী দলের প্রধান।

যা বলছিলাম। আমাদের বয়ে নিয়ে চলছে বিমান। ঢাকা শহর ছেড়ে চলেছি। ছোট ছোট লোকালয়। সবুজ ধানক্ষেত, শীর্ণকায় আঁকাবাঁকা নদী, কোথাও ইটের ভাটা। এক সঙ্গে কত দৃশ্য। আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি গন্তব্যস্থলের দিকে।

ডেইলী স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম হাতের ব্যাগ থেকে বার করলেন তাঁর ক্যামেরা। লেন্স ঠিক করলেন এবং একটার পর একটা ছবি তুললেন। তখন আমরা যমুনা সেতু প্রকল্পের ওপর এসে গেছি। দক্ষ হেলিকপ্টার চালক এখন ঘুরছেন প্রকল্প সাইটের ওপর দিয়ে। উদ্দেশ্য, আমরা যেন ওপর থেকে দেখতে পাই নিচের কর্মযজ্ঞ। টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ছবি নিচ্ছেন বিভিন্ন দিক থেকে। প্রায় দু'টার

সময় আমরা নামলাম যমুনা সেতু প্রকল্পের সাইটে। প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালকও ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। তিনি ম্যাপ দেখিয়ে বোঝালেন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক। বিশেষ করে জানালেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে সার্বক্ষণিকভাবে লক্ষ্য রাখার সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অর্থ সাহায্যকারী সংস্থাসমূহ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ ও ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত সংস্থার দ্বারা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে এ প্রকল্প।

কোরীয়, ডাচ ও ব্রিটিশ নাগরিকরা বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান ঠিকাদার শ্রমিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন দিনরাত। একটি মহৎ সৃষ্টির প্রেরণায় মানুষ ভুলে যায় ধর্ম জাতি ও ভাষার ব্যবধান। উদ্দেশ্য মহৎ হলে যে কোন বৃহৎ কাজ সমাধা করা অসম্ভব নয়। যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদ জানালেন, কত রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে— দাতা সংস্থাগুলোকে এ প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য করার যৌক্তিকতা বোঝাতে। যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে পচনশীল, খাদ্যবস্তু বাবদ কত কোটি টাকা বছরে নষ্ট হয় এই সত্যটি প্রমাণ করেছে আমাদের দেশের কৃতি অর্থনীতিবিদরা এবং আরো অনেক জটিল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন আমাদেরই দেশের ইঞ্জিনিয়ার ও বুরোক্রাটরা।

ইচ্ছা, মনোবল, অর্থ ও সদিচ্ছা থাকলে কোন কাজই অসম্ভব নয়, যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখে তাই মনে হলো। খর রৌদ্রের মধ্যে মানুষ কাজ করছে। কে শ্রমিক, কে ইঞ্জিনিয়ার দেখে বোঝার উপায় নেই। কোরীয় কোম্পানি হিউনডাই এ বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পেয়েছে। তাদের অধীনে কাজ করছে ডাচ কোম্পানি। তাদের কাজ হলো যমুনা নদীর গতিপথ যাতে ঠিক থাকে তার জরিপ করে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটির ওপর থাকবে চারটি লেন। ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ লাইনও থাকবে এ সেতুর সঙ্গে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা বিশাল বিশাল পাথরের টুকরো নামানো হচ্ছে ক্রেনের সাহায্যে। নদী ভাঙন রোধ করতে ব্যবহার করা হবে এসব বোল্ডার।

ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে এক কৃত্রিম নৌবন্দর। ভবিষ্যতে এটা হবে পর্যটকদের আকর্ষণ স্থল। যে সব ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে, আর যে সব হবে তা নিয়ে গড়ে উঠবে এখানে এক নতুন শহর, ভবিষ্যতের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। পাশে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার।

প্রজেক্ট ম্যানেজার ব্রিটিশ নাগরিক ক্লিন্সটন ধূলিধূসরিত সাইট-এর বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম আমাদের বুঝিয়ে বলেন। হিউনডাই-এর কোরীয় প্রধান প্রকৌশলী

জানান, অক্টোবরের (১৯৯৫) দিকে সিরাজগঞ্জ সাইটের কাজ পুরোদমে শুরু হবে।

নদী ভাঙন রোধ করার জন্যে বিটুমিন দিয়ে পাথর নদীর পাড়ে দেয়া হয়েছে। ঐ কাজ আমাদের দেখাচ্ছিলেন প্রজেক্ট ম্যানেজার। যোগাযোগমন্ত্রী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখুনতো একটা পাথর এখান থেকে তুলতে পারেন কিনা, পারলে পাবেন পাঁচশ' টাকা। আমি বললাম, অন্য কেউ পারলে আমি নিজে তাকে দেবো পাঁচশ' এক টাকা।

অল্প সময়ে যদ্দূর সম্ভব দেখা যায় তা দেখে আবার চড়লাম হেলিকপ্টারে। এবার এয়ার চীফ এসে বসলেন আমাদের সঙ্গে। আমার পাশে ছিলেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক রাহাত খান। আসার সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর দৃষ্টি ছিলো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। তিনি বললেন, নিচে কোন খড়ের ঘর দেখলাম না, গ্রামের সব ঘরই টিনের। মনে হয় মানুষের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

শুরুতে খুশবন্ত সিং-এর একটি চুটকি ছিলো। শেষে 'নিউ ইন্ডিয়া ডাইজেস্ট' থেকে শুনুন একটি। দিল্লির পার্লামেন্টের লবিতে শোনা কথোপকথন।

প্রশ্ন ঃ কোন মন্ত্রীদের কোন কাজ নেই?

উত্তর ঃ খুব সোজা উত্তর। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই। কারণ তারা কোন কাজই করেননি।

আফটার অল নিজের স্বামী

স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত মার্কিন সুন্দরী পামেলা'কে ক্রস-একজামিনেশনের সময় উকিল জিজ্ঞেস করলেন, স্বামীর কফিতে বিষ দিয়ে একই টেবিলে বসে থাকার সময় তার জন্যে সামান্যতম দয়া হয়নি আপনার?

হ্যাঁ, হয়েছিলো, পামেলার উত্তর।

কখন হয়েছিলো? উকিলের পুনরায় প্রশ্ন।

সে যখন আর এক পেয়ালা কফি চাইলো তখন, স্বাভাবিকভাবে পামেলা বললো।

তারপর কি করলেন? জানতে চাইলেন উদ্বিগ্ন উকিল।

আর একটু কড়া করে দিলাম আর এক পেয়ালা কফি, এবার বিষের পরিমাণ একটু বেশি দিয়ে, অবলীলায় বলে গেলো স্বামীহন্তা পামেলা। এহেন কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে জানাল, স্বামীর কষ্ট তার সহ্য হচ্ছিল না, তাই যাতে তার ভবলীলা তাড়াতাড়ি সাঙ্গ হয় সেই ব্যবস্থা সে করেছে। আফটার অল নিজের স্বামীতো! এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল পামেলা।

স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার রানী সাহেবাও একইভাবে স্বামীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। দৈবগুণে মেজ রাজকুমার বেঁচে যান। দেশ কাল পাত্র ভিন্ন হলেও মানব চরিত্র অভিন্ন। মার্কিন মুলুক ও বাংলাদেশের দুই রমণীর ধর্ম বর্ণ ভাষা আলাদা হলে তারা চিন্তা-চেতনায় এক। ভবিষ্যতে আরও সুখের আশায় বর্তমানের জীবন সঙ্গীর জীবননাশই ছিল তাদের লক্ষ্য।

এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই আমরা দেশে দেশে। ইতিহাসের পাতায়ও বিধৃত রয়েছে এ রকম কত ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ও কালো মানুষের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার 'প্রিয়তমা পত্নী' উইনি ম্যান্ডেলা আজ এক বিতর্কিত চরিত্র। ম্যান্ডেলার স্ত্রীর পদ তিনি আগেই হারিয়েছেন স্বামীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে। তবু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে করা হয়েছিল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু সে পদও তিনি শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলেন না। মার্চ মাসের ২৭ তারিখে '৯৫ প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা ছোট্ট এক চিঠির মারফত উইনিকে জানিয়ে দেন যে, সরকারি দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। 'ডিয়ার মিসেস ম্যান্ডলা', সম্বোধন করে দু'লাইনের চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা লেখেন, 'আমি শিল্প সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তোমার নিয়োগ বাতিল করলাম। এ পর্যন্ত সরকারে তোমার অবদানের জন্য ধন্যবাদ।'

এ রকম একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে ম্যান্ডেলাকে খুব চিন্তা করতে হয়েছে। ম্যান্ডেলার এক বছরের শাসনকালে এর চেয়ে কঠিন কোন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়নি। কিন্তু সময়োচিত সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছিল উইনির অল্পবয়স্ক সমর্থকদের কাছ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। নেলসন ম্যান্ডেলা আশা প্রকাশ করেন যে উইনি এখন তাঁর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করবেন। উইনির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। সরকারের স্বচ্ছতা ও নৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে উইনিকে সরকারের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে বলে ম্যান্ডেলা মন্তব্য করেন।

উইনি চাকরিচ্যুতির পর পরই কোনরূপ মন্তব্য করেননি। মনে হয় তিনি আগেই অবস্থা বুঝেছিলেন, তাই দু'দিন আগে এক ভাষণে তিনি বলেন, পদচ্যুত হলেও তিনি দল ত্যাগ করবেন না। উইনি ম্যান্ডেলার সেক্রেটারি এল্যান রোনাস বলেন, উইনিকে অসৌজন্যমূলকভাবে পদচ্যুত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা সিদ্ধান্তটি উইনিকে স্বয়ং মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিতে পারতেন। চিঠি পাঠাবার পরই নেলসন ম্যান্ডেলা ফোনে উইনিকে চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত করেন।

সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যে কোন রাষ্ট্রনায়ক বা সরকার প্রধানের প্রধান দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখালে সেই রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার-প্রধানকেই নিজের দায়িত্ব থেকে বিদায় নিতে হয়।

সাতাত্তর বছর বয়স্ক নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামী জীবনের ২৭টি বছরই কেটেছে কারান্তরালে। তিনি কখনও আপস করেননি শ্বেত প্রভুদের সাথে। তাই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে জয়মাল্য। অবশেষে সাদা-কালো উভয় সম্প্রদায়ের লোক মেনে নিয়েছে তাঁর নেতৃত্ব। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার শোষিত জনগণ চেয়ে

আছে এক অনাগত সুখী সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের দিকে, যার নেতৃত্বে রয়েছে এক লৌহমানব, যার নাম নেলসন ম্যান্ডেলা। রাজনৈতিক জীবনের মত তিনি ব্যক্তি জীবনেও আপস করেননি। উইনির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক অভিযোগ হলো, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ আত্মসাতের। সরকারি বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে তিনি বিরাট পরিমাণ অর্থ নিজের জন্যে নিয়েছেন বলে পুলিশী তদন্তে বলা হয়েছে।

১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারিতে নেলসন ম্যান্ডেলা শ্বেত-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই উইনি ম্যান্ডেলার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। সে বছরই উইনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন। কিন্তু পরের বছরই তিনি এএনসি'র মহিলা বিভাগের প্রেসিডেন্টের পদটি হারান। এরপর একই বছর চারটি কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে নির্যাতন ও একটি কিশোরের হত্যার অভিযোগে তাঁর ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়। পরে অবশ্যি তিনি সেই দণ্ড থেকে অব্যাহতি পান। এএনসি'র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের প্রধান থাকলে তাঁর এক সহকারীর যোগসাজসে ৮০ হাজার পাউন্ড আত্মসাতের অভিযোগে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে নেলসন ম্যান্ডেলা স্ত্রী উইনির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর প্রাক্তন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডেপুটি ডালি মপটু'র কাছে লেখা প্রেমপত্র সাধারণ্যে প্রকাশ পাওয়ার আগেই নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৯৪ সালের ২ মে দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিন নেলসন ম্যান্ডেলা নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাঁর পাশে যার সেদিন থাকার কথা, তিনি অনুপস্থিত। তাঁর স্থান দখল করেছে তাদের কন্যা জিনানী। উইনি ম্যান্ডেলার ভাগ্যে ফার্স্টলেডী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল শুধুমাত্র তাঁর অতি লোভ-লালসার জন্যে। ফার্স্টলেডীর সম্মান পেলে উইনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক আকাশে অশুভ প্রভাব ফেলতে পারেন ভেবেই নেলসন ম্যান্ডেলা প্রথমে নিজ জীবন থেকে ও পরে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে তাঁর ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রীকে বিদায় জানান। সম্মান শ্রদ্ধা পেতে হলে সে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই সেদিন বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশ সফর করে গেলেন মার্কিন ফার্স্টলেডী। হিলারী রডহাম ক্লিনটন তাঁর দশম শ্রেণীর ছাত্রী কন্যা চেলসী'কে নিয়ে এ দেশগুলোর সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করে যান। মা ও মেয়ে জয় করে যান অগণিত মানুষের মন। হিলারী ক্লিনটন প্রমাণ করেছেন, তিনি এক বিরাট দেশের রাষ্ট্রপতির যোগ্য সহধর্মিনী।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়

অংকের টিচার বারো বছর বয়সী টনিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আছে দু'ডলার, তোমার ড্যাডি দিলো তোমাকে চার ডলার, এখন বলতো কয় ডলার হলো তোমার? নির্লিপ্তভাবে টনির উত্তর, দু'ডলার। এ সোজা অংকটা তুমি বোঝ না। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে মাতৃহারা ছেলেটাকে বললেন টিচার মিস এলিনা। তুমিও আমার ড্যাডিকে চেনো না, করুণ মুখে বললো টনি। টনির মাম্মী তার বয়ফ্রেন্ড-এর সাথে নতুন ঘর বেঁধেছে তার বাবাকে ছেড়ে। টনির যত্নাত্তি কম হবেই স্বাভাবিক কারণে। ড্যাডিরও তো সঙ্গী চাই। তাই ছেলের দিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। টাকা-পয়সাও ছেলেকে প্রয়োজনমত দেয়া টনির ড্যাডির মত অনেক সিঙ্গেল প্যারেন্টদের হয়ে ওঠে না।

১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরের এক শুক্রবারে নির্মল আকাশ পথে চলেছি বোস্টন থেকে টেনেসি। সুপরিসর বিমানে যাত্রীরা একে একে নিজ নিজ আসনে বসছেন। সুবেশ পুরুষ যাত্রীদের এক হাতে স্যুট ক্যারিয়ার আর অন্য হাতে নাতিদীর্ঘ ব্রিফকেস। আর বিভিন্ন সাজে সজ্জিত আর প্রসাধনচর্চিত মেম সাহেবদের হাতে মধ্যম সাইজের স্যুটকেস। কারও বা দু'হাতই ভর্তি-এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে ফুটানি-কা-ডিব্বা। শর্ট জার্নিতে বেশি মালামাল বয়ে বেড়ানোর ঝক্কি অনেক। তাই উইকএন্ডে বেড়াতে বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় 'ট্রাবল লাইট' পলিসিই সবাই মেনে চলে। শুক্রবার বিকেলে গিয়ে যাত্রীরা ফিরে যায় নিজ কর্মস্থলে রোববার রাতে বা সোমবার সকালে। রাতের বেলায় প্লেনের ভাড়া অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ট্রেন ভাড়ার চেয়েও কম পড়ে বা একই সমান। ট্রেনে উইকএন্ডে ভাড়া উইক ডেইজ-এর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি।

হাতে সময় থাকলে গ্রে হাউন্ডে করে দূর-দূরান্তে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আরেক রকম আনন্দ। বাসে চড়ে বৈচিত্র্যে ভরা মার্কিন মুল্লুকের আনাচ-কানাচ দেখতে দেখতে ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। নিউ ইয়র্ক থেকে নায়াগ্রা গ্রে হাউন্ডে যাওয়ার সময় মধ্যপথে, প্লেনের দূর যাত্রার মত, ড্রাইভার বদল হলো। নতুন ড্রাইভার ক্লান্ত চালকের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন আর স্টিয়ারিং-এ হাত রাখলেন নব উদ্যমে। চালক আছে একজন। তার কোন হেলপার নেই। চালক আবার গাইডের দায়িত্বও পালন করছেন। চলার পথের প্রসিদ্ধ ও দর্শনীয় স্থানের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন। এটা ১৯৮০ সালের কথা। এ সময় আমার সফরসঙ্গী ছিলেন সাবেক পার্লামেন্ট সদস্যা সেলিমা রহমান ও বৃটেনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ড. ইউসুফ। আমরা জাতিসংঘের ৩৭তম অধিবেশনে গিয়েছিলাম বেসরকারি সদস্য হিসেবে। আমাদের সাথের অন্য সঙ্গীরা নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে অযথা দামী ডলার জলে ফেলতে চাননি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আস্তে আস্তে শূন্য সিটগুলো পূর্ণ হলো। আমার পাশের সিটটি খালি। যাত্রী নেই আর। বেশ ভালই হলো— একটু হাত পা ছড়িয়ে বসা যাবে। ভাবনা আমার শেষ হওয়ার আগে স্লিম এক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব হলো। তার হাতের দামী স্যুটকেসটি এক বিমানবালা দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে বাংকে রেখে তড়িঘড়ি করে গিয়ে বিমানবালাদের জন্যে উড্ডয়নকালে বসার জন্যে রক্ষিত সিটে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। বেশভূষায় মহিলাকে শৌখিনই বলতে হবে। তাছাড়া পারফিউমের গন্ধটাও বড় মিষ্টি। জানালার পাশের সিট দিয়ে বিলীয়মান বিমান বন্দর দেখছিলাম। আস্তে আস্তে দৃষ্টিপথে পড়ছে ছোট ছোট শহর লোকালয়। আলোকিত জনপদগুলোকে মনে হচ্ছে কোন শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা ছবি। তখন কেন যেন দেশের কথা মনে পড়লো। আলো, এখানে এত আলো! পৃথিবীর সবচে' বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ আমেরিকা। আর আমাদের তার উল্টো। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন, কবে দেখবো আমরা এতো আলো? তখন মাত্র দেশে 'রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড' গঠিত হয়েছে। মনে মনে আশা বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াবার সাথে তাল রেখে হয়তো অনাগত ভবিষ্যতে আমরাও শিল্পোন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবো। একাকিত্বের একটা সুবিধা চিন্তার পরিধি যেমন ইচ্ছে বিস্তৃত করা যায়। কেউ তখন বাধ সাধতে আসে না। পাশের যাত্রী এখানে আপনাকে প্রশ্ন করবে না, বেতন কত পান? বিলেত হলে তো কথাই নেই। যে পর্যন্ত কেউ আপনাকে পাশের যাত্রীর সাথে ইনট্রোডিউস না করিয়ে দেবে ততোক্ষণ ইংরেজ সাহেব মুখই খুলবেন না।

এ ব্যাপারে নাকি জাপানীরা আরো এক কাঠি সরেস। এই সেদিন বুড়িগঙ্গায়

চীনের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতি কর্তৃক আয়োজিত নৌ-বিহারের সময় এক মহিলা ডাক্তার এক গল্প বললেন। সার্জনদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছিল কোন অপারেশনটা বেশি কঠিন। ব্রিটিশ ডাক্তারের মতে, হার্ট অপারেশনই হলো সবচে' বেশি কঠিন অপারেশন। আমেরিকান ডাক্তারের মন্তব্য, হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের মত জটিল ও কঠিন অপারেশন আর কিছু হতে পারে না। রাশান সার্জন ব্রেন অপারেশনকেই সবচে' মারাত্মক শল্য চিকিৎসা বলে তার সিদ্ধান্ত জানান। নাক চ্যাপ্টা জাপানী ডাঃ সুয়োমুটো একমাত্র ব্যক্তি যিনি এত আলোচনার মধ্যে চুপ মেরে বসেছিলেন এতক্ষণ। সকল সার্জনের দৃষ্টি গেলো প্রখ্যাত জাপানী শল্য চিকিৎসকের দিকে। সবচে' কঠিন অপারেশন ডাঃ সুয়োমুটো কোনটাকে মনে করেন, জানতে চাইলেন অন্যান্য সার্জন। 'টনসিল ইজ দি মোস্ট ডিফিকাল্‌ত অপারেশন', দৃঢ়তার সাথে জানালেন ডাঃ সুয়োমুটো। সকলের চক্ষুস্থির। কয় কি এ ব্যাটা! মনে মনে সকলের একই প্রশ্ন। হাউ ক্যান ইউ সে টনসিল ইজ দি মোস্ট ডিফিকালত অপারেশন? মার্কিন সার্জনের জিজ্ঞাসা। অন্যেরাও কোরাসে সমর্থন জানাল শ্যাম চাচার দেশের সার্জনকে। ডাঃ সুয়োমুটো বললেন, দেখো তোমরা তো টনসিল অপারেশন করো মুখ হা করে। কিন্তু জাপানীরা তো মুখ খোলে না, ওদেরটা করতে হয় নিচের দিক থেকে।

মার্কিনীরা তেমন ফর্মালিটি মানে না। তাদের সব খোলামেলা। আকাশে আলো আঁধারী খেলা দেখছিলাম জানালা দিয়ে। সিটবেল্ট বেঁধে রাখার আলোকিত সংকেত কখন নিভে গেছে লক্ষ্য করিনি। ড্রিংকস-এর ট্রলি নিয়ে বিমানবালার আগমনে নড়ে চড়ে বসলাম। কি নেবো জানতে চাইলো আকাশসুন্দরী। বললাম, সেভেন আপ। ট্রে-তে সেভেন আপের সাথে ছোট এক প্যাকেট বাদাম চলে এলো আমার হাতে। সামনে প্রসারিত টেবিলের ওপর ট্রেটি রেখে আস্তে আস্তে বাদামের সাথে সেভেন-আপ সিপ করছিলাম। পাশের সহযাত্রিনীর হাতে হুইস্কির গ্লাস। গ্লাস হাতে উদাস দৃষ্টিতে বসে আছেন মহিলা। হঠাৎ বিমান বাম্প করলো, অন্যমনস্ক মহিলার গ্লাস থেকে কিছু পানীয় ছিটকে পড়লো আমার কোটের বাঁ হাতে। অপ্রস্তুত মহিলা বার বার মাফ চাইছেন তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে। ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য বললাম, নো ম্যাটার, ইট কুড বি আদারওয়াইজ। মহিলা বললেন, আমার মনটা ভাল নেই, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই তোমার জ্যাকেটে ড্রিংকস্ পড়ে গেছে। আই এম এক্সট্রিমলি সরি, পুনরায় বললেন মহিলা।

আমি একমাস পর ছেলেকে দেখতে যাচ্ছি, গায়ে পড়ে জানালেন সহযাত্রিনী মহিলা। আর বললেন স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ির পর টেনেসিতে কর্মরত তার প্রাক্তন

স্বামী ছেলের কাস্টডি পেয়েছেন। মাসে একবার ছেলেকে দেখবার রায় পেয়েছে মা। মহিলা স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বাড়ি-গাড়ি কিন্তু হারিয়েছে একমাত্র সন্তানকে। এটা মার্কিন মুল্লুক বা উন্নত দেশগুলোর এক অতি স্বাভাবিক চিত্র। ভদ্রমহিলার ওপর রাগ না হয়ে করুণা হলো।

আমরাও এসব ক্ষেত্রে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সেদিন শুনলাম আর্কিটেক্ট বন্ধু সুজনের দ্বিতীয় স্ত্রী তাকে ফতুর করে দিয়ে অন্য একজনের সাথে ঘর বেঁধেছে। প্রথম স্ত্রী দু'মেয়ে ও এক ছেলে রেখে অকালে মারা যাওয়ার পর সুজন দু'বছর ছিল মনমরা হয়ে। পরে নিকটজনদের অনুরোধে মামার সংসারে অযত্নে বড় হওয়া এক অল্প বয়স্ক মেয়েকে সংসারে নিয়ে এলো বৌ করে। ভালই চলছিল নতুন সংসার। সুজনের মেয়ে দু'টির বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যে। ছেলেটিও সাইপ্রাসে গেছে কম্পিউটার সাইন্স পড়তে। আর এদিকে জন্ম নিয়েছে দু'সন্তান। একটি মেয়ে অন্যটি ছেলে।

প্রাইভেট এক ফার্মের চাকরি ছেড়ে সুজন নিজে ফার্ম দিল। সেই সুবাদে পরিচয় হলো উঠতি ধনী রিয়াল এস্টেট এজেন্ট ও প্রীতম কন্সট্রাকশন কোম্পানির মালিক আজিজ আহমেদ-এর সাথে। আজিজ সাহেব বাড়ি বানিয়ে বিক্রি করে বিত্তবানদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। সুজনের গুলশানের একটি প্লট অনেকদিন থেকে পড়ে আছে। নতুন বৌ এসে দু'মাস না যেতেই আবদার ধরলো, প্লটটি যেন সুজন তার নামে লিখে দেয়। দিন নেই রাত নেই গিন্নির একই আবদার। শেষ পর্যন্ত দশ কাঠার প্লটটির মালিক হলেন গিন্নি। প্লটটির ওপর ছ'তলা ইমারত উঠেছে। প্রত্যেক তলায় একটি ফ্ল্যাট। এর একটির মালিক মিসেস সুজন। বিনা খরচে রাতারাতি মালিক বনে গেলেন তিনি একটি ফ্ল্যাটের। পাঁচটির মধ্যে আজিজ রেখেছেন একটি। বাকি চারটি পঁয়ত্রিশ লাখ করে বিক্রি করেছেন। শান্তিনগর ভাড়া বাড়িতে ফিরে একদিন সুজন পেল এক ডিভোর্স লেটার। বারো বছরের মেয়ে ও দশ বছর বয়স্ক ছেলেকে রেখে মিসেস সুজন গিয়ে উঠেছেন নিজের নতুন ফ্ল্যাটে। ছোট এক চিরকুটে মহিলা লিখে রেখে গেছেন, তোমার বাচ্চাদের দায়িত্ব নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সুখী হও, এই কামনা করি; তোমার দান চিরদিন কৃতজ্ঞভরে স্মরণ রাখবো।

নিকষিত হেম

আটষট্টি বৎসর বয়স্কা মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর ৯০ বৎসর বয়স্ক স্বামী পিটারকে ২০ তলার ফ্ল্যাট থেকে ফেলে দিয়ে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। প্রসিকিউশন ল'ইয়ার ক্রশ একজামিনেশনের সময় মহিলার কাছ থেকে তাঁর এহেন সাংঘাতিক কর্মের কারণ জানতে চাইলেন। অভিজাত বৃদ্ধা দামী চশমা জোড়া চোখ থেকে নামালেন, স্কার্টের একপ্রান্ত দিয়ে মুছে আবার চোখে লাগিয়ে নির্লিপ্তভাবে প্রশ্নের উত্তরে বললেন, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম অন্য শহরে, ফিরে এসে দেখি নব্বই বছরের বুড়ো এক কিশোরীকে নিয়ে আমার বিছানায় মজা করছে। উকিল প্রশ্ন করলো, তার জন্যে কি তুমি এমন কাণ্ড করতে পার যার ফলে তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়। মহিলার উত্তর, আমি মনে করেছিলাম এ বয়সে সে যদি এ রকম সমর্থ হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই উড়তেও পারবে।

আর একটি ঘটনা। কোর্ট ভর্তি লোকের সামনে উকিল স্বামী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুম থেকে জেগে ভোরে প্রথমে তোমার স্বামী তোমাকে কি প্রশ্ন করেছিলো? উত্তরে মহিলা বললেন, চোখ মিটমিট করে ও জানতে চাইলো, আমি কোথায়, ক্যাথি? তাতে কি হলো? উকিলের পুনরায় জিজ্ঞাসা। সিলিং-এর দিকে চেয়ে মহিলা বললেন, আমার নাম সুশান।

প্রাক্তন এক ডিপ্লোম্যাটের অতি স্মার্ট স্ত্রী দিন কয়েক আগে নেদারল্যান্ডের জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক রিসেপশনে বিদায়ী এক রাষ্ট্রদূতের কথা বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে যান। সুদর্শন সে রাষ্ট্রদূতের ঢাকায় বহু বন্ধু-বান্ধবী জুটলেও বেচারা ছিলেন একা, এক্স-ডিপ্লোম্যাট ভার্যা করুণ স্বরে বললেন। রাষ্ট্রদূতের সময় কিছুটা ভালো যেতো যখন তার গার্লফ্রেন্ড দেশ থেকে

এসে কিছুদিন থেকে যেতেন। গার্লফ্রেন্ডের ঢাকায় থাকা সম্ভব নয়, কারণ তার নবজাত শিশুটি এ দেশের জলবায়ু সহ্য করতে পারবে না। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীও থাকেন স্বদেশে একই শহরে তার এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদ ও দু'বিয়ে একসাথে করার ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিকদের কড়া বিধি নিষেধ রয়েছে।

১৯৭৮ সালে একবার রোম হয়ে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলী যাচ্ছিলাম এক সম্মেলনে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একদিন রোমের হোটেল থেকে ত্রিপলী যাওয়ার টিকিট যোগাড় করেছিলাম। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রদূত শামশের মুবিন চৌধুরীর ঐকান্তিক সাহায্য সহযোগিতা না পেলে রোম থেকে দেশে ফিরে আসতে হত।

খৃস্টান ধর্মের পীঠস্থান ভেটিকান সিটি রোমের কাছেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম 'রাষ্ট্র'। ভেটিকান সিটিতে যে সব রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন তাদের বৈবাহিক জীবনে কোন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার থাকলে ওসব ডিপ্লোমেটের 'এগ্রিমো' গ্রহণ করা হয় না। অথচ রোম এ সব ব্যাপারে বেশ খোলামেলা। যা বলছিলাম আল-ইটালিয়া'র সুপরিসর ৭০৭ বিমান আটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ছিলো আর আমি আল্লাহর কাছে শোকর গুজরান করছিলাম যে, কনফারেন্সের প্রথম দিন অন্তত উপস্থিত হতে পারবো। নিচে দ্বীপ একটার পর একটা। পাশের সিটের ইটালীয় যাত্রী নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, তিনি ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক একই কনফারেন্সে যাচ্ছেন। নৈকট্য বাড়লো। নিচে বিরাট এক দ্বীপ দেখিয়ে উনি বললেন, ওটা সিসিলি। এদের চরিত্র আবার ব্রিটিশদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তা না হলে সেপারেটেড এক বিবাহিতা মহিলার সাথে লিভ টুগেদার যে এক ভদ্রলোক করেন, তা আমার জানার কথা নয়। রোমে সে থাকে বান্ধবীকে নিয়ে এক স্টুডিও ফ্ল্যাটে, মানে এক রুমের বাসায়। তাকে বিয়ে করে ফেললেই তো পারো, বললাম। না, এখন ধর্মের দিক দিয়ে কিছু অসুবিধা আছে, বললো ইটালীয় সাংবাদিক।

ইউরোপের কালচার-এ এসব ব্যাপার গ্রহণযোগ্য। জীবনে ডবল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তরা। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা তো দূরে থাক বরং এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে এক ব্যক্তির থাকবে একটি ধর্মীয়ভাবে বিবাহিত স্ত্রী ও একজন গার্লফ্রেন্ড। ইটালীতে দুপুরের দু'ঘন্টা সিয়েস্তা'র সময়টুকু অনেকেরই বাধা থাকে গার্লফ্রেন্ডের জন্য। জাপানে যেমন 'ভদ্রলোক'দের জন্য রয়েছে গেইসা গার্ল। এগুলো তুলনীয় আমাদের দেশের অতীত দিনের জমিদারদের জীবনযাত্রার সঙ্গে। বাগান-বাড়ি নিয়ে জমিদার গিন্নি জমিদারের সাথে খবরদারি করতে যেতেন না। রাতের জলসাঘরের জমিদার আর দিনের ভূস্বামী দুই আলাদা সত্তা। এত গৌরচন্দ্রিকা করলাম, আমাদের এক সময় স্বপ্নের দেশ বিলেতের রাজনীতিবিদের

সাম্প্রতিক কিছু ক্রিয়াকর্ম দেখে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের শ্লোগান 'ফিরে চলো মূলে'- গো ব্যাক টু বেসিকস্। তিনি সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আর তার দলের চুনোপুঁটি থেকে মহারথীরা ফলো করছেন অন্য জীবন যাপন পদ্ধতি।

গত নয়ই এপ্রিল (১৯৯৫) এমপি রিচার্ড শ্রীং নামীয় এক পার্লামেন্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারি (পিপিএস) যৌন কেলেংকারীর ফলে পদত্যাগ করেছেন। এর আগে তারই পদমর্যাদার আরও চারজন একই ধরনের কর্মের জন্য পদত্যাগ করেন।

ইতোপূর্বে মেজরের মন্ত্রিসভার বড় ছোট মিলিয়ে আরও আটজন মন্ত্রী কলংকের কালিমা মুখে নিয়ে বিদায় নেন। জন মেজরের এমনিতেই বড় দুর্দিন যাচ্ছে। পিপিএস রিচার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে স্বয়ং তার গার্লফ্রেন্ড-স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন দু'সন্তানের জননী মিজ্ (মিস নয়) নাইটেংগল। রিচার্ড তার এক বন্ধুকে নিয়ে একই সাথে বান্ধবীকে ভোগ করেছেন একই বিছানায় যাকে পত্রিকার ভাষায় বলা হয়েছে থ্রি-ইন-এ বেড সেক্স বলে। মিজ্ নাইটেংগল এ তথ্য ফাঁস করে দেন মুখরোচক সংবাদ পরিবেশনের জন্যে প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড'-এ।

তাঁর অভিযোগে মিজ্ নাইটেংগল বলেন, রিচার্ড রাজকুমারী এ্যানি ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বলতার কথাও বিশেষ অবস্থায় কথোপকথনের সময় প্রকাশ করেন। রিচার্ডের লন্ডনস্থ বাসভবনে ডিনারোত্তর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দানকারিণী নাইটেংগল রবিবাসরীয় এক স্কুল শিক্ষিকা। বিশ্বনন্দিত সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেংগল আহত মানুষের সেবা শুশ্রুষা করে তাবৎ পৃথিবীর লোকের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আর লন্ডনের নাইটেংগল দু'সন্তানের জননী সেপারেটেড এক মানুষের একান্ত সেবা করতে গিয়ে দেশবাসীর কাছে হলেন নিন্দিত। তাঁর এ রোমাঞ্চকর খবর 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড'কে সরবরাহ করার জন্য নাইটেংগল-এর কিছু অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে কিনা এখন পর্যন্ত এ রকম তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে রিচার্ডের জন্যে সুখের খবর, যে এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার রক্ষণশীল দলীয় চেয়ারম্যান রিচার্ড সাহেবকে একজন এক্সিলেন্ট ও ওয়াভারফুল এমপি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু গত বছর একই রকম কেলেঙ্কারীর জন্য পদত্যাগী জুনিয়র মিনিস্টার টিম ইয়ো পেয়েছে স্থানীয় দলীয় নেতাদের কাছ থেকে তিরস্কার।

পরকীয়া সম্পর্কে প্রয়াত ফরাসী রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। পরকীয়ায় আসক্ত ব্যক্তিরা যদি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত না থাকতে পারে, তা হলে ফ্রান্সে কোন সরকারই থাকবে না। দেখুন, কি ভয়াবহ ব্যাপার। নিষিদ্ধ ফলের প্রতি

মানুষের আগ্রহ বেশি— এটাই বোধ হয় মিতেরাঁর মত বিদগ্ধজন বোঝাতে চেয়েছেন।

ধনী দেশগুলোতে প্রচলিত অপকর্ম অনুকরণের প্রবণতা উন্নয়নশীল দেশসমূহের উচ্চবিত্তদের মধ্যে যতটা প্রকট, কিন্তু ধনী দেশের লোকদের কাজের প্রতি একাগ্রতা সময়ানুবর্তিতা ও দেশপ্রেম তাদের কাছে ততখানি উপেক্ষিত। পশ্চিমের হাওয়া সমাজে এখন বইছে খুব জোরে সোরে। প্রয়াত ইত্তেফাক সম্পাদক একবার তাঁর বিখ্যাত কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চে' লিখেছিলেন, এক কানকাটা হাটে রাস্তার একপাশ দিয়ে, আর দু'কানকাটা হাটে রাস্তার মধ্য দিয়ে।

বে-আক্কেল গরু

লম্বা জোব্বা পরিহিত পাদ্রী ধীর পদবিক্ষেপে চার্চে এসে দেখেন এক তাগড়া গরু চার্চের ভেতরে ঢুকে কিছু জিনিসপত্র ভেঙে ফেলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ধর্মযাজক চতুষ্পদ জন্তুটির দিকে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ওর কাছে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। এমন সময় তিনি বাইরে দেখতে পান উদ্বিগ্ন এক চাষীকে, যে তার হারানো গরুর খোঁজ করছিল। এবার পাদ্রী তার সমস্ত রাগ ঝাড়লেন ক্ষীণকায় চাষীর ওপর। বেয়াদব, বেতমিজ, বে-আক্কেল ও আরো কিছু বিশেষণে চাষীটিকে সম্বোধন করে পাদ্রী জানতে চাইলেন, কেন কি করে তোর গরু ঢুকলো চার্চে?

হাত কচলিয়ে মাথা নত করে হাতেনাতে ধরাপড়া অপরাধীর মত চাষীটি তার দোষ স্বীকার করে বললো, দেখুন ফাদার, গরু এক অবুঝ প্রাণী, ঢুকেছে চার্চে। আরও বিনয়ের সাথে বললো, ফাদার আমাকে কি দেখেছেন কখনো আপনার এ জায়গায়?

ধর্মস্থানে সকলে যায় না সত্যি। কিন্তু না যাওয়া নিয়ে কেউ বড়াই করে না। আমাদের চাষী ভাইটি নিরীহ গোবেচারা, তার নিজের গরুর আচরণে সে লজ্জিত। কিন্তু চার্চে যে সে যায় না তার জন্যে তার মনে অপরাধবোধ নেই। তবে পবিত্র স্থান অপবিত্র করা যে অন্যায় তা গরিব চাষীটি জানে।

নেশাগ্রস্ত এক সাহেব বাড়ি ফিরছিল ভোরের দিকে। মাথায় ঠাণ্ডা লাগছে। হাত চলে গেলো শিরদেশে। হায় এ একি ব্যাপার! টুপি নেই। যেতে হবে অনেক দূর। পকেট শূন্য, মাথা পরিষ্কার। কি করা যায়, সাহেবের ভাবনা। পাশেই এক চার্চ দেখা যাচ্ছে। চার্চের দরজায় রাখা হ্যাট র‍্যাক থেকে টুপি একটি তুলে নিয়ে

যাওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহেব গেলেন চার্চে। এরমধ্যে ধর্মযাজক উপস্থিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে 'টেন কমান্ডমেন্টস্'-এর ব্যাখ্যা করছিলেন। 'সারমন' শেষ করে বেরুবার পথে অসৎ উদ্দেশ্যে চার্চে আগত সাহেবটি ধর্মযাজককে বললো, একটি হ্যাট হাতিয়ে নেয়ার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আপনার 'সারমন' শোনার পর আমার সে ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। কি এমন কথা আমার মুখ থেকে শুনেছো বাছা যে তোমার চুরি করার ইচ্ছাটা দূর হয়ে গেল? জিজ্ঞেস করলেন ধর্মযাজক। নির্বিকারভাবে সাহেবটি বললো, হে মহাত্মন, আপনি যখন বললেন, পরকীয়া একটা অত্যন্ত খারাপ কাজ, অমার্জনীয় অপরাধ, তখনই মনে পড়েছে আমার হ্যাটটি কোথায় রেখে এসেছি।

পরকীয়ার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে সম্প্রতি বিপাকে পড়েছেন ব্রিটেনের এডিনবরায় এক বিশপ। বিশপ রিচার্ড হলওয়ে বিশ্বাস করেন, মানুষের 'জিনস'-এ পরকীয়ার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। টেবলয়েড পত্রিকাগুলো এ নিয়ে খুব হৈচৈ করে বেচারা বিশপের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। একত্রিশ বছর ধরে স্ত্রী নিয়ে সুখী সংসার জীবনযাপন করে এই প্রৌঢ় বয়সে বিশপ হলওয়ে পড়েছেন গ্যাড়াকলে। তিনি আজ এক বিতর্কিত ধর্মযাজক। তাঁর মতে, তিনি সংবাদপত্রের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার শিকার। এডিনবরায় অবস্থিত স্কটিশ এপিসকোপাল চার্চে বিশপ হলওয়ের (যিনি এ চার্চের সর্বপ্রধান যাজক) বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেনের ঝড় উঠেছে। বিশপ হলওয়ে কিন্তু এ ব্যাপারে নির্বিকার। বিশপ হলওয়ের মন্তব্য সম্পর্কে এক টেবলয়েড পত্রিকার শিরোনাম-উই আর বর্ন টু বি ওয়াইল্ড। অর্থাৎ বন্য হয়েই আমাদের জন্ম। তার মতামত সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি পরকীয়া বা বহুবিবাহের পক্ষে নন। স্বামীর অবস্থা দেখে মিসেস হলওয়ে বিচলিত। তিনি মনে করেন তাঁর স্বামীকে ভুল বুঝেছে অনেকে।

বিবাহ বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কে কোন এক চার্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছেন বিশপ হলওয়ে। পরকীয়াকে তিনি উদার দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে বলেছেন, পরকীয়কে আমি নিন্দা করতে পারি, কিন্তু যারা ইতোমধ্যে এ রোগে আক্রান্ত তাদের কি এতে কোন লাভ হবে? বিশপ হলওয়ে 'যৌন বিপ্লব' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইউরোপ ও উন্নত বিশ্ব আজ পারিবারিক জীবনে এক চরম সংকটের সম্মুখীন। তিনি বলেন, ধনী দেশগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে আতংকজনকভাবে। তাছাড়া অনেকে বিয়ে না করার পক্ষপাতী।। তার ওপর এক মা বা এক বাবা দ্বারা লালিত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া তো রয়েছে মানব-মানবীর সম্পর্কের চির দ্বন্দ্ব।

অস্থির পশ্চিমা সমাজে যে ঘুণ ধরেছে বহুদিন আগে উন্নয়নশীল জাতিগুলোকে

তা দ্বিগুণ গতিতে হ্রাস করছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে ক্রিস্টিন কিলার নাম্নী এক মহিলার জন্য। পুরাতন ইতিহাসে আমরা পাই এ রকম ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত। ট্রয় নগরী ধ্বংসে হয়েছিল সুন্দরী হেলেনের জন্য। নিহত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর নারীপ্রীতি নিয়ে লেখা হয়েছে ঢাউস ঢাউস কিতাব। বর্তমান বৃটেনে জন মেজর সাহেব যতই পরিবারের শুচিতা সম্পর্কে বলুন না কেন, তাঁর বহু সহকর্মী বিবাহবহির্ভূত ক্রিয়াকার্য সবিশেষ অবদান রেখে বেচারা মেজরকে একেবারে মাইনর বানিয়ে দিয়েছে। এর ওপর মেজর সাহেবের অভিভাবক বলে পরিচিতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার তাঁর লেখা এক নতুন বইতে তাঁরই এক সময়ের স্নেহধন্য মেজরকে কটাক্ষ করে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। যাক এ হলো গিয়ে, কোন কোন ইংরেজ রাজনীতিবিদের ভাষায়, পরশ্রীকাতরতা।

পশ্চিমী হাওয়ার কথা বলছিলাম। পশ্চিমী লু হাওয়া এখন প্রাচ্যের দেশগুলোতে মনে হয় চিরস্থায়ী আসন পেড়ে বসেছে। ইজি মানি যেখানে সেখানে দেখা যায় ইজি ভাইস। অর্থের সাথে রয়েছে চিত্তের এক গূঢ় সম্পর্ক। শুধু কাম রিপু চরিতার্থ করার জন্যই ইজি মানি অনেকেই ব্যয় করেন। ব্যবসার উন্নতির ক্ষেত্রেও অনেকেই এর ব্যবহার করেন। আবার ব্যবসার তরক্কির জন্য অনেকে ব্যবহার করেন নারীকে। যার ফলে ঘটে কনকর্ড টাওয়ারের মত ঘটনা।

ভারতে একবার এক আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করা হয়েছিল, যা দ্বারা বিদেশী ব্যবসায়ীদের বলা হবে তারা যেন ভারত ভ্রমণকালিন তাদের বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে আসে। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসা মহিলা যে বিদেশী মেহমানের ধর্মপত্নী তার নিশ্চয়তা দেবে কে? এ নিয়ে কথাই হয়েছে, আইন হয়নি। শুধু আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা কি সম্ভব?

অর্থবিত্তের সন্ধানে বিভোর বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি জীবনে না পেয়েছে সুখ না পেয়েছে শান্তি। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে প্রশান্ত হওয়ার চেয়ে তারা হয়েছে অস্থির, অশান্ত। মাত্রারিক্ত বিত্ত ছিনিয়ে নেয় এ ধরনের লোকের চিত্তের সুখ, মনের শান্তি।

ইটালী ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক সরকারপ্রধান নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি আর প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য দ্বারস্থ হয়েছে মাফিয়া চক্রের কাছে। এদের কেউ কেউ শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ইটালীর প্রাক্তন এক সরকার- প্রধানের মাফিয়া চক্রের সাথে যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগের তদন্ত চলছে। মাফিয়া চক্রগুলোর আঁতুড় ঘর সিসিলি দ্বীপ ইটালীতেই অবস্থিত। আর রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পীঠস্থান ভ্যাটিকান সিটি ইটালীর গায়ে লাগানো স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মরাষ্ট্র।

এক পাদ্রীর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষ করছি তিন পাদ্রীর গল্প দিয়ে।

একজন বলছে, তার চার্চে বাদুরের উপদ্রব সইতে না পেরে তিনি গুলি ছুঁড়ে বাদুর মারার চেষ্টা করেন। শয়তান বাদুরগুলোর কিছুই হল না, লাভের মধ্যে চার্চের দামী শেন্ডেলিয়ারটি ভেঙে চুরমার। দ্বিতীয় জন বললেন, আমি ফাঁদ পেতে বাদুরগুলো ধরে দশ মাইল দূরে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু চার্চে আমি এসে পৌছার আগেই বাদুরগুলো এসে স্বস্থানে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। তৃতীয় ধর্মযাজক সব শুনে বললেন, আমি অত ঝামেলায় যাইনি, আমি বাদুরগুলোকে ধর্মে দিক্ষিত করে ছেড়ে দিয়েছি। এরপর কি হলো? অপর দু'জন পাদ্রী প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন- তৃতীয় জনকে, আর উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছেন উত্তরের। ধীর স্থির প্রবীণ পাদ্রী জানালেন, ধর্মে দীক্ষিত করে দেয়ার পর বাদুরগুলোকে আর কখনো চার্চের আশেপাশে দেখা যায়নি।

ম্যান্ডেলার জীবনে নারী

স্ত্রী চরিত্র দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্য! মেয়েদের চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, পুরুষ মানুষতো কোন ছার! পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট এ প্রবাদের মধ্যে রয়েছে মেয়ে জাতের প্রতি সূক্ষ্ম এক বিদ্রুপাত্মক ইঙ্গিত। মেয়েরাও যথার্থভাবে উল্টো করে বলতে পারে প্রতিপক্ষ পুরুষদের সম্পর্কে-সব পুরুষ মানুষের চরিত্রও কি দেবতারা বুঝতে পারে? দাম্পত্য জীবনে ঘর ভাঙার জন্য বেশি দায়ী পুরুষ না মেয়ে, সে ব্যাপারে সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা চালিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তবে পুরুষদের লেখনীতে বিনা দ্বিধায় এর জন্যে অবলা নারীদেরই দায়ী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে যুগে যুগে। যাযাবর বাবুও এ অপবাদ থেকে মেয়েদের রেহাই দেননি। তাঁর মতে মেয়েরা প্রেম করে ঘর বাঁধে আর পুরুষ প্রেমে পড়ে রাজ্য ছাড়ে।

আমাদের আশপাশে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই আর এক সমাজ চিত্র। কত সালেহা, জোলেখা স্বামী দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেও তাদের সাধের সংসার টিকাতে পারেনি। কোথাও ঘর ভেঙেছে যৌতুকের জন্য, কোথাও বা অন্য মায়াবিনী-হরিণীর আকর্ষণে।

এই ধরুন না, দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত গণমানুষের নেতা বর্তমানে সে সমৃদ্ধশালী দেশের প্রেসিডেন্ট নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলারই কথা। সাতাশ বছর বন্দী জীবন যাপনকালে ম্যান্ডেলার পত্নী উইনি ম্যান্ডেলা স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাধার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তির দিন তাঁর পাশে ছিলেন গর্বিত উইনি। উইনি এখন চলে গেছেন পর্দার অন্তরালে। উইনি'র ব্যক্তি জীবন নিয়ে কানাঘুষার পর তাদের জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ। কিন্তু

দু'জনই একই রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও দু'জন দু'জনের কাছে থাকতে পারলেন না। ম্যান্ডেলার ব্যক্তি জীবন থেকে দূরে সরে গেলেও উইনি তাঁর কাজের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলার অধিনে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। সে পদ থেকেও তাঁকে অচিরে সরে দাঁড়াতে হল।

সাতাত্তর বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনে প্রেমের নতুন ছোঁয়া লেগেছে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা এক বিশেষ নিবন্ধে ২৪ বছর বয়স্কা এক নারীর সাথে ম্যান্ডেলার রোমান্টিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। গত মার্চ (১৯৯৫) মাসে বৃটেনের রাণী এলিজাবেথের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় রোচিলি এমটিয়ারারাকে ম্যান্ডেলা তাঁর নাতনী হিসেবে রাণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। চমৎকার শরীরের অধিকারিণী রোচিলার পরনে ছিল ঝলমলে কাপড়চোপড়।

উইনির সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আরও কয়েকজন মহিলা ম্যান্ডেলার জীবনে এসেছে এ গুজব শোনা যায় বলে গার্ডিয়ান উল্লেখ করেছে। প্রাক্তন কোন এক রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী, একজন মহিলা কূটনীতিক ও একজন পপ সিঙ্গার এদের মধ্যে রয়েছে।

ম্যান্ডেলার নাতনী বলে পরিচয় দানকারী রোচিলা বহুদূরের আত্মীয় বলে জানাজানি হওয়ার পর মানুষের মধ্যে এ নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলছে।

এখনও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কেন ম্যান্ডেলা রোচিলাকে লোক সমক্ষে নিজের সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত করেছেন। উইনির ঘরে ম্যান্ডেলার রয়েছে দুই কন্যা। প্রথম কন্যা প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষেকের সময় ছিল ম্যান্ডেলার পাশে। দ্বিতীয় কন্যা জিন্‌জী মায়ের মন্ত্রীকালীন সরকারি সম্পত্তি নিয়ে কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত। উইনির সাথে তো সম্পর্ক আগেই ছেদ হয়ে গেছে। ম্যান্ডেলার পরিবারের লোকজন তাঁকে একজন লোনলি ওল্ডম্যান হিসেবে দেখাতো।

ম্যান্ডেলার এই একাকিত্বের জন্য কে দায়ী? তিনি নিজে, না উইনি। উচ্চাভিলাষী উইনির জীবন যাপন প্রণালীই কি একজন ত্যাগী বীর পুরুষকে বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে?

ঘর ভাঙার ইতিহাস পশ্চিম মুল্লুকে ভুরি ভুরি। আমাদের দেশী ভাইরা, যারা পশ্চিম দেশগুলোতে গিয়ে আসন গেড়ে বসেছেন, তারা অন্য কিছু না হোক, পশ্চিমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ কালচারটি রপ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিশ বছর ধরে কার্ডিফে বসবাসরত বাসার সাহেবের বাড়িতে যেয়ে আমার বন্ধু রসুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বাসার চিঠিতে লিখেছিল রসুল ট্রেনিং পিরিয়ডে যেন তার বাসায়ই থাকে। বাসার একটি ল' ফার্মে কাজ করে আর ওখানকার স্থানীয়

রেডিও ও একটি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজের সাথে জড়িত। সারা দিন ব্যস্ততায় তার সময় কাটে। বাড়ি কিনেছে বছর চারেক হয়। মোটামুটি ভাল বাড়ি। ওখানে কিস্তিতে বাড়ি কেনা সহজ। সাংবাদিকতায় ট্রেনিং নিতে এসে বাসার আর ফিরে যায়নি দেশে। বৌ আর এক বাচ্চাকে শুধু একবার দেশে গিয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলে এখন 'এ' লেভেলে পড়ে। বাসারের সময় হয় না ছেলের লেখাপড়ার তদারক করার। মায়ের তত্ত্বাবধানে ছেলে বেড়ে উঠেছে। 'ও' লেভেল পর্যন্ত ছেলের দেখা শোনায় সময় কাটতো বাসারের বৌ মীনার। ছেলে বড় হয়ে নিজের লেখাপড়া আর খেলাধুলা নিয়ে থাকে ব্যস্ত। মীনা না পায় স্বামীর সান্নিধ্য, না ছেলের সঙ্গ। কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে মীনার গায়িকা হিসেবে ভালই নাম ছিল। দু'একবার টিভিতেও দলীয় সংগীতে অংশ নেয়ার সুযোগ হয়েছিল মীনার। এখন সময় কাটতে চায় না তার। উভয় বাংলার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে আস্তে আস্তে জড়িত হয়ে পড়েছে মীনা। কয়েকদিন বাসার বাসায় ফিরে রাত দশটায়ও দেখে মীনা নেই। একদিন রাত বারোটায় গিটার হাতে বাড়ি ফিরেছে মীনা। বাসারের উত্তেজিত প্রশ্ন, কোথায় ছিলে এত রাত? ফাংশান ছিল, মীনার উত্তর। এত রাতে ভদ্রঘরের মেয়েদের বাইরে থাকা আমি পছন্দ করি না, বললো বাসার। তোমার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে তুমি থাকো, মীনার নির্লিপ্ত জবাব। ক্রমশ দু'জনই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বাসার মীনার হাতের গিটারটি নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেললো। মীনা বলল, ইউ আর এ ব্রুট, আনকালচারড। বাসার মারলো বিরাট এক চড় মীনার মুখে। মীনা ঘুরে পড়ে গেল পাশের চেয়ারের হাতলের ওপর। রক্ত ঝরলো কপাল থেকে। হতভম্ব বাসার কিছু বোঝার আগেই পাশের কর্নার টেবিলে রক্ষিত ফোন থেকে ৯৯৯ ডায়াল করে মীনা বলল, আমার স্বামী আমাকে হত্যা করতে চাইছে, প্লিজ কাম অ্যান্ড সেভ মি। এ বলে সে বাসার ঠিকানাও দিল পুলিশকে। কিছুক্ষণ পরে দরজায় করাঘাত। দরজা বাসারই খুলে দিল। পুলিশ বলল Where is the gun? হয়্যার ইজ দি গান? ব্রিং ইট আউট। বাসার বুঝতে পারলো না পুলিশ তার কাছ থেকে 'গান' চাইছে কেন? পুলিশ এ ধরনের ঘটনায় গুলিগালার ব্যবহারের সাথে পরিচিত বলেই তারা প্রথমেই খোঁজ করছে আগ্নেয়াস্ত্রের। পুলিশ বাসারকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলে বাসার তার পরিচয় দিয়ে বলল, স্থানীয় এমপি তার বন্ধু এবং সে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আরও জানালো, তার স্ত্রীর সাথে সামান্য কথা কাটাকাটির পরের ঘটনা। পুলিশ তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে পরের দিন তাকে থানায় যাওয়ার জন্য বলে চলে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বাসার দেখে মীনা চলে গেছে। টেবিলে একটি চিরকুটে লেখা, আমার পক্ষে এ জীবন যাপন সম্ভব নয়। বাসারের সব কথা শুনে

রসুল জিজ্ঞেস করলো, মীনা এখন কোথায়? রসুল কার্ডিফ আসার এক সপ্তাহ আগে চলে গেছে মীনা। ও এখন তার ভাই-এর বাসায়, জানালো বাসার।

রসুল বলল, যাও মীনাকে নিয়ে এসো। না, যে স্ব ইচ্ছায় চলে গেছে, তার সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখবো না। দৃঢ় কণ্ঠে বলল বাসার। রসুল দিন দুই বোঝালো বাসারকে, যে স্ত্রীর কাছে দোষ না করেও ক্ষমা চাইলে তুমি ছোট হবে না, বরং ওতে তোমার মহত্ত্বে প্রমাণ হবে। আস্তে আস্তে নরম হলো বাসার। রসুলকে নিয়ে গেল মীনার ভাই-এর বাসায়। মীনা এসে বসলো ড্রয়িং রুমে। বাসার চুপ মীনার মুখেও কথা নেই। বাসারই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, জানতো আমি রাঁধতে পারি না। সুমনেরও খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে। চল বাড়ি যাই। বাসারের স্নেহমিশ্রিত আহবান। তারা পরে বাড়ি ফিরল। বাসার এখন নিয়মিত বাড়ি ফেরে, আর মীনা কোন অনুষ্ঠানে বাসারকে ছাড়া যায় না।

শিক্ষা-দীক্ষা

হাড়কিপটে এক পিতা তার দুর্দান্ত পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক রাখেন আর মাস শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষক মশায়কে অযোগ্যতার অপবাদ নিয়ে বিদায় নিতে হয় বিনে বেতনে। শেষ পর্যন্ত পিতার অফার করা খুব কম বেতনে একজন চৌকস শিক্ষক শাইলক পিতার পুত্রকে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ছেলের জন্য সস্তায় শিক্ষক নিয়োগ করতে পারায় পিতা নিশ্চিন্ত। একদিন তিনি ছেলের লেখাপড়ার অগ্রগতি দেখতে এলেন। মাস্টার মশায় ছেলেকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। ছেলে ঢুলে ঢুলে পড়ছে, "লাইম ওয়াশ মানে চুনকাম করা, লাইম ওয়াশ মানে চুনকাম করা।" বাবার আক্কেল গুড়ুম। তেলে বেগুনে রেগে বাবা শিক্ষককে ধমক দিয়ে শুধালেন, এ কেমন ইংরেজি? চুনকাম মানে লাইম ওয়াশ? বিনীতভাবে কমবয়সী শিক্ষক বললেন, দেখুন স্যার, এক শ' টাকায় হোয়াইট ওয়াশ হয় না, লাইম ওয়াশই হয় এই টাকায়।

ইংরেজির জন্য ছেলের ক্লাস সিক্স-এর গন্ডি পার হওয়া হলো না। এ পরিশ্রম সাঁতার শেখায় লাগালে হয়তো এই সোনার চাঁদ ছেলে ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে নিয়ে আসতে পারতো দেশের জন্য বিরাট সুনাম, হতে পারতো দ্বিতীয় ব্রজেন দাস। তবে ভাগ্যে যা ছিলো তাই হলো। ছেলে খাতুনগঞ্জে বাবার গদিতে বসলো। মাশাল্লা, এখন সে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তার আসল ব্যবসা যে কি তা খুব বিশ্বাসী কয়েকজন ছাড়া অন্যেরা জানে না।

কিন্তু অনেক উদার বাবা তাদের আদরের সন্তানদের 'সুশিক্ষিত' করার জন্য অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করছেন। এমন কিছু পিতা রয়েছেন যারা ছেলের প্রত্যেক বিষয় পড়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টিচার নিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য, ছেলে যেন পরীক্ষায় উত্তম

ফলাফল করতে পারে। তবে উত্তম শিক্ষার চেয়ে ছেলে স্টার পাবে কিনা সেটাই হলো পিতার একমাত্র ভাবনা। গত কিছু পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে তারকার ছড়াছড়ি। ডিপোজিট একাউন্টে টাকা জমা রাখলে যেমন টাকা বাড়ে, তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশ্নব্যাংক চালু করার পর পরীক্ষায় জব্বর ভালো ফলাফল দেখা গেছে।

বিত্তবান এক ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী তার প্রথম পক্ষের কন্যা সন্তানকে নিয়ে পুরো একটি বছর বলতে গেলে 'কারে' করে ঢাকা শহর চষে বেড়িয়েছেন। কারণ একেক শিক্ষকের বাসা শহরের এক এক প্রান্তে। যেখানেই ভালো টিউটরের খবর পেয়েছেন স্মার্ট মহিলা সেখানেই নিয়ে গেছেন আদরের তনয়াকে। দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলেরা লেখাপড়ায় ছিলো খুবই ভালো। এদের কেউ কেউ পরীক্ষায় মেধা তালিকায়ও স্থান পেয়েছিলো। ওরা সবাই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে জীবনে এখন প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পক্ষের সন্তানদের জন্য বাবা কিন্তু তেমন অর্থ বা সময় ব্যয় করতে পারেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী বিদ্যায় না হোক বুদ্ধিতে পাকা। মেয়ে কোন বিষয়ে কাঁচা থাকুক তা মহিলা চান না। তাই মেয়েকে নিয়ে তিনি পেরেশান। জান যাক তা-ও সই, তবুও মান বাঁচাতে হবে। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফল যেমন হয়েছে তার মেয়েরও ফল অন্তত তেমন হওয়া চাই। জুহি চাওলা কেমন 'চুলি' পরে, রেখা চুল বাঁধে কেমন করে তা নকল করতে এ মেয়ের জুড়ি নেই। মায় বোম্বের উঠতি বা পড়তি তারকাদের কুষ্ঠি তার ঠোঁটস্থ। এসব ক্ষেত্রে সত্যিই অদ্ভুত মেয়ের স্মরণশক্তি। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারটা এলে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যায় বেচারা মেয়েটির।

মা রেডি হয়ে যান সকাল আটটা না বাজতে। মেয়ের ড্রেস-আপ করতে কিছুটা সময় লাগে। সাড়ে আটটা থেকে সেই যে ঘোড়দৌড়, থুড়ি, মোটর রেস শুরু হয়, তা রাত আটটার আগে থামে না। কোনদিন দুপুরেও মা মেয়ে খেয়ে নেন বাইরে। বাড়িতে এসে সময় নষ্ট করার সময় হয় না। শুক্রবারটা অন্য রকম। ওদিন বাড়িতে নাচের টিচার আসেন। নাচ যতোটা না শিল্পের জন্য তার চেয়ে বেশি মেয়ের ফিগার ঠিক রাখার জন্য। যা হোক এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেলো মেয়েটি তারকাবিহীন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, ঐ বাড়ির কাজের বুয়ার মেয়ে জামালপুরের এক অখ্যাত স্কুল থেকে দু'দু'টো লেটার নিয়ে পাস করেছে প্রথম বিভাগে।

কোমলমতি কিছু ছেলে প্রশ্নব্যাংক চালু রাখার দাবিতে ঢাকা শহর ও বাইরে বেশ কয়েকদিন ধরে ধাবাধাবি করেছে। এসব উচ্ছৃংখল ছেলে বহু সংখ্যক যানবাহন ভাঙচুর করেছে। ছেলেদের আবদার সরকার মানেনি। এতে সাড়া দেয়নি

কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আরো আশার কথা, কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনও ওদের সমর্থন দেয়নি।

উচ্ছৃংখল টিনএজারদের অন্যায় দাবির পক্ষে কথা বলেনি বা পত্রিকায় বিবৃতি দেয়নি কেউ। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়, কারা উস্কানি দিয়েছে এসব অল্প বয়স্ক ছাত্রদের, যার ফলে ভাঙচুর হয়েছে প্রচুর সংখ্যক যানবাহনের।

পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশ এ সবের পেছনে রয়েছে কোচিং সেন্টার নামধারী কতিপয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ওসব সেন্টারের গুণধর শিক্ষকরা নাকি ছেলেদের বুঝিয়েছেন, প্রশ্নব্যাংক বহাল থাকলে পরীক্ষায় ফলাফল ভালো হবে। কিন্তু তাঁরা এটা বলেননি-এর ফলে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পরিধি কতদূর বাড়বে। রাজধানী ঢাকায় এখন লন্ড্রীর চেয়ে কোচিং সেন্টারের সংখ্যা বেশি। লন্ড্রীর কাজ কাপড় ধোলাই করা আর কোচিং সেন্টারের কাজ ছেলেমেয়েদের মগজ ধোলাই করা, বললেন আমার সুরসিক এক বন্ধু।

স্কুল লেবেলে যদি সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা যায় তা হলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। প্রাইমারী লেভেলে ভালো শিক্ষা না পেলে মাধ্যমিক স্তরে উঠতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হিমশিম খেয়ে যাবে। স্বাধীনতার কিছুদিন আগ থেকে গণঅভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার খেসারত দিতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকে।

খুবই লজ্জার কথা- একজন গেজেটেড সরকারি কর্মচারীকে বৃটেন বা জাপানে কোন প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার আগে ঢাকায় অবস্থিত ঐ সব দেশের দূতাবাসে আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আমাদের শিক্ষার মান কত নিচে নামলে অন্য দেশ এমন শর্ত দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারে।

জার্মানী বারবার পৃথিবীতে চমক সৃষ্টি করেছে বিভিন্নভাবে। এটা অনস্বীকার্য, লেখাপড়ায় ইউরোপ বা পশ্চিমা কোন দেশ জার্মানীর সমতুল্য নয়। এরই ফলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সমরবিদ্যায় সেই জাতি নানা প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে দু'দু'টো বিশ্বযুদ্ধে চরম পরাজয় বরণ করার পরও। সংযুক্ত জার্মানী তার মিত্র দেশগুলোর জন্য এখনো হুমকিস্বরূপ। এর একমাত্র কারণ তারা লেখাপড়ার মান বজায় রাখার ব্যাপারে সব সময় হুঁশিয়ার ছিলো ও আছে। 'নলেজ ইজ পাওয়ার'- এ প্রবাদটি জার্মানরা মানে অক্ষরে অক্ষরে। আর একটি বৈশিষ্ট্য ঐ জাতির, তা হলো নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতা। অপরদিকে আমরা বৃটেনে দেখতে পাচ্ছি সামাজিক অবক্ষয়। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি অনীহা। এর পেছনে কাজ করছে এক ধরনের শিক্ষকের উগ্র ট্রেড ইউনিয়নিজম।

বছর পাঁচেক আগে লন্ডনের কতিপয় স্কুলের ছাত্ররা সে দেশের শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ওপর চড়াও হলে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাউন্টেড পুলিশ-এর হস্তক্ষেপ করতে হয়।

বৃটেনে টিনএজারদের মধ্যে ড্রাগ এডিকশন বেড়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে। এদের মধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রী রয়েছে অনেক। বিভিন্ন প্রকার ড্রাগের সাংকেতিক নাম প্রচলিত আছে টিনএজারদের মধ্যে এবং তারা অবলীলায় মুরুব্বীদের সামনে ব্যবহার করে ঐ সব নিষিদ্ধ বস্তুর নাম।

তিন বছর ধরে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, লন্ডনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শতকরা ৫১ ভাগ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ সেবন করছে। এসব ছেলেমেয়েদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছর।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সোস্যাল পলিসির অধ্যাপক হাওয়ার্ড পার্কার পরিচালিত সমীক্ষায় বলা হয়, যাদের বয়স এখন ১৭, যারা এতদিন ড্রাগ সেবন করেনি, তারা আগামী বছর থেকে এ নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করবে। তিনি আরো বলেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যে শহরাঞ্চলে ড্রাগ সেবন যারা করে না, তারা হয়ে যাবে সংখ্যালঘু।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি কার্টুনের কথা। সুবেশিনী এক মহিলা বারো বছরের এক ছেলেকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে সিগারেট খাও, তোমার বাবা কি তা জানেন? দু' আঙুলের মধ্যে সিগারেটটি নিয়ে নির্লিপ্ত ছেলে ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করলো, আপনি যে পরপুরুষের সাথে কথা বলেন, তা কি আপনার স্বামী জানেন?

সূর্যোদয়ের দেশ

আপন মেয়ের হোম ওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করছিলেন এক মার্কিন মাতা। সূর্য কোনদিকে ওঠে, মা তার উত্তর মেয়েকে লিখতে বলায় বিরক্তিভরা দৃষ্টি হেনে মেয়ে বললো, তা আমি কি করে জানবো? ও সময় কি আমি ঘুম থেকে উঠি?

কিন্তু সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের জন্য এ যুক্তি প্রযোজ্য নয়। শিশুকাল থেকেই এ দেশের ছেলেমেয়েদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দেয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরম আঘাত সয়ে জাপান শুধু নিজের পায়েই দাঁড়ায়নি বরং আজ বিশ্বের সাতটি ধনী দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে এক গৌরবজনক অবস্থানে বিরাজ করছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হিসেবে জাপানের দাবিও ন্যায়সংগত বলে বৃহৎ শক্তিবর্গ মনে করে। বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে বহু জাপানী নাগরিক অধ্যবসায়, শিক্ষার মান পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার জন্যেই।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর এই জাপানই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মিসৌরীতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রবাহিনী প্রধান মার্কিন সমরনায়ক ডগলাস ম্যাকআর্থারের কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

গত ৬ আগস্ট হিরোশিমাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর বোমা বর্ষণই জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এর আগেই জাপান সোভিয়েট ইউনিয়নের মাধ্যমে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন ঐ প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। বরং প্রাচ্যে সোভিয়েট অগ্রাভিযান

রোধ করার লক্ষ্যে এবং মিত্র সমরশক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখাবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা কর্তৃক আণবিক বোমার ব্যবহার করা হয় বলে পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেন। যে সময় আণবিক বোমা বর্ষণ করা হয় তখন জাপান ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিলো। জাপানী শহরগুলো আমেরিকার আকাশ-বোমায় ছিন্ন ক্ষতবিক্ষত। ঐতিহাসিকদের অভিমত, ঐ বোমা বর্ষণ যতোটা না জাপানকে আত্মসমর্পণের জন্য, তার চেয়ে বেশি ছিলো যুদ্ধকালীন মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

হিরোশিমায় ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সকাল বোমা আঘাতে নিহত হয় ৭০ হাজার নাগরিক। পরে ঐ বোমার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হয় দ্বিগুণ লোকের। প্রতিবছর সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করা হয় এই দিনে। মানুষের মৃত্যু যে কোন জায়গায়ই হোক না কেন তা করুণ।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। জাপানী সেনারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যে রকম অত্যাচার করেছিলো তার ফলে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে জাপানের বিরুদ্ধে বিপুল জনমত গড়ে ওঠে।

এ ছাড়া জাপানী সেনারা নানকিং (নানকিন) শহরে ঢুকে পড়ে ১৯৩৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এবং দু'মাস যাবৎ হত্যাযজ্ঞ চালায় ঐ শহরে যার ফলে দু'লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বার্তা দিয়ে যে দেশে আধুনিক সময়ে দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লব হয়েছিল, সেই ফ্রান্স তাদের আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরে।

জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আরো দেশ আণবিক পরীক্ষা চালাবার ফরাসি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক আদালতে ফরাসি দেশের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বলেছে। কিন্তু শক্তিবলে বলীয়ান দেশ রীতিনীতির ধার ধারে না।

দুনিয়ার এদিক-সেদিক দেখলে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বলকে বল দিয়ে ঠেকানো যায়- রীতিনীতি সভ্য আইন কানুন সেখানে ভূলুণ্ঠিত। এক সময়কার প্রবল প্রতাপান্বিত জাপান, যে নাকি রাশিয়াকে হারিয়েছিলো [illegible] এ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯০৫), সেই জাপান হারালো তার অধিকৃত কুরিল দ্বীপমালা মস্কোর কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম সময়ে। ফ্রান্স ও আমেরিকাকেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে সরে যেতে হলো ইন্দো-চায়না থেকে।

সেদিন ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবস স্মরণ করতে গিয়ে শান্তির জন্য প্রার্থনা

করেছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। খোদ হিরোশিমা শহরে ৬০ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে সেদিন। সকলের মুখেই শান্তির বাণী, শান্তির জন্য আন্তরিক কামনা। জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালির প্রতিনিধি যোসেফ ভারনার রীড-এরও উচ্চারণ ছিলো একই ধরনের। কথায় ও কাজে এক না হলে তা কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় জাতিসংঘ যে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে, তা বিবেকবান মানুষদের হতবাক করে দিয়েছে। জাপানী নাগরিক আকাশী হলেন বসনিয়া- হার্জেগোভিনায় জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি। সেখানে তার 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী মহাথির মোহাম্মদ জাতিসংঘের ভূমিকার নিন্দা করে বলেছেন, এই বিশ্বসংস্থার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানকে শোকদিবস হিসেবে পালন করা উচিত। এটা অনস্বীকার্য, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of power) নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একটি কার্যকর বিশ্বসংস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই সব দেশকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে কি করে বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ যেমন একটি দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে তেমনি অন্তর্ঘাতী সংগ্রামও যে কোন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে যেমন জাতিতে জাতিতে সমঝোতার প্রয়োজন, তেমনি একটি দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন আলোচনার মাধ্যমে সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের।

ষাট দশকে জাপানে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয় চরমভাবে। এবং এর পুরোভাগে ছিল ছাত্রসমাজ। জিংগকুরেন নামক ছাত্র সংগঠন-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল লেগেই ছিল বড় বড় জাপানী শহরে। এর ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাপানী শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু তদানীন্তন জাপানী সরকার বিচক্ষণতার সাথে সে আন্দোলন মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়। সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে জাপান বর্তমান বিশ্বে এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত, যা নাকি যে কোন দেশের জন্য অনুকরণীয়।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ!

সুরসিক অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের ক্লাস আমরা পারতপক্ষে মিস করতাম না। তিনি গল্পচ্ছলে পড়াতেন। একদিন ছাত্রপ্রিয় এই অধ্যাপক দূরপ্রাচ্যের ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এম এ শেষ বর্ষে ছাত্র সংখ্যা ছিল জনা তিরিশ। প্রায় চার যুগ আগের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী আজকের মত গিজ গিজ করত না। মেয়ের সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মত। আমাদের ক্লাসে ছিল মাত্র দু'জন। তাও তারা এসেছে বিএ পাস থেকে। অনার্সে কোন মেয়েই ছিল না। বাংলা বিভাগে ছিল মেয়েদের আধিক্য তখনও। অনেকে রসিকতা করে ঐ বিভাগকে প্রমীলা রাজ্য বলে আখ্যায়িত করত।

ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপকের মধ্যে আরো ছিলেন মুনির চৌধুরী, রাজ্জাক স্যার, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অজিত গুহ। এরা জনপ্রিয় হওয়ার চেয়ে ছাত্রপ্রিয় হওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করতেন। তাই তাঁরা পড়াবার কায়দাটা রপ্ত করেছিলেন ভাল করে। তাছাড়া অর্থোপার্জনের বিভিন্ন দিক আজকের মত তখনকার শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি।

যা বলছিলাম। সন্তোষ স্যার গল্প দিয়ে তাঁর ক্লাস শুরু করলেন। দিনাজপুর সাঁওতালএলাকায় ছুটে গেলেন এক পাদ্রী। উদ্বিগ্ন পাদ্রী সদ্য খৃষ্টান-ধর্মান্তরিত সাঁওতালকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সত্যি সাঁওতালরা পুনরায় বোংগা সর্দারকে পূজা শুরু করছে। হাজং সর্দার মাথা নেড়ে বললেন, খবর সত্যি। তবে তিনি যোগ করলেন, খৃষ্টান হইয়াছি বলিয়া কি বাপ-দাদার ধর্ম ভুলিয়া যাইব?

পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় যত বড়াই করুক না কেন তারা কিন্তু তাদের স্বধর্মের সঙ্গে অধর্ম করে না কখনও। বসনিয়া সম্পর্কে

সংবাদ পরিবেশনায় ক্ষেত্রে তারা একটা বৈধ সরকারের পরিচয় দেয় ধর্ম দিয়ে এবং অপরটির জাতীয়তা দিয়ে। বৈধ সরকার হল বসনিয়ান মুসলমান আর অবৈধ দখলদাররা হল সার্ব-বসনিয়ান। কি সুন্দর সমীকরণ। বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও যাবতীয় বৃহৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মালিক মোক্তার হলেন গিয়ে খৃস্টান বা ইহুদী। জর্দানকে রক্ষা করতে গর্দান দিতে যারা রাজি তারা আবার বসনিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম সরকারকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সংগ্রহ করতে দিতে গররাজি। লাখ লাখ বসনিয়ান মুসলমান যখন সার্ব বর্বর হামলায় নিহত হচ্ছে তখন দূরে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের সৈন্যরা পলাশীতে মীরজাফরের বাহিনীর মত সাক্ষীগোপালের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নিস্ফল হুংকার দেয়া হয়- সার্বরা বাড়াবাড়ি করলে বিমান হামলা করা হবে। সার্ব অবরুদ্ধ গোরাজদে শহরে ২০ আগস্ট (১৯৯৫) সার্বদের নিক্ষিপ্ত গোলায় তিনটি নিরীহ শিশু নিহত হওয়ার পরও প্রতিশ্রুত ন্যাটো বিমান হামলা করা হয়নি।

বসনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ সিকারবি জাতিসংঘের এরূপ আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করেছেন। সিকারবি বলেন, জাতিসংঘ সার্ব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে এক চিঠিতে বসনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ব হামলার জবাবদানের জন্য জাতিসংঘের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে অবরুদ্ধ গোরাজদে'কে অরক্ষিত রেখে জাতিসংঘ বাহিনীকে আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত তাবৎ পৃথিবীর বিবেকবান মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম শান্তিরক্ষী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, জাতিসংঘ সেখানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘ বাহিনীর চোখের সামনে বসনিয়ান ছিটমহল দখল করে নিল অবৈধ সার্ববাহিনী আর সেখানে চালালো নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। যার স্বাক্ষর রয়েছে সার্ব অধিকৃত ছিট মহলের গণকবরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরও জার্মানী কর্তৃক ইহুদী নিধনের নিন্দা করতে গিয়ে যেসব 'সভ্যদেশ' মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে তাঁরা আজ শুধু নীরব নিস্তব্ধ সমাহিত দর্শক-পর্যালোচক।

পশ্চিমা মিডিয়া ক্রোয়েশীয় প্রেসিডেন্ট তুজম্যান-এর ওপর নাখোশ। তাঁর অপরাধ তিনি ক্রোয়েশীয় ভূখন্ড দখলকারী সার্বদের ক্রাইনা থেকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছেন। সরাসরিভাবে তাকে অপরাধী আখ্যা না দিয়ে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন 'কালো' দিকের প্রতি দক্ষ পশ্চিমা সংবাদ-কারিগররা আলো নিক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে পড়েছেন।

টিটোর দক্ষিণহস্ত হিসেবে কাজ করেছেন তুজম্যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং টিটোর মতই নাকি তাঁর চলন বলন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং জাগরেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক তুজম্যানের চরিত্রে নাকি একনায়কত্বের প্রবণতা রয়েছে। তুজম্যানের পশ্চিমা স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ এবং মন্তব্য উন্নত বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমের মালিক মোক্তারদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। তুজম্যান মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৬০ লাখ ইহুদী নিধনের দাবি অতিরঞ্জিত। নাজি-বিরোধী আন্দোলনে একজন সক্রিয় যোদ্ধার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়েছে অবৈধ সার্বদের বিরুদ্ধে তুজম্যানের সার্থক অভিযানের পর।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম কতটুকু সার্থক তার পরিচয় খুঁজতে বেশি দূর যেতে হয় না। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'- নীতি অবলম্বন করে অতিসম্প্রতি ইরাক সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করেছে এক পশ্চিমা বার্তা সংস্থা। খবরে বলা হয়েছে, ইরাকী একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের পুত্র উদয় তার সৎ চাচাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ খবর পরিবেশনার পর ঐ নিহত চাচাকে দেখা গেল সশরীরে ইরাকী টেলিভিশনে। তাকে স্বচক্ষে সাংবাদিকরা দেখলে কি হবে! উন্নত বিশ্বের বড়মাপের সাংবাদিকরা তারপরও প্রশ্ন রেখেছেন, ইরাকী টেলিভিশনে তো বলেনি চাচার পায়ে আঘাত লাগল কি করে?

এক সময় কমিউনিস্ট হওয়া ছিল পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে বড় গোনাহর কাজ। তুজম্যান কমিউনিস্ট থেকে জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছেন এটাও তাঁর অপরাধ। আসল কথা হল বেয়াদব হলেও অবৈধ সার্বরা তো বসনিয়ান মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে- সেখানে তুমি বেটা তুজম্যান সার্বদের বিরুদ্ধে এইছা ঠেলা দিলে, যার ফলে মুসলমান বসনিয়ানদের সুবিধা হয়ে গেল। এ কেমন কথা।

সংবাদমাধ্যমের এ খেলা নতুন কিছু নয়। অ্যাংলো-ইরানী তেল কোম্পানি জাতীয়করণ করে মোসাদ্দেক পশ্চিমা দেশসমূহ ও তাদের সংবাদ মাধ্যমের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকের কথা প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমের প্রিয়ভাজন রেজা শাহ পাহলভী নিজের গদি পোক্ত করেন। মোসাদ্দেককে প্রাণ হারাতে হয় কারান্তরালে। কিন্তু এত করেও শাহ শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। দুই দশক পর নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন শাহ এতটুকু আশ্রয়ের আশায়।

চীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, আলজেরিয়ার বেন বেল্লা, মিসরের নাসেরসহ আরও বহু জননেতা যখনই পশ্চিমের স্বার্থবিরোধী কাজ করেছে, তখনই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ঐসব নেতার চরিত্র হননের জন্যে হলো

হয়ে উঠেছে। ইদানীংকালে প্রয়াত মাও সেতুং-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসায় মেতে উঠেছে এক ধরনের পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম। কারণ চীন থেকে এখনও মাও সেতুং-এর ভাবমূর্তিকে মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত ভেঙে খান খান হয়ে পড়েনি।

বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা ভাসানী অনেক পশ্চিমা সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ছিলেন Prophet of violence (ধ্বংসের নবী)। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির জন্য পাকিস্তানে তিনি সংগ্রাম করে শুধু বিদেশী নয়, তাদের দেশীয় বংশবদদের বিরাগভাজন হন। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যার দাবি করায় এই বাংলাদেশেরই (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ভাসানীর ফাঁসির জন্য গণস্বাক্ষর অভিযান পর্যন্ত চালিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তি চরিত্র হননের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিত্ব তার স্বমহিমায় ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেন। সত্যকে সাময়িকভাবে চাপা দেয়া যায়। কিন্তু নিজ বলেই সত্য আত্মপ্রকাশ করে একদিন।

আবার ফিরে যাই আমার শিক্ষক প্রয়াত সন্তোষ ভট্টাচার্যের ক্লাসে। তিনি পড়াচ্ছিলেন চীনের মিং রাজবংশের ইতিহাস। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, পাঁচজন রাজাই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এক নিঃশ্বাসে তিনি তাদের নামও বলে গেলেন। ভাল ছাত্র মেসবাহ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার নাম তো বললেন চারজনের, আর সংখ্যা বললেন পাঁচ। "ঐ অং বং-এর মধ্যে পাঁচ জনের নামই খুঁজে দেখ, পাবে" এই বলে ধূতির কোঁচা ঠিক করতে করতে স্যার উঠে গেলেন।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রচারিত সংবাদ খুঁটিয়ে পড়লে সত্য খবর পাওয়া যাবে।

নিয়তির পরিহাস

এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয় একজন আমেরিকান, স্কটল্যান্ডের এক বাসিন্দা ও একজন কানাডিয়ান। হেভেন-এর দোরগোড়ায় পৌছাবার পর সেন্ট পিটার তাদের জানালেন, ভুলক্রমে তাদের পরপারে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এ ভুল সংশোধনের একটি তরিকা তিনি তাদের বাতালেন। প্রত্যেকে সেন্ট পিটারকে ৫০০ ডলার করে দিলে তাদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে- এমন একটি দুর্ঘটনা হয়েছে তার কোন চিহ্নও থাকবে না।

মার্কিন নাগরিকটি সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে ফিরে পায় জীবন। হাসপাতালে ডাক্তার অন্য দু'জনের খবর জানতে চাইলেন পুনরুজ্জীবিত আমেরিকানের কাছে। মিঃ স্মিথ বললেন, স্কট টাকার পরিমাণ নিয়ে সেন্ট পিটারের সাথে দরাদরি করছে, আর কানাডিয়ান বলছে, তার সরকারকেই দিতে হবে এ টাকা।

কানাডীয় নাগরিক যথার্থই বলেছে। তার দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে। এ হেন দেশের নাগরিকের সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বের ভার সেসব দেশের সরকার নেবে, সংগত কারণেই 'নিহত' কানাডিয়ানের তেমন দাবিকে দাবিয়ে রাখা ঠিক নয়।

সম্প্রতি ইউএনডিপি'র (খুউ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর আলোকপাত করা হয়।

শিল্পোন্নত বিশটি দেশের মধ্যে ফ্রান্সের অধিবাসীরা মদ্যপানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এতকাল আমরা ফ্রান্সকে শিল্প সাহিত্য ফ্যাশনের পীঠস্থান বলেই জানতাম। খাদ্যরসিক বলেও ফরাসীদের সুনাম রয়েছে। ফ্রান্সের সদ্য প্রয়াত

প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ তাঁর দেশে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক মতবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে দেশে একশ' বিশ রকমের পনির পাওয়া যায়, সেখানে কোন জাতীয় ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছানো দুরূহ ব্যাপার। তবে UNDP-র প্রতিবেদনে বসবাসের জন্য ফ্রান্সকে খুব উৎকৃষ্ট স্থান বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে ক্রমানুসারে কানাডার পর নাম এসেছে যে দেশকে আমরা জানি সবচে' উন্নত ও বর্তমান বিশ্বের অদ্বিতীয় মুরুব্বি বলে মানি, সেই আমেরিকার। এর পরের সারিতে রয়েছে জাপান, হল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও নরওয়ে।

কমিউনিস্টদের সাথে মিলেমিশে যাওয়া জার্মানী পড়ে গেছে অনেক পিছনে। স্পেন, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডের পর এসেছে জার্মানীর নাম। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না একদিন, সেই বৃটেনবাসীর সেদিন আর নেই। টেনেটুনে বৃটেন অষ্টাদশ স্থানে অবস্থান করছে। তার দুইস্থান নিচে রয়েছে ইটালী। রোমান সাম্রাজ্যেরও ঐতিহ্য আজ অতীত দিনের ইতিহাস।

কানাডার এ রকম ভাল অবস্থার পেছনে কি জাদু রয়েছে, স্বভাবতই এ প্রশ্ন আসতে পারে। প্রতি বর্গমাইলে ঐ দেশে বাস করে মাত্র সাতজন (হ্যাঁ, সাতজনই)। সাড়ে আটত্রিশ লাখ বর্গমাইল জুড়ে যে দেশ তার জনসংখ্যা মাত্র পৌনে তিন কোটি। তাছাড়া প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ওখানে দিয়ে রেখেছে মাটির ওপরে-নিচে বেশুমার সম্পদ। আর কর্মঠ শিক্ষিত জনশক্তি প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

UNDP-র প্রতিবেদনে বাংলাদেশেরও উল্লেখ রয়েছে। জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে আমাদের স্থান রয়েছে ১৪৬-এ। যেখানে পশ্চিম গোলার্ধের ভৌগোলিক দিক থেকে সবচে' বড় দেশে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে মাত্র সাতজন মানুষ, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাস করছে প্রায় দু'হাজার দু'শ' জন।

ফরাসী ভাষী কুইবেকের সাথে ইংরেজি ভাষী কানাডার অন্যান্য অঞ্চলের মতানৈক্য থাকলেও তা কিন্তু ঐ দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে স্থবির করে দিতে পারেনি।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে পারায় সিঙ্গাপুরের মত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে পঁয়ত্রিশতম স্থানে। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান হলো ৯৫তম। রাজনৈতিক অস্থিরতাই যে এ জন্য দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ দিকে এই সেদিনের প্রবল প্রতাপান্বিত সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান

উত্তরাধিকারী রাশিয়া তারই এক সময়ের তাঁবেদার রাষ্ট্র পোল্যান্ড থেকে এক স্থান নিচে রয়েছে। পোল্যান্ডের স্থান হলো ৫১তম। সোভিয়েট সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছে কিন্তু ক্রেমলিনের কর্তাব্যক্তিদের হৃত রাজা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে তাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল সম্পদ, যা দিয়ে নাকি সাধারণ জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা যেতো। কথিত আছে, এক রুশ রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় গেলে প্রত্যেক রুশবাসীকে একটি করে হেলিকপ্টার দিবেন। দুষ্প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের কাজে নাকি হেলিকপ্টার বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

কমিউনিস্ট শাসিত প্রাক্তন পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানীদের মতে, তাদের ওপর বড় একটা বোঝা। পূর্ব জার্মানীর এক ব্যাপারে বার্লিন ওয়াল পতনের পর খুব সুনাম হয়েছে। ওখানে নতুন কোন টুরিস্ট গেলে কোন প্রার্থিত ব্যক্তির সন্ধান তার পেতে অসুবিধে হয় না। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে শুধু লোকের নাম বললে সে সরাসরি ঐ ব্যক্তির বাড়ি পৌছে দেবে অনায়াসে। চাকরিচ্যুত সিক্রেট পুলিশ সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্যরা এখন ট্যাক্সি চালনাকে তাদের জীবন ধারণের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। প্রক্সি ওয়ার-এ দুই সুপার পাওয়ার অংশ নিয়েছে- তা খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। বর্তমানে খন্ডিত রাশিয়া বিশ্ব দরবারে নিজের দৈন্যদশা মেনে নিতে নারাজ। তাই নিজ প্রভাব-বলয় বজায় রাখার জন্য চেচনিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আর বলকান অঞ্চলে পরোক্ষভাবে। অনেকটা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে অবৈধ সার্বদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া।

রাশিয়াসহ অন্যান্য বড় রাষ্ট্র যে পরিমাণ অর্থ বিত্ত ও নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যয় করছে তার এক ক্ষুদ্রাংশ মানব কল্যাণে ব্যয় করলে পৃথিবীর এক- চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো না।

এদিকে প্রাচুর্যে ভরা দেশসমূহে দেখা দেয় নানারূপ সামাজিক ব্যাধি, নৈতিক অবক্ষয়। ফিনল্যান্ডে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ৪৫ জন আত্মহত্যা করে জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে। রাশিয়ায় এর হার লাখে ৫৩ জন, জাপানে ২২ জন এবং আমেরিকায় ২০ জন।

বৃটেনে সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় এসে জেঁকে বসে আছে দেড় যুগের বেশি সময় ধরে। শ্রমিকদলের শাসনামলে ঘন ঘন ধর্মঘট বৃটেনের অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত হানে, তারই সুযোগে রক্ষণশীল দল নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এর ফলে সাধারণ জনতা তাদের পূর্বে

প্রাপ্য অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে হয় বঞ্চিত। তবে এর ফলে বৃটেনের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে সাধারণ মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এরকম অবস্থায় এক ধরনের পুঁজিপতিদের ভাগ্য ফিরে যায়।

সত্তর দশকের আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বৃটেনের শ্রমিক অসন্তোষের ঢেউ লাগে চরমভাবে। তাই পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বহু শিল্প-কারখানার মালিকরা বাধ্য হয় তাদের প্রতিষ্ঠান পশ্চিম উপকূলে স্থানান্তরিত করতে। সেখানে শিল্পপতিরা শ্রমিক নিয়োগ করে এক শর্তে- তা হলো তারা কোন ইউনিয়ন বা সংগঠন করতে পারবে না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে শ্রমিকরা বলল তথাস্তু। নিয়তির কি পরিহাস এই আমেরিকার শ্রমিকরাই দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবি আদায় করতে গিয়ে শিকাগো'র 'হে মার্কেটে' প্রাণ দিয়েছিল বহু শ্রমিক এক শতাব্দীর বেশি সময় আগে।

অপব্যয় করলে রাজার ধনও শেষ হয়ে যায় একদিন। এখন আমরা আর সৌদি আরব বা কুয়েতের লোক খুব সুখে আছে এমন কথা শুনিনা। সৌদি আরবের সেই রমরমা দিন আর নেই। যখন তখন আর ও- দেশের আমির- ওমরাহরা আগের মত বিদেশে গিয়ে অবকাশ যাপন করতে পারছেন না। স্বদেশে তাদের জন্য অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, অর্থ সাশ্রয় করা। সম্প্রতি সৌদি সরকার অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা সেবামূলক কাজের জন্যও সৌদি নাগরিকদের কিছু বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

আলসে বা অকর্মণ্য লোকরা খোদা প্রদত্ত বা পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ বেশি দিন ভোগ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে শুনুন এক 'লতিফা'। গ্রামের এক যুবক পৈতৃকসূত্রে পাওয়া শেষ তিন বিঘা জমিও বিক্রি করতে চাইলে গ্রামের মাতব্বরা বললেন, বেটা এ জমিটুকু বিক্রি করলে বুড়া বয়সে কি করে খাবে? যুবকটির নির্লিপ্ত জবাব, চাচা, জমি না বেচলে কি খাইয়া বুড়া হমু?

অব্যবহৃত, তাই দামী

বোট রেস-এ এক মাইলের ব্যবধানে জাপানী দল মার্কিনী দলকে পরাজিত করার পর মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এর কারণ নির্ধারণের জন্যে বসলেন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেলো দুই দলেই সাতজন করে লোক ছিল। তবে জাপানীদের ছিল একজন দলনেতা আর ছ'জন দাঁড়ী।

পক্ষান্তরে মার্কিন টীম গঠিত হয় ছয়জন ম্যানেজার ও একজন দাঁড়ী নিয়ে। মার্কিনী দল পুনর্বিন্যাস করা হল। এবার একজন ডাইরেক্টর, পাঁচজন কনসালটেন্ট ও একজন দাঁড়ী। পরের রেস-এ জাপানীরা দুই মাইলের ব্যবধানে জিতলে, মার্কিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শানুযায়ী হতভাগ্য সবেধন নীলমনি দাঁড়ীটি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতামতের খুব দাম। দাম না দিয়েই বা উপায় কি! যে টাকা ধার দেয় তার কথারও সঙ্গত কারণে ধার থাকে বেশি।

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহ কি পারতো সোভিয়েতের নির্দেশ অমান্য করে কোন কাজ করতে! যুগোস্লাভিয়ার টিটো রাশিয়ার সাথে বেয়াদবির জন্য স্টালিনের রোষানলে পড়ে সোভিয়েত ব্লক থেকে হন বিতাড়িত। পরে তাকে পশ্চিমা মুরুব্বীদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রুমানিয়ার চসেস্কুকে নিজের প্রাণ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বেয়াদবির খেসারত দিতে হয়েছে। কমিউনিস্ট হয়েও তিনি কমিকনের ডিকটেশন অনুযায়ী রুমানিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব মস্কোর ওপর ছেড়ে না দিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে দেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। তারই উদ্দেশে বিশ্বব্যাংক থেকে রুমানিয়া নেয় বিরাট

অংকের অর্থ ধার। অবিশ্বাস্যভাবে রুমানিয়া বিশ্বব্যাংকের ধার প্রায় শেষ করে এনেছিল। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের খবরানুযায়ী রুমানিয়া ব্যাংকের সব ধার পরিশোধ করে এক স্বনির্ভর জাতি হিসেবে দাঁড়াবার দোর গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। যাহোক বিশ্ব রাজনীতির জটিল চক্রান্তের ফলে রুমানিয়ার সে দৃপ্ত পদযাত্রার সুযোগ হল না। সস্ত্রীক চসেস্কু প্রাণ হারালেন প্রহসনমূলক এক সামরিক বিচারে।

গ্রামাঞ্চলে এক সময়ে সুদের ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন না থাকলেও মানুষকে চড়া সুদে টাকা ধার দিত। চক্রবৃদ্ধির হারে সেই টাকা পরিশোধ না করতে পেরে অনেক নিরীহ মানুষ তার ঘরবাড়ি, হালের বলদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অন্যদিকে ফুলে ফেঁপে উঠেছে সুদের ব্যবসায়ীরা।

বর্তমানে আমাদের দেশের চিত্র একটু ভিন্ন। ধার যারা দিচ্ছে তারা হচ্ছে নিঃস্ব, যারা নিচ্ছে তারা হচ্ছে ধনবান, বলীয়ান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বন্ধু বলতেন, ধার যদি করতেই হয় বেশি করে করবেন। উত্তমর্ণ তখন আপনাকে সমীহ করে চলবে। কম টাকা ধার নিলে সামান্য টাকা আদায়ের জন্য ঐ লোক ঘ্যান-ঘ্যান করবে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে রাজনীতির কচকচানির পাশে খেলাফি ঋণ নিয়ে মুখরোচক আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে। পত্রিকাগুলোর মনে হয় খেয়েদেয়ে কাজ নেই। সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানী লোকদের মান নিয়ে টানাটানি করা যেন তাদের একটা 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক আছে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য, বললেন পরিচিত এক শিল্পপতি। বললাম, ধার নিয়েছেন টাকা ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে। আমাকে মধ্যপথে নামিয়ে দিয়ে শিল্পপতি ভদ্রলোক বললেন, টাকা ফেরত দেবো না তাতো বলছি না। তবে সেটা Payable when able (যখন পারবো তখন ফেরত দেব)।

এই সেদিন কক্সবাজার-এ 'শৈবাল' রেস্তোরাঁয় কথা হচ্ছিল সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব আহসানুল হকের সাথে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের স্থল বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন উপলক্ষে আয়োজিত লাঞ্চে আগত অতিথির মধ্যে ছিলেন মিয়ানমারের কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও টেকনাফের কিছু ব্যবসায়ী, শিল্পপতি। প্রতিষ্ঠিত কিছু শিল্পপতির সাথে পরিচয় ছিল আগেই। তাঁরা সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্কে খুবই উৎসাহী। তারা বিশ্বাস করেন স্থল বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই পাশাপাশি দেশই বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

ভোজন শুরুর আগে জনাব আহসানুল হক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাংক

কক্সবাজারে চলছে কেমন? এক কথায় তাঁর উত্তর, ভাল। ঋণ পরিশোধ কেমন হচ্ছে জানতে চাইলাম। খুবই সন্তোষজনক, উত্তরে তিনি বললেন।

ইতোমধ্যে অতিথিদের সমাগম আরো বেড়েছে। জনাদু'য়েক অতি সাধারণ কাপড়-চোপড় পরা স্থানীয় লোককে আহসান সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন উপস্থিত অতিথি-সাংবাদিকদের সঙ্গে। এদের মধ্যে একজন হলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে মোস্তাফিজ সাহেব বিশেষ অবদান রাখছেন। সোনালী ব্যাংকের সঙ্গেও তাঁর লেনদেন আছে, যা নাকি ব্যাংকের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে খুবই সন্তোষজনক। বিনম্র হাসি হেসে মোস্তাফিজ সাহেব বললেন, আগামীকাল (৭ সেপ্টেম্বর)'৯৫ সাংবাদিক ভাইয়েরা তার প্রকল্প পরিদর্শন করলে তিনি বাধিত হবেন।

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়ছে আগের এক বিরান প্রান্তরে গড়ে ওঠা মোস্তাফিজ সাহেবের চিংড়ি প্রকল্পের গায়ে। আগ্রাসী সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে সমুদ্রের পাড়ে ফেলা হয়েছে বিশাল আকারের অসংখ্য পাথর খন্ড।

সমুদ্রের গর্জন ছাড়া আর কোন আওয়াজ কানে আসে না সেখানে। প্রকল্পের সার্থক নাম-নিরিবিলি। প্রচুর লোক নিয়োজিত রয়েছে প্রকল্পের বিভিন্ন বিভাগে। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পোনা উৎপাদন থেকে বাজারজাত করার আগ পর্যন্ত চিংড়ি বেড়ে ওঠার স্তরগুলো মোস্তাফিজ সাহেব বুঝিয়ে বললেন আমাদের। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বরফ তৈরির ব্যবস্থাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মোস্তাফিজ সাহেব স্বয়ং। বর্তমানে চিংড়ির উৎপাদন বন্ধ। সিজন শুরু হবে কিছুদিন পর। প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্ত সমাহিত লোকটির পদচারণায় রয়েছে ব্যক্তিত্বের ছাপ, তাতে নেই কোন দম্ভের প্রকাশ। চিংড়ি চাষ এখন বন্ধ হলেও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত 'নিরিবিলি' প্রকল্পে রয়েছে ডেইরী, পোলট্রি, হাঁস পালন, সবজি, নারকেল, সুপারি ও রাবারের আবাদ। তাছাড়া আছে পশু, মুরগি ও চিংড়ির খাবার তৈরির সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

মাসিক আড়াই হাজার ডলার করে বেতন দিয়ে এ প্রকল্পে থাইল্যান্ড থেকে দু'জন লোক নিয়োগ করেছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি নিজেও থাইল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন চিংড়ি চাষ সম্পর্কে। বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনার যুক্তি সম্পর্কে মোস্তাফিজ সাহেব বলেন, আশা করেছিলাম আমাদের এখানকার উৎসাহী ছেলেরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে বিদেশীদের কাছ থেকে দেশে থেকেই প্রশিক্ষণ পাবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাই আবার তিনি দু জন বিদেশী আনার ব্যবস্থা করেছেন।

কর্মোদ্যোগী জনাব মোস্তাফিজ তার প্রথম পেশা লবণ উৎপাদনের ব্যবসাটি

আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছেন। মিয়ানমারের স্থল বাণিজ্যের অবস্থা কি হয় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বড় ছেলেকে মংডু পাঠিয়েছেন। এক ছেলে দেখছে হোটেল যার নামও 'নিরিবিলি'। অন্য একজন ঢাকাতে ব্যবসাতে নিয়োজিত।

আরেক কর্মোদ্যোগী লোকের সাক্ষাৎ পাই ফিশ হারবারে। সাতটি ট্রলারের মালিক লুঙ্গি-শার্ট ও গলায় সোনার চেন পরা সফিক মিয়ার গত বছর মুনাফা হয়েছে মাত্র এক কোটি টাকা। সন্ধ্যার আগখানে তিনি তদারক করছিলেন একটি ট্রলারের মেরামতের কাজ। কালো শুশ্রুমণ্ডিত মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে সফিক মিয়া বললেন, এ ট্রলারটি মধ্য সাগরে ডুবে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ট্রলার উদ্ধারের কোন নজির নেই। আঞ্চলিক ভাষায় তিনি জানালেন, আমার হালাল রুজির টাকায় কেনা ট্রলার উদ্ধার করতে পেরে আল্লাহর কাছে হাজার শোকর গোজার করেছি। আরো বললেন, একটি ট্রলারের সাথে ১৪/১৫ জন লোকের রুটি রুজি জড়িত।

মানুষের টাকা থাকলে তা দেখাবার প্রচেষ্টা অনেকের মধ্যে দেখা যায় প্রকটভাবে। ঐ সব টাকাওয়ালাদের অর্থের উৎস কোন পথে তা আমজনতার জানার কথা নয়। তা হয়ত অর্থলগ্নিকারক ব্যাংকসমূহ জানতে পারে। মাটি ও মানুষের সাথে যাদের সম্পর্ক নিবিড় তারা কিন্তু এ গোত্রে পড়ে না।

একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে আজকের নিরস লেখাটি শেষ করছি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক ধনকুবেরকে শল্য চিকিৎসক জানালেন, একমাত্র ব্রেন ট্রান্সপ্লান্টের দ্বারা তাকে বাঁচানো যেতে পারে। তবে এতে খরচ একটু বেশি, চিকিৎসক জানালেন। ধনী লোকটি তাতে রাজি। চিকিৎসক বললেন, তিন ধরনের ব্রেন পাওয়া যায়, দামে তারতম্য রয়েছে এগুলোর। কোন চিন্তা নেই, বললেন ধনী ব্যক্তিটি। প্রফেসরের ব্রেন পাওয়া যাবে পাঁচ হাজার ডলার-এ। ঠিক আছে, বললেন মৃত্যুপথযাত্রী। কিন্তু অন্য ব্রেন-এর দাম কত প্রশ্ন করলেন ধনী লোকটি। দশ হাজার- ওটা হলো এক বিজ্ঞানীর, বললেন চিকিৎসক। তথাস্তু বললেন ধনী লোকটি। টাকা আমার আছে চিন্তা নেই কিন্তু তৃতীয় ব্রেনটি কার, কত দাম? ওটার দাম এক লাখ ডলার- চিকিৎসকের উত্তর। এর দাম এত চড়া কেন, জানতে চাইলেন মৃত্যুপথযাত্রী। ওটা একজন ব্যাংকারের, ওটার ব্যবহার হয়নি। নির্লিপ্ত চিকিৎসকের সাদামাটা জবাব।

শাস্তির সংজ্ঞা

শেখ সাদীকে গোরস্থানের পাশে বসে থাকতে দেখে তাঁর পরিচিত একজন এর কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে শেখ সাদী জানালেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেই বাছাধনকে এ জায়গায় তো অবশ্যই আসতে হবে তাই এই প্রতীক্ষা।

কিন্তু আমাদের দেশে সম্মানিত খাতকদের জন্য কোন শেখ সাদী অপেক্ষা করেন না কোন গোরস্থানে। তাদের অনেকেই ঋণের টাকায় আয়েস করতে যান বিদেশে দূর-দূরান্তে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে 'বাধ্যতামূলক জাতীয় ছুটি' কাটাতে যান স্বদেশের সমুদ্র সৈকতে।

নানা গুণে গুণান্বিত এবং অনেক দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত এক স্বনামধন্য ব্যক্তি কোন এক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বারোটা বাজিয়ে এখন বিদেশে তার নিজস্ব বাড়িতে আছেন সুখে স্বচ্ছন্দে। নাইট ক্লাবের আলো আঁধারীতে সাকীর হাতে মদিরা সেবনের পর তিনি যখন ঘরে ফেরেন তখন বিদেশিনী বধূকেও চিনতে তাঁর কষ্ট হয়। প্রথমা তাঁকে ছেড়ে গেছেন, যে কোন পন্থায় ওপরে ওঠার তাঁর উদগ্র বাসনা থামাতে ব্যর্থ হয়ে। সহজে যারা ওপরে ওঠে তারা ভুলে যায় যে, পোয়েটিক জাস্টিস বলে একটা কথা আছে। ন্যায় অন্যায়ের বিচারে বিচারের রায় শুধু পরকালের জন্য অপেক্ষা করে না।

এক সময়ের সেই বিখ্যাত ব্যক্তি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে আজ অখ্যাত জীবন যাপন করছেন মাথায় বিরাট ঋণের বোঝা বয়ে। নিজ জন্মভূমিতে তার আর ফেরা হবে কিনা তো ভবিতব্যই জানে। এরমধ্যে ঐ ব্যক্তিটির কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেলো উপরের নির্দেশ পালনকারী হতভাগা এক ব্যাংক কর্মকর্তা। কিন্তু প্রশ্ন

হলো, কোনদিন কি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে পাওনা কোটি কোটি টাকা আদায় হবে? তবে গৌরী সেনের টাকা মার গেলে কার কি? কিন্তু গ্রামের বিধবা জরিনা খাতুনরা ঋণের টাকা শোধ করে গুনে গুনে।

ব্যাংকার হোঁচট খেয়ে হুঁশিয়ার হয়েছে। তা না হলে ঝড়-ঝঞ্জা ও নাফ নদীর উত্তাল ঢেউ উপক্ষো করে এই সেদিন সোনালী ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা তাঁর সহযোগীদের নিয়ে যেতেন না মিয়ানমারের মংডু'তে। উদ্দেশ্য, মিয়ানমারের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়াগ ও লেনদেনের ব্যাপারে উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করা। সর্বোপরি ব্যাংকের দেয় টাকা যেন অথৈ পানিতে না পড়ে সেদিক নজর রাখা। যে স্পীড বোটগুলোতে করে ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, মন্ত্রী ও সরকারি কর্মচারীদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন সেই বোটগুলো টেকনাফ আনা হয়েছে ত্রাণ কাজ পরিচালনা ও বার্মা থেকে আগত শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ব্যবহারের জন্য।

ইতিহাসের চাকা কেমন করে পাল্টে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বর্মী রাজা কর্তৃক আরাকান অঞ্চল দখলের পর বহু মগ নর-নারী পালিয়ে আসে টেকনাফ হয়ে কক্সবাজারে। ইংরেজ লেফটেনান্ট কক্স সাহেব এসব মগদের আশ্রয় দেন, তার নামানুসারে পরিচিত অঞ্চল কক্সবাজারে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার শহরের জনসংখ্যা ১৯৬১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী ছিলো সাড়ে আট হাজার। আর এখন ৭৫ হাজার।

বারো বছর আগে আমার দেখা কক্সবাজার আর আজকের কক্সবাজার ব্যবধান বিস্তর। শান্ত সমাহিত সমুদ্র সৈকত আজ এক কর্মমুখর জনপদ। আগের প্যাগোডা টাইপের বাড়ির পাশে গড়ে উঠেছে অনেক সুরম্য অট্টালিকা। আর নানা ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত রয়েছে ১৪ লাখ লোক অধ্যুষিত কক্সবাজার জেলার বহু অধিবাসী। প্রকৃতির লীলাভূমিতে যাদের জন্ম তারা প্রকৃতি থেকেই আহরণ করে তাদের জীবিকা। আদিম উপায়ে সমুদ্র থেকে মৎস্য শিকার, লবণ উৎপাদন ও পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহই ছিলো এখানকার জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। জীবিকার মৌলিক পরিবর্তন না হলেও এর পদ্ধতিগত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। মৎস্য শিকারের দাঁড়ের নৌকায় স্থান নিয়েছে যন্ত্রচালিত ট্রলার। আর সমুদ্রের পাড়ে গড়ে উঠেছে অনেক চিংড়ি উৎপাদনের ঘের। স্থানীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি চিংড়ি উৎপাদন ক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বিনিয়োগকারীরা। চিংড়ি বাজারজাতকরণ-এর দিক দিয়েও কক্সবাজার বেশ উন্নতি করেছে বলে জানালেন ব্যাংক কর্মকর্তারা। ব্যাংক-এর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের লেনদেন খুবই সন্তোষজনক, বললেন এক স্থানীয় ব্যাংক কর্মকর্তা। একজন সফল

চিংড়ি প্রকল্পের মালিক জানালেন, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকল্পগুলো চলছে ভালোভাবে। কিন্তু তিনি বললেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত একটি চিংড়ি প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে। চিকিৎসক নিজে রোগাক্রান্ত হলে কে তার চিকিৎসা করবে? তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এ প্রশ্ন উঠেছে। এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর হয়ত অমর্ত্য সেন, মাহবুবুর রহমান, রেহমান সোবহানদের জানা আছে। এ নিয়ে কথা বলা আমার মত লোকের বেয়াদবির সামিল।

বলছিলাম মিয়ানমারের বাংলাদেশের স্থল বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম দিনের কথা। সেদিন ছিলো ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫)। আকাশ মেঘলা। মোটেল 'উপল' থেকে বেরিয়ে ভোরে ঘুরে এলাম সমুদ্র সৈকত। একটু পরে রওনা দিতে হবে টেকনাফের উদ্দেশ্যে। এক কাপ চা আর বিস্কুট মুখে দিয়ে রওনা দিলাম ভোর সাতটায় টেকনাফের উদ্দেশ্যে। সাথে ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। চট্টগ্রাম থেকে আগত সাংবাদিকরা রয়েছেন অন্যান্য রেস্ট হাউজে। সকাল ন'টায় পৌছতে হবে গন্তব্য স্থল টেকনাফে। প্রোগ্রামে লেখা আছে এরপর আধঘন্টা লাগবে বার্মার সীমান্ত শহর মংডু'তে পৌছুতে। পাড়ি দিতে হবে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল নাফ নদী। এদিকে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। যেখানে বিপদ বেশি সাংবাদিকদের ভিড়ও বেশি সেখানে। কথা ছিলো মংডু'তে যাবে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও সাংবাদিক এবং বার্মা থেকেও টেকনাফে আসবে একই সংখ্যক কর্মকর্তা ও সাংবাদিক। দু'দেশের মন্ত্রীরাতো আছেনই। কিন্তু আমাদের এদিকে সাংবাদিকদের সংখ্যা হয়ে গেলো প্রায় ত্রিশজন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও টেকনাফের সাংবাদিকরা রেস্ট হাউজে উপস্থিত সকাল ন'টার মধ্যে। কক্সবাজার থেকে আমাদের টেকনাফ পৌছতে একটু দেরী হলো। পথে দেখলাম এক বিশালকায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তা জুড়ে। কোনমতে কাদার ওপর দিয়ে পাশ কাটিয়ে আমাদের গাড়ি পার হতে কিছুটা সময় ব্যয় হলো। ক্ষণিকে গড়ে ওঠা কর্দমাক্ত পথ বেশিক্ষণ চলমান যন্ত্রদানবের উপদ্রব সইতে পারলো না। টেকনাফ পৌছে খবর পেলাম রাস্তার হাল খুবই খারাপ। কে যেন বললো ঐ পথেই আমাদের খাবার আশার কথা কক্সবাজার থেকে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কার মুখ দেখে উঠেছি, মনে করার চেষ্টা করলাম। ঘুম ভাঙার পর প্রথমে যে আয়নায় নিজের মুখ দেখেছিলাম যে কথা একেবারেই মনে ছিলো না।

জেলা প্রশাসক ভালো মানুষ। আমাদের প্রাতরাশ সম্পর্কিত দুর্গতির কথা জানালে তিনি বললেন, আপনাদের জন্য তো ব্রেকফাস্ট সার্কিট হাউজে রেডী ছিল। স্থল বাণিজ্য বাস্তবায়ন কর্মসূচী সুচারুরূপে সমাধা করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর জন্য কক্সবাজার নতুন রেস্ট হাউজে

স্থাপিত করা হয়েছিলো কন্ট্রোল রুম। টেকনাফ পৌছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেষ্ট হাউজে বসে আমাদের চিন্তা কি করে সব সাংবাদিককে নিয়ে মংডু পৌছাবো। তাই ক্ষিদের কথাটা তেমন প্রাধান্য পাচ্ছে না। স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের করিতকর্মা সেক্রেটারি বাজার থেকে কিছু বিস্কুট আনিয়ে আপাতত আমাদের পেটের ক্ষিদে ও মনের উষ্মা দমনের সাহায্য করলেন।

মংডু'তে যেতে ইচ্ছুক সাংবাদিকদের সংখ্যা ত্রিশের মত শুনে এক কর্তাব্যক্তি বলে বসলেন, এতজন সাংবাদিক গেলেতো আর অন্যদের যাওয়ার জায়গা হবে না। কিন্তু তথ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রীদ্বয় সব সাংবাদিককে ওপারে নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা চান যে এ রকম একটি বিরল ঘটনা দেখুক আমাদের দেশের সাংবাদিকরা। ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার বা টেকনাফের সাংবাদিকদের মধ্যে নেই কোন ভেদাভেদ। তাদের লক্ষ্য সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রকাশ করা মানুষের কাছে। নৌবিহার তাদের লক্ষ্য নয়, ওটা উপলক্ষ। বৃষ্টি বাড়ছে, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিক বন্ধুরা একটা স্পীড বোটে উঠলেন। সারিবদ্ধ আরো বোট রয়েছে, একটার সঙ্গে একটা বাঁধা। প্রত্যেক বোটে রয়েছে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা চেয়ার সোফা। আর রয়েছে প্রত্যেকের জন্য লাইফ জ্যাকেট।

প্রত্যেক বোটের পেছনের দিকে রয়েছে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ত্রিপলের আচ্ছাদন। বৃষ্টি বাড়ছে আর দুলছে স্পীড বোট। এ রকম অবস্থায় একটি বোটে এত লোক নেয়া নিরাপদ নয় বিধায়, কিছু সাংবাদিক অন্য স্পীড বোটে উঠলেন। ঝড়ো বৃষ্টিতে সবাই ভিজে একশা।

যাত্রার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে ঘন্টা খানেক আগে। হঠাৎ দেখা গেলো দ্রুত ছুটে আসছে একটি স্পীড বোট। আমাদের বোটের কাছে এসে থামলেন সামরিক পোশাক পরা এক ইয়াং ক্যাপটেন। তিনি জানালেন, মংডু'তে বার্মার মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা বাংলাদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। এক সাথে ছুটছে দু'টি স্পীড বোটের বহর। এগুলোতে রয়েছে মন্ত্রী, সরকারি ও ব্যাংকের কর্মকর্তা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। এছাড়া সাংবাদিকরাতো আছেনই।

মংডু'তে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ফুলের তোড়া আর গান গেয়ে অভ্যর্থনা জানালো বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথিদের। ছোট শহর মংডু'র রাস্তায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে বহু রোহিংগা। এদের কেউ হয়ত কিছু দিন আগে আশ্রয় নিয়োছিলো টেকনাফ বা কক্সবাজারের কোন শরণার্থী শিবিরে।

মংডু'র এক সম্মেলন কক্ষে স্বল্পক্ষণ স্থায়ী অনুষ্ঠানের পর নদীর ঘাটে নির্মিত

বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথ মৎস্য প্রকল্প পরিদর্শনের পর মিয়ানমার-এর দু'জন মন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা ও সাংবাদিকসহ টেকনাফে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দু'দেশের মধ্যে স্থল বাণিজ্যের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। একই দিন কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুই পাশাপাশি রাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করে যে, সদিচ্ছা থাকলে পৃথিবীর কোন সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব নয়। কারণ সমস্যা যত আছে সমাধান আছে তার চেয়েও বেশি। তবে এক দার্শনিকের মতে 'এভরি সলিউশন হ্যাজ এ প্রব্লেম'-প্রত্যেক সমাধানের জন্য রয়েছে একটি সমস্যা। এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শান্তির সংজ্ঞা কি তার উত্তরে বলেছেন, শান্তি হলো দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়।

নাসিরউদ্দিন হোজ্জার এক গল্প বলে আজকের বয়ান শেষ করছি। সোরাই হাতে মেয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে ঝরণা থেকে পানি আনতে। কথা নেই বার্তা নেই মেয়ের গালে নাসিরউদ্দিন দিলেন কড়া এক চড় বসিয়ে। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক মুসাফির। নিরপরাধ মেয়েটিকে কেন মারলেন, জানতে চাইল মুসাফির। সোরাই যেন না ভাঙে তাই এ শাস্তি, বললেন নির্লিপ্ত হোজ্জা। সোরাই তো মেয়ে ভাঙেনি, তবু কেন এ শাস্তি? পুনরায় মুসাফিরের প্রশ্ন।

সোরাই ভাঙার পর শাস্তি দিয়ে কি লাভ, বললেন বিজ্ঞ নাসিরউদ্দিন। খাতকদের সাবধান যদি করতে হয় তবে আগে করাই ভালো।

পরিণতি বাগদাদের

স্থান: কুইন্স গেট। লন্ডন। ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়। আমার পড়শী কুয়েতী ভাইদের দুর্দিন। ইরাক তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে বিনা নোটিসে। কুয়েত দূতাবাস ও আমার বাসস্থান- এর মধ্যে রয়েছে শুধু একটা দেয়াল। বিশালকায় দামী গাড়ির সারি দেখা যেতো দূতাবাসের সামনে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত ট্যাক্স দিয়ে তবে নিজ বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার অনুমতি নেয়ার রেয়াজ আছে ওখানে। সেন্ট্রাল লন্ডনে গাড়ি পার্ক করার এটাই প্রচলিত নিয়ম। শহরের বাইরে বা বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স-এ এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ দূতাবাসে কুয়েতী দূতাবাস থেকে অভিযোগ এলো যে, বাংলাদেশের এক কর্মকর্তার গাড়ির কিয়দংশ নিজের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে কুয়েতী এলাকায় পা রেখেছে।

অভিযোগ কানে আসার সাথে সাথেই ছুটলাম অকুস্থলে। দূতাবাসের কাছেই আমার বাসা। অপরিপক্ব হাতে গাড়িকে নিজ এলাকায় এনে রাখলাম। কুয়েতী কয়েকজন বেরাদর আমার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। বিরাটকায় মার্সিডিস শেভরোলেট রোলস রয়সের কাছে একুশ শ' সিসির 'ভলবো' তো একটা শিশু। কোন আরব ভাই যদি মনে মনে বলে "ছি ছি এ রকম গাড়ি কোন কুটনৈতিক কি চড়ে", তাকে দোষ দেয়া যায় না। অথচ এমন দিন ছিলো যখন থাওয়ার অভাবে অনেক আরব বেরাদর পোকা পুড়িয়ে খেত। তা অবশ্য ওজাসতা দিনের কথা।

সুইডেনের তৈরী মজবুত 'ভলবো' নিয়ে গল্প আছে। কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী নিজ নিজ গাড়ির 'মেক' সম্পর্কে এক আড্ডায় আলাপ করছিলেন।

কেউ বলছে তার রয়েছে টয়োটা, কেউ বলছে তিনি ব্রিটিশ বেডফোর্ড-এর মালিক। কেউ রয়েছেন বিএমডব্লিউ-এর সম্ভ্রান্ত মালিক। এভাবে চলছে কথা। কোণায় বসা এক বন্ধু চুপ। অন্যেরা জিজ্ঞেস করলো, তোমারটা কি? 'বলবো', স্বল্পভাষীর উত্তর। মারসিডিসের মালিক একজন পুনরায় স্বল্পভাষীর গাড়ি কোনজাতের জানতে চেয়েও একই উত্তর পেলেন, 'বলবো'। সবার দৃষ্টি এই চাপা স্বভাবের লোকটির দিকে- তিনি কেন তার গাড়ির জাত কি বলতে এত দ্বিধা করছেন। একজন শ্রেষ্ঠাসেবী স্বল্পভাষীর সাহায্যে এগিয়ে এসে জানালেন, ওর গাড়ি হলো 'ভলবো'। নিজের বাড়ির সামনে রাখা গাড়িটি চড়তে গিয়ে একদিন দেখি পেছনের কাঁচটি সম্পূর্ণ ভাঙা। পাশে পড়ে আছে কয়েকটি বিয়ারের খালি বোতল। সুসভ্য ইংরেজ তনয়দের এ কম বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইন্স্যুরেন্স করা গাড়ি বলে ২০০ পাউন্ড নিজের খরচ করতে হলো না পুনরায় কাঁচ লাগাতে। কুয়েতী ভাইদের কথা বলছিলাম। কুইন্স গেট এ নিরাপত্তার ব্যবস্থা খুব শক্ত। কারণ এ এলাকায় ইরাক বাংলাদেশসহ আরো কয়েকটি দূতাবাস রয়েছে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর ফটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাজ এ এলাকায় আরো বেড়ে গেলো। কুয়েতী দূতাবাস পরিণত হলো সুরক্ষিত দুর্গে। যুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লন্ডনে বসবাসরত কুয়েতীরা জড় হলো তাদের দূতাবাসের সামনে। সাদ্দামের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু শ্লোগান উঠলো সুবেশধারী কুয়েতী নর-নারীদের কণ্ঠ থেকে। বিভিন্ন অভিজাত এলাকা থেকে শোফার চালিত গাড়ি করে এসেছে অনেকে। আবার কেউ নিজে গাড়ি নিয়ে হয়েছে হাজির। গাড়ির সংখ্যা ও হাজারানে মজলিসের সংখ্যা প্রায় সমান। শোফারকে সময়মত না পাওয়ার ফলে বহু কুয়েতী ভাই-বোন স্বদেশের এ দুর্দিনে ইরাকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দূতাবাসের সামনে হাজির হতে পারেনি। কুয়েত বেদখল হওয়ার পরদিন থেকে জমায়েত বড় হতে থাকলো ইরাকী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ফেস্টুন হাতে শ'দুয়েক কুয়েতী নিকটবর্তী ইরাকী দূতাবাসের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিলো। ব্রিটিশ পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রম করে ইরাকী দূতাবাসের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা কুয়েতীদের নেই। ইরাকীরা অধম বলে কুয়েতীরা উত্তম হবে না কেন। তাছাড়া জনে না হোক ধনে তো কুয়েতীরা ইরাকীদের চেয়ে অনেক বড়।

ইরাকী আগ্রাসনের মুখে কুয়েত থেকে আমির তাঁর সভাসদসহ দ্রুতগতিতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন পার্শ্ববর্তী সৌদি আরবে। এদিকে সুযোগ বুঝে বহু বেনিয়া ব্রিটেনের বাড়িওয়ালারা লন্ডনে কুয়েতী ভাড়াটিয়াদের সবিনয় অনুরোধ করলো তাদের বাড়ি খালি করে দিতে। অনেকে বললো, তার মেয়ের জামাই নাকি

বিদেশ থেকে শিগগির বিলেত ফিরবে। অথচ অনেক বাড়িওয়ালার মেয়েই নেই। বাড়ির প্রয়োজনের কথা ইরাকের আক্রমণের আগে কারো মনে আসেনি। তাছাড়া যে দেশে ১৮ বছরের পর ছেলেমেয়েরা যে যার আস্তানা খুঁজে নেয়, সে দেশে আত্মীয়ের জন্য নিজের একটা বাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য অবাস্তব যুক্তি খাড়া করা হিসেবী ইংরেজদের পক্ষেই সম্ভব। তা না হলে কি বেনিয়া ইংরেজ জাতি এত বিরাট এক সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারতো। খোদ কুয়েতও ছিলো ইংরেজদের তাঁবেদারীতে ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯৬১ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত।

কুয়েতের ১৮ লাখ ১৯ হাজার অধিবাসীদের অধিকাংশই কুয়েতী নাগরিক নন। বহু প্যালেস্টাইনীসহ রয়েছে অন্যান্য দেশের কর্মজীবী মানুষ, যাদের কোন ভোটাধিকার নেই কুয়েতে। ১৭৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আল-সাবাহ রাজবংশ, বলতে গেলে এক রকম নিরাপদেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো, বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যদিও কুয়েতের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত ব্রিটেনেই পালন করতো। ইরাক কিন্তু কুয়েতের ওপর তার অধিকার দাবি করে আসছিলো। ১৯৯১ আগস্টে ইরাকী বাহিনী কুয়েত দখল করে বিনা আয়াসে। এবং কুয়েতকে তার ১৯তম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা দেয়। তেল আবিষ্কারের পর কুয়েতের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ও তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। ইরাকী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লন্ডনে বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানকারী পুরুষ ও মহিলা সকলেই ছিলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এ দুঃসময়েও তারা ছিলো বেশভূষা সম্পর্কে সচেতন। মিছিল-এর কাছাকাছি গেলে পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ নাকে আসতো। কারো হাতে থাকতো মিনারেল ওয়াটারের বোতল। বেচারাদের খুবই কষ্ট গেছে। তবে কুয়েতের নির্বাসিত সরকার এ দুঃসময়ে বিদেশে অবস্থিত প্রত্যেক কুয়েতী নাগরিকের ভালো অংকের মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেয়। রাজ্য হারালেও কুয়েতীরা বিদেশ রক্ষিত তাদের ধনসম্পদ থেকে হয়নি বঞ্চিত। শুধু কাস্টম ডিউটি ছাড়া কুয়েতীদের কোন কর দিতে হয় না। তাছাড়া, কুয়েতী জনগণের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য 'ফ্রি' আর রয়েছে সোস্যাল সিকিউরিটি।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় এই কুয়েতই ছিলো ইরাকের খুব খয়ের খাঁ। এর জন্য কুয়েতী তেলবাহী জাহাজের ওপর হয়েছে ইরানের আসমানী হামলা। পরে পারস্যপসাগরে যাতায়াতকারী কুয়েতী ট্যাংকারগুলো মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের প্রহরায় চলাচল করে। রাজ্যহারা কুয়েতীদের চরম দুর্দিনে ওয়াশিংটনকেই আসতে হয় ত্রাণকর্তা হিসেবে।

সম্প্রতি এক ভেজাল বাধিয়ে বসেছে সাদ্দাম-এর প্রিয় জামাতা, যাকে তিনি শুধু কন্যাই দান করেননি, তাকে দিয়েছিলেন অসামান্য ক্ষমতা। সেই জামাতা এখন

শ্বশুর-কন্যাকে নিয়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন জর্দানে। অথচ এ জর্দান নিজের গর্দান বাজি রেখে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাককে সমর্থন দিয়েছিলো। কূটনীতির লীলাখেলা বোঝা দায়।

এসব সেদিনের ঘটনা। সবার জানা। এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক বড় বিপদে পড়েছিলেন লন্ডনে। কুয়েত তখন ইরাকের দখলে। কি করে যেন জটলার মধ্য থেকে তিনি সুরক্ষিত কুয়েত দূতাবাসে ঢুকে পড়েন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাঘা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে দুর্ভাগা ঐ কুয়েতী দুর্গে ঢুকে ধরা পড়লো কুয়েত সিকিউরিটি গার্ডদের হাতে। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। আরবী ইংরেজি মিশিয়ে গার্ডরা জানতে চাইলো, বঙ্গ সন্তানের কুয়েতী দূতাবাসে ঢোকার কারণ। ভিসার জন্য এসেছি। জানালো বঙ্গ সন্তান এবং বললো তার ছোট ভাই কুয়েতে চাকরিরত। ভাই-এর চিন্তায় দিশাহারা হয়ে ছুটে এসেছে। বড় ভাই বার্মিংহামে থাকে। কুয়েতী প্রহরী ও কূটনৈতিকদের চোখ চড়কগাছ। এ পাগল বলে কি। আমাদের দেশ অন্যের দখলে। আমরাই নির্বাসিত। তোমাকে ভিসা দেবো কি করে? কোরাসে বলে উঠলো কুয়েতী ভাইরা। অনেক জেরা করার পর আর বেশি হুজ্জত না করে ছেড়ে দিলো নিরপরাধ বঙ্গ সন্তানকে।

আমার বিপদ হয়েছে কুয়েত দখলের প্রথম দিনই। দূতাবাসে ইরাকী ভূমিকা নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শেষে অফিস শেষ হওয়ার বেশ কিছু পরে ফিরছিলাম কুয়েত দূতাবাস সংলগ্ন নিজ আস্তানায়। যমদূতের মত ওঁৎ পেতে রয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কামেল কয়েকজন অফিসার। একজন আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে শুধালো, (অবশ্যিই চোস্ত ইংরেজিতে) কোথায় যাওয়া হচ্ছে? নিজ ফ্ল্যাট-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যথেষ্ট তাজিমের সাথে বললাম, যাচ্ছি নিজ ডেরায়। অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে অফিসার জানতে চাইলেন আমার কোন পরিচয় পত্র আছে কি? দূতাবাসের কাছেই বাসা বলে সব সময় পরিচয়পত্র কাছে রাখার প্রয়োজন মনে করি না। সব্বোনাশ। এখন কি হবে, প্রমাদ গুনলাম। সম্প্রতি কেনা নতুন একটা স্যুট পরা ছিলো। পুলিশ অফিসারটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, আমার দ্বারা ভয়ানক কোন কাজ সংগঠিত হওয়ার মোটেই আশংকা নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে স্মার্ট অফিসারটি তাকিয়ে আছে আমার নিরীহ চেহারার দিকে।

এরা অনেক নিরীহ দেখতে অথচ ভয়ংকর টেরোরিস্টদের নিয়ে কারবার করে। লোক চিনতে নাকি এদের ভুল হয় না। আইআরএ'র বাঘা বাঘা লোকদের ঘরে জেলে পুরেছে এ সব ইউনিফরম পরা সাহেবরা। গিলফোর্ড-এ একবার এ মারাত্মক বোমা হামলার অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ও বারো বছর জেল খাটা আইআরএ

সদস্য বলে কথিত চারজনের উচ্চ আদালত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, ব্রিটিশ আদালতও যে ভুল করতে পারে সে ধারণা নতুন করে হলো। পুলিশ অফিসারটির সাথে কথা বলতে বলতে হাত চলে গেলো নতুন স্যুটের ভেতরের পকেটে। হাতে শক্ত কি যেন ঠেকলো। বের করে দেখে ইউরেকা বলে চিৎকার দিতে ইচ্ছা হলো। এ যে আমার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে দেয়া পরিচয়পত্র। পুলিশ সাহেব পরিচয়পত্রটি নেড়ে চেড়ে দেখলেন। ভুয়া নয় এটা। তির্যক দৃষ্টি হেনে নিরাপত্তা সচেতন অফিসার একটু অনুযোগের স্বরে বলল পরিচয়পত্রটি আগে দেখাইনি কেন। আরে বাবা আমি নিজেও কি জানতাম ওটা যে আজ আমার কাছে থাকবে। এরপর আর ভুল করিনি। সব সময় ওটাকে জীবনসঙ্গী করে নিলাম।

১৯৯১ সালের ২২ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে স্যুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছি, কাল ভোর বেলায় আমেরিকায় যাচ্ছি, কূটনৈতিক জীবনের ইনিংস শেষ করে। উদ্দেশ্য, দেশে ফেরার আগে দু'ছেলের সাথে দেখা করা। বড়জন পড়া শেষ করে সদ্য চাকরিতে যোগ দিয়েছে। অন্যজন পড়ছে।

পত্রপত্রিকায় শুধু ইরাকী আগ্রাসন-এর খবর। সর্বত্র একই আলোচনা। ইরাক কুয়েত ছেড়ে যাওয়ার জন্য দাবি উঠেছে বিশ্বসভায়। এর নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। বিশ্ববাসীর হুমকি উপেক্ষা করে ইরাক তার অবস্থানে দৃঢ় হয়ে বসলো।

২২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা হবে। আমি তখনো ব্যস্ত নিজ রুমে স্যুটকেস নিয়ে। রাজনীতি সচেতন ছোট ছেলে বাসার উল্টো দিকে অবস্থিত ইম্পেরিয়াল কলেজে পড়ে। হঠাৎ সে চিৎকার দিয়ে বললো, আব্বা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা ইরাকে বিমান আক্রমণ শুরু করেছে। আপনার বোধ হয় আমেরিকা যাওয়া হবে না আগামীকাল।

আমার ভুল ধারণা থেকে দূতাবাসের মিনিস্টার এডুকেশন্স ডঃ আতাউর রহমানের সাথে বাজি ধরেছিলাম এ বলে যে, যুদ্ধ ছাড়াই সমস্যার সমাধান হবে। বাজিতে হেরে গেলাম। বাজির দান বড় ছিলো না। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থমূল্যে যা ছিলো ৪২০ টাকা। বা দশ পাউন্ড। ফোন করে ডঃ আতাউর রহমানকে জানালাম, আমেরিকা থেকে ফিরে বাজির টাকা দেবো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ আতাউর রহমান তখন এত রাতে গভীর মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের খবর শুনছিলেন টিভিতে। তাঁর স্বর বিমর্ষ শোনালো। বললাম, আমি হেরে গেছি। কিন্তু ডঃ আতাউর রহমান বললেন এ যুদ্ধে হার হবে মুসলিম বিশ্বের। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ইরাককে চলে যেতে হলো কুয়েত ছেড়ে। সাদ্দামের অবিমৃশ্যকারী ভূমিকার খেসারত দিতে হচ্ছে নিরপরাধ ইরাকী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে।

টিভির পর্দায় রিমোট কন্ট্রোল-এর যুতাম টিপে দেখলাম, গ্যাটউইক বিমান বন্দর থেকে আগামীকাল ভোর বেলায় সময়মত ইউনাইটেড এয়ার-এর বিমান যথাসময়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবে। মনে তবুও সন্দেহ, এতবড় যুদ্ধ শুরুর পর বিমান চলাচলে কিছু বিঘ্নতো হতেই পারে। টিভির পর্দার সময়সূচী আগেই প্রোগ্রাম করা থাকে অতএব আগের প্রোগ্রামই টিভির পর্দায় দেখা গেছে।

তাই গ্যাটউইকে ফোন করে জানলাম বিমানের সময়সূচী অপরিবর্তিত রয়েছে। কালো চামড়ার লোক হওয়ায় আমার মতো অনেককেই কঠিনভাবে যাচাই-এর পর বিমানে চড়ার অনুমতি দেয়া হয়। ককপিট থেকে ঘোষণা করা হলো, কারো কাছে রেডিও থাকলে তা যেন বিমান কর্মীদের হেফাজতে দেয়া হয়। ককপিট যাত্রাশেষে যে যার বেতার যন্ত্র ফেরত পাবে। ভাবলাম এ কেমন কথা। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারক বাহক আমেরিকা, আর সে দেশের বিমানে বসে পৃথিবীর খবরাখবর শুনতে পাবো না। লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় খবর প্রচারে বিধিনিষেধের-সমালোচনা করে শক্ত কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ইরাক আবার কুয়েত আক্রমণ করতে পারে। সম্প্রতি এ আশংকা প্রকাশ করেছে কুয়েতী প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। বক্সিং রিং-এর পাশে বসে এক লোক উপস্থিত সব কুস্তিগীরকে শিশু বলে তাচ্ছিল্য ভরে বললো, এদের কেউ তার সাথে এক রাউন্ডও টিকতে পারবে না। গোঁয়ার এক কুস্তিগীর পাশে ছিলো, সে বললো যা থাকে কপালে, হয়ে যাক এক রাউন্ড। দাম্ভিক ব্যক্তিটি রিং-এ এলো, বললো, চ্যালেঞ্জতো করলো বাছা, কিন্তু সাবধান, পরিণতি কিন্তু বাগদাদের মতো হতে পারে। উপস্থিত দর্শকরা চুকলেন, বাগদান নিশ্চয়ই কয়েকজন কুস্তিগীরকে পরপারে পাঠিয়েছে এই লোকটি। অপরিণামদর্শী গোঁয়ার কুস্তিগীরের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তার এক শুভানুধ্যায়ী বড় মুখ ব্যক্তিটিকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাগদাদে কি হয়েছিলো? কিছুক্ষণ চুপ থেকে চারদিকে দৃষ্টি হেনে লোকটির আবেদন, একটু সরুন আপনারা। দর্শকরা একদিকে সরে গেলো। আর আত্মপ্রত্যয়ী লোকটি ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে বললো, এভাবে দিয়েছিলাম এক দৌড়। দৌড়ে বেশি দূর যেতে পারেনি দাম্ভিক লোকটি। বক্সিং-এর দর্শকরাও ঘুষাঘুষিতে কম পারদর্শী নয়। তা তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ করে দিলো।

রাজ্যহারার রাজনীতি

প্রত্নতাত্ত্বিকদের এক বিশ্ব সম্মেলনে নবআবিষ্কৃত একটি কঙ্কালের বয়স নির্ধারণ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হয়েছে দু'দিন যাবৎ। কিন্তু কোন ঐকমত্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না এ নিয়ে। এমন সময় কেজিবি'র এক কর্মকর্তা এগিয়ে এলেন এর সমাধানে। সোভিয়েট সিক্রেট সার্ভিসের দোর্দন্ড প্রতাপশালী অফিসার জানালেন, এ কঙ্কালের বয়স পাঁচ হাজার তিনশ' একুশ বছর। বিস্ময়ে বিমূঢ় বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানতে চাইলেন, কি করে এত সঠিকভাবে কঙ্কালের বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হলো। সঠিক বয়স জানা গেছে কঙ্কালের নিজের কনফেশন থেকে- নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন সোভিয়েট সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

অধুনালুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে এ ধরনের বহু গল্প চালু ছিলো এই সেদিন পর্যন্ত। সোভিয়েট ইউনিয়ন দেখার সুযোগ হয়নি আমার। ছাত্রজীবনে আমাদের স্বপ্ন রাজ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের এয়ার লাইন্সের বিমানে করে লন্ডন-ঢাকা-লন্ডন ভ্রমণের সুবাদে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে মস্কো শহর গাইডেড ট্যুরের মাধ্যমে দেখার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিলো। ঢাকার পথে যাত্রা বিরতির সময় মস্কো বিমান বন্দরে গভীর রাত্রের কিছু চিত্র এখনও মনে পড়ে।

আলো ঝলমল হিথরো বিমান বন্দরের তুলনায় মস্কো বিমান বন্দরকে মনে হয়েছে নিষ্প্রভ। উড়ন্ত এরোফ্লাট বিমানে যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত আকাশসুন্দরীদের লক্ষ্য তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন। যাত্রীদের অতিরিক্ত সৌজন্য দেখানো সম্ভবত ওদের সার্ভিস ম্যানুয়েলে উল্লেখ করা হয়নি। নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তির বিধান রয়েছে, কিন্তু কাজ সম্পাদনে বিশেষ অবদানের জন্য কোন বিশেষ পুরস্কারের রেয়াজ নেই। মুড়ি, মুড়কির এক দাম।

ইনসেনটিভ নেই বলে দায়সারা গোছের কাজ করে সকলে পেতো সমান সম্মানী। কঠোর আইন দিয়ে শাসন করা যায়, নির্দিষ্ট কাজও আদায় করা সম্ভব, কিন্তু ওটা দিয়ে এর বেশি কিছু হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন কৃষ্ণ সাগরের তীর দিয়ে একই কারে যাচ্ছিলেন। পথে এক বিশালাকায় ষাঁড় রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। চার্চিল গাড়ি থেকে নেমে ষাঁড়টিকে সরাবার চেষ্টায় তার কূটনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে ব্যর্থ হলেন। রুজভেল্ট আমেরিকার শক্তির ভয় দেখিয়েও ষাঁড়টিকে স্থানচ্যুত করতে না পেরে স্ট্যালিনের শরণাপন্ন হলেন। স্ট্যালিন নেমে গিয়ে ষাঁড়ের কানে কানে কি যেন বললেন আর অমনি ষাঁড়টি দিলো এক ভোঁ দৌড়। কি এমন কথা স্ট্যালিন বললেন যার ফলে ষাঁড়টি দৌড়ে পালাতে বাধ্য হলো, তা জানতে চাইলেন দুই পরাক্রমশালী বিশ্বনেতা। না, তেমন কিছু না, বললেন স্ট্যালিন। পথ না ছাড়লে ওকে পাঠানো হবে যৌথ খামারে শুধু এটাই বলেছি, জানালেন জাঁদরেল সোভিয়েট নেতা, যাকে পরে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অত্যাচারী এক ডিক্টেটর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জন্ম নিয়েছে বহুজাতি রাষ্ট্রের। সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরসূরি রাশিয়া রাজ্য হারিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি হারাতে নারাজ। আধিপত্য ও প্রভাব বলয় বিস্তারে রাশিয়ার নতুন নেতৃত্ব মুসলিম অধ্যুষিত চেচনিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্যদিকে অবৈধ খৃষ্টান সার্বদের সর্বপ্রকার সাহায্য যোগাচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে। বর্তমান রাশিয়ার অবস্থা বড়ই ছারাভেরা। মস্কোসহ রাশিয়ার বড় বড় শহর মাফিয়াদের পদভারে প্রকম্পিত। সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সারাদেশ ভরে গেছে। মাফিয়াদের প্রটেকশনমানি না দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুরূহ। রাশিয়ান সন্ত্রাসীরা দেশের গন্ডি ছড়িয়ে ইউরোপ আমেরিকায় ঢুকে পড়ে তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। রাশিয়ান ললনারা শুধু দেশের ভেতরেই অতিথিদের আপ্যায়ন করছে না, তারা বিদেশে গিয়েও টু পাইস কামাই করছে। সুদূর মিসরে সোভিয়েট ললনারা ঐতিহ্যবাহী বেলী ড্যান্সারদের ব্যবসাতে ভাগ বসাতে শুরু করেছে। এতে আরব ললনারা ক্ষুব্ধ। পূর্ব জার্মান সুন্দরীদের বিরুদ্ধে একই রকম মনোভাব প্রকাশ করে পশ্চিম জার্মানিসহ ইউরোপের কতিপয় দেশের দেহপসারিণীরা বলেছে, ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট কান্ট্রির মেয়েরা প্রাইস কাট করে বাজারে এক অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

পর্নোগ্রাফিক পত্রিকাগুলো রাশিয়ায় রমরমা ব্যবসা করছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার বদৌলতে পশ্চিমা জগৎ বিশেষ

করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক অবক্ষয়ের খবরাখবর পড়ে শিউরে উঠতাম। কে জানতো একই চিত্র দেখতে পাবো পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের অবলুপ্তির সাথে সাথে।

রাশিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে আইএমএফ থেকে বেশ পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আইএমএফ-এর সময়সূচী অনুযায়ী ধার পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নতুন করে সাহায্য পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এর জন্য এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত রাশিয়াকে আইএমএফ-এর ধমক হজম করতে হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের রাশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা শিল্প স্থাপন করার জন্য দুর্নীতিবাজ বুরোক্রাটদের খুশি করতে হয়। তাছাড়া রয়েছে এসব সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা। রাশিয়ার বর্তমান অস্থির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কথা বলতে গিয়ে রাশিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ জুডি শেলটন মন্তব্য করেছেন, পুঁজিবাদ-এর সুফল সম্পর্কে রাশিয়ার মোহমুক্তির ফলে, আবারও দেশে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। আর তারই ফলে ঝিরিনোভস্কি'র মতো আলট্রা রাইটিস্টের আবির্ভাব ঘটেছে। জুডি মনে করেন, সামান্য যা কিছু প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে, সেগুলোকে আবার রাষ্ট্রীয়করণ করা হতে পারে।

আসল কথা হলো, রাশিয়া এখন এক রকম টলটলায়মান অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

স্বদেশে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের আন্ডারহ্যান্ড ডিলিং-এর ফলে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন কর্তৃক চেচনিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আরোপিত ব্লকেও কার্যকর সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক বহু কর্মকর্তা চেচেনদের ওপর চরম দমননীতির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

বিলুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে আমেরিকার সর্বশেষ রাষ্ট্রদূত জ্যাক ম্যাটলক মনে করেন, ইয়েলৎসিন দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারলে চেচনিয়া সমস্যার উত্তরণ ঘটতে পারে। তা না হলে রাশিয়ায় নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটবে। ম্যাটলক বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট যিনিই হোন না কেন তাকে গণতন্ত্রের পথে থাকতে হবে এবং একনায়কত্বের পথ পরিহার করতে হবে।

কমিউনিজমের মৃত্যু ঘটেছে বলে রাশিয়ানদের দুঃখ নেই, কিন্তু রাজ্য হারাবার যাতনা তারা ভুলতে পারে না, বলেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত রুশ বিশারদ রিচার্ড পাইপস। এমনকি রাশিয়ানদের স্বার্থ রক্ষার দোহাই দিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রসমূহে ইয়েলৎসিন রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ইতিমধ্যেই সে আলামত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। প্রফেসর পাইপস রাশিয়ার বর্তমান আচরণকে হিটলারের ১৯৩৪ সালের আচরণের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেন। জার্মান ভাষীদের স্বার্থ রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন ল্যান্ড দখল করে নেন। আধিপত্য বিস্তারের দিকে রাশিয়ার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে বলে প্রফেসর পাইপস-এর বিশ্বাস। পশ্চিমা অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, বর্তমান রাশিয়ার বেশির ভাগ লোকের মনোভাব ১৯৩৪ সালে জার্মানদের মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়। বিশাল সোভিয়েট সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ও রাশিয়ার চরম অর্থনৈতিক মন্দাভাব এর জন্য দায়ী। তারা হিটলারের মতো উগ্র কোন জাতীয়তাবাদী নেতার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। তবে রাশিয়াও অতীতের জার্মানীর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে সমরসজ্জার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন। আর বর্তমান রাশিয়ার অস্ত্রাগারে এখনো মজুত রয়েছে ২৫ হাজার থেকে ৪৫ হাজার আণবিক অস্ত্র।

যাক, অনেক তথ্যের কচকচানি হলো, শেষ করছি, রাগ করবেন না যেন। শুনুন সে হতভাগার কথা, যে অল্পমূল্যে সমুদ্র বিহারে যাওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে গিয়েছিল ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে। একশ' ডলারে এমন সুযোগ পাওয়া স্বপ্নের ব্যাপার। ট্রাভেল এজেন্ট ডলারগুলো বুঝে নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির মাথায় মারলো হকি স্টিকের এক বাড়ি এবং তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে দিলো পাশের নদীতে। ইতোমধ্যে আর একজন খদ্দের এসে ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে একই রকম ট্রিটমেন্ট পায়। আধ ঘন্টা পর দু'জন ভাসছে নদীতে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, সমুদ্র ভ্রমণে কি খাবার দেবে। দ্বিতীয় জনের উত্তর, গত বছর তো দেয়নি। সস্তা বলে আমি কিন্তু এরোফ্লোটে একবারেই ভ্রমণ করেছি।

পুওর কাজিন

পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রখ্যাত আইনজীবী লন্ডনের কেনসিংটন হাই স্ট্রীট-এ অবস্থিত পোস্ট অফিসে ছুটতে ছুটতে এসেছেন আধ মাইল দূরের টিউব স্টেশন থেকে। সেদিন ছিল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। রাত্রের বেলায় ফোন ও টেলিগ্রামের চার্জ দিনের চেয়ে কম। কাউন্টারে বসা ইংরেজ সাহেব আইনজীবীকে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যান আই হেল্প ইউ? অবশ্যই তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার, আইনজীবীর তড়িঘড়ি উত্তর। বলে তিনি নাতিদীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম ঢাকায় পাঠাবার জন্য দিলেন, আর সঙ্গে বাড়িয়ে ধরলেন টেলিগ্রামের চার্জ বাবদ কয়েকটি বিলাতী মুদ্রা। ইংরেজ সাহেব বললেন, স্যার, ইউ উইল হ্যাভ টু পে মোর মানি। তার ধারণা, এ বিদেশী ভদ্রলোক হয়ত বিলেতের নিয়মকানুন জানেন না, তাই সঠিক চার্জ দিতে ভুল করেছেন। এ বলে সাহেব টেলিগ্রামের নির্ধারিত চার্জ উল্লেখ করলে পর আইনজীবীর উত্তর- দেয়ার ইজ সোলার ইক্লিপস নাও, দেয়ারফোর ইট ইজ ডার্ক অ্যাজ ওড অ্যাজ নাইট। অবুঝ ইংরেজ সন্তানকে জ্ঞানদান করতে গিয়ে তিনি জানালেন, যেহেতু তিনি একজন দক্ষ আইনজীবী, অতএব জেনেশুনেই তিনি টেলিগ্রামের জন্য রাত্রের নির্ধারিত মূল্যই দিয়েছেন।

উকিলরা সব জেনে জেতেন না। ইংরেজ নন্দন-এর কাছ থেকে টেলিগ্রামের কপিটি নিয়ে পকেটে পুরলেন স্বদেশে মিতব্যয়ী বলে পরিচিত আইনজীবী। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তিনি চললেন মাইল-খানেক দূরে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনে। হাই কমিশনার তার পূর্বপরিচিত। পথে যেতে দেখলেন মার্ক স্পেনসারে 'সেলে' কাপড়-চোপড় বিক্রি হচ্ছে। ঢুকে পড়লেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। তন্নতন্ন করে দেখেশুনে সবচে' কমদামী একটা প্যান্ট কিনে ভাবলেন, তিনি ঠকলেন

কিনা। দেশে দর্জি দিয়ে বানালে দাম এর চেয়ে হয়ত একটু বেশি হতো। তবে বিলাতের জিনিসের একটা কৌলীন্য তো আছে, এ বলে প্রবোধ দিলেন মনকে।

পাকিস্তান হাইকমিশনার পূর্বপরিচিত বন্ধু আইনজীবীকে বেশ তাজিমের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর আইনজীবীর মনে পড়ল, দেশে তাকে একটা ফোন করতে হবে। যেন খুব তাড়া আছে তাব দেখিয়ে বললেন, উঠতে হবে এখনই। আরে ছাহাব খিয়ালে ফোন কর লিজিয়ে। তাকাল্লুফ মাত করিয়ে, শরীফ হাইকমিশনার ফোনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আওর চলিয়ে এক সাথ লাঞ্চ করনে কি লিয়ে। বাঁচা গেল, আইনজীবী হিসাব করে দেখলেন, ও বেটা ইংরেজ তাকে কম মূল্যে অন্ধকারের সময় টেলিগ্রাম করতে দিল না, কিন্তু আলটিমেটলি তিনি ঠকেননি। টেলিগ্রামের কাজ ফোনে সেরে নিয়েছেন। আর দুপুরে খেতে হলেও তো কম করে দু'পাউন্ড খরচ হত নিজের পকেটের।

এই সেদিন হয়ে গেল বর্তমান শতাব্দীর শেষ পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। সারাদেশ মেতে উঠেছিল এ গ্রহণ দেখার জন্য। কিন্তু ঐদিন সূর্যগ্রহণের সময় কোন বঙ্গসন্তান স্বল্পমূল্যে দেশে বা বিদেশে টেলিগ্রাম করতে ছুটেছিলেন কিনা, আমরা জানি না। এবারের সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর আর একটি বড় ঘটনা ঘটে গেছে। ঐদিন ছিল বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মিলনমেলার সমাপ্তি দিবস। নিউ ইয়র্কে ইস্ট রিভারের তীরে জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্বসংস্থার নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়েছেন ঐ সংস্থা প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পালন উপলক্ষে।

চব্বিশে অক্টোবরের সূর্যগ্রহণ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সর্ববৃহৎ মিলনমেলার উপর কি বিরূপ প্রভাব ফেলবে? এ প্রশ্ন উঠছে এ ধরিত্রীর চারদিক থেকে। একদিকে ধনী অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে প্রাচুর্যের সঙ্গে নৈতিক অবক্ষয়, অন্যদিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত মানুষের আহাজারি আর আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিধর দেশসমূহের তুলনামূলকভাবে ছোট দেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা শংকিত করে তুলছে বিবেকবান মানুষদের। জাতিসংঘ কি পেরেছে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে? এ নিয়ে তর্কবিতর্ক নতুন নয়। পঞ্চাশ বছর আগে ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে যে সংস্থার জন্ম, কলেবরে বেড়ে সে প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৮৫-তে। বিপুল সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

যুদ্ধের লেলিহান শিখায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতা, নতুন কৃষ্টি। সবচে' বড় কথা, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর অধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে জন্ম নিয়েছে বহু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নতুন রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু দারিদ্র্যের শৃংখলমুক্ত হতে পারেনি ওসব দেশের অগণিত নির্যাতিত,

অবহেলিত আদমসন্তান। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ রাজনৈতিক আধিপত্য হারিয়েছে সত্য, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ করে নিয়েছে তারা অর্থনৈতিক ক্ষমতাবলে। তাই বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। শুভ দিনের প্রতীক্ষায় ওরা স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের সোনার হরিণ কখনও কি ধরা দেবে তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত নিগৃহীত মানুষের কাছে?

এ সেদিন ঢাকায় এক সেমিনারে দেখা হল জনাতিনেক বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তার সঙ্গে। তাঁরা এসেছেন আমাদের এক বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপারে উপদেশ দিতে। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁরা পাঁচতারা হোটেলে থাকছেন। এদের একজন জানালেন, তিনি বিরোধীদলের প্রস্তাবিত সপ্তাহব্যাপী হরতালের সময় মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ ঘুরে আসবেন। প্রায়ই তিনি আসেন এ দেশে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে। এদিকে ডবল বুট্রোস (বুট্রোস-বুট্রোস) ঘালি জাতিসংঘের ৫০তম বার্ষিকীর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, জাতিসংঘ তিন বিলিয়ন ডলার দেনার দায়ে ডুবে আছে। অথচ ঘালি সাহেব বসনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩৫,০০০ সৈন্য ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পেলেন মাত্র সাত হাজার সৈন্য। এইসব মুষ্টিমেয় সৈন্যদের দৈন্য অবস্থা বিশ্ববাসী দেখেছে দিনের পর দিন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র জাতিসংঘকে হেয় প্রতিপন্ন করে অবৈধ খৃস্টান সার্বদের মদদ যুগিয়েছে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সে খেলা এখনও চলছে। জাতিসংঘ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি, পারছে না। এর কারণ বুঝতে বিবেকবান মানুষদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

যাক, এসব কথা। বিশ্বযুদ্ধে পর্যুদস্ত দুই রাষ্ট্র জার্মানী ও জাপান নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার ব্যাপারে মুরুব্বীদের দোয়া নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এদিকে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতও চাইছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার ব্যাপারে সকল সদস্য রাষ্ট্রের মত আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এটা করতে হলে অবশ্য ইউএন চার্টার সংশোধন করতে হবে। আর এই চার্টার পরিবর্তনের জন্য চাই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি। বিশেষভাবে, পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ১৮৫ সদস্যদের মধ্যে ১৮৪টি সদস্য সম্মতি দেয়া সত্ত্বেও যদি একটি স্থায়ী সদস্য দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে চার্টার বদলানো যাবে না। এর ওপর শর্ত রয়েছে যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিজ নিজ সরকারকে এই সংশোধনী অনুমোদন করতে হবে। পি-৫-এর একজন সদস্যই জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ যে কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বানচাল করে দিতে যথেষ্ট। এ

রকম একটি সংশোধন চার্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রায় বছর দু'য়েক সময় লেগে যায়। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও জাতিসংঘে ভারতের প্রাক্তন প্রতিনিধি চিণ্ময় গারেখানের বিশ্বাস, নিরাপত্তা পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তবে কি ধরনের তা হবে এখন তা বলা যাচ্ছে না। স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়াবারও প্রস্তাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

চিণ্ময় গারেখান নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভায় ঘালি সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। আগের সেক্রেটারি জেনারেলরা নিজেরাই নিরাপত্তা পরিষদের সকল সভায় উপস্থিত থাকতেন। গারেখানের আসল পদ হল আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল। যদিও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা। জাতিসংঘের সকল বড় সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা পরিষদই নিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণের ব্যাপারে যে রকম ক্রিয়াকাণ্ড চলছে তাতে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে জি-৭-এর সকল সদস্য নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ দখল করে নেবে, ফলে ধনী সকল দেশ বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে (পি-৫-সহ) সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা পাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভয়ের কারণ এ রকম একটা সম্ভাবনা। জি-৭ ও পি-৫ তাহলে নিরাপত্তা পরিষদে বড় রাষ্ট্রসমূহের ক্লাবে পরিণত হবে বলে বুট্রোস ঘালির বিশেষ পরামর্শদাতা চিণ্ময় গারেখান মনে করেন।

বড়লোকের ক্লাবে পুওর কাজিনদের অবস্থা কেমন হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। এ রিচ ওয়ান মেম্বার ক্যান বি মেজরিটি। কারণ বড়র পিরিতি সকলের কাম্য। বড়কে কেউ নাখোশ করতে চায় না। তবে শুধু ধন-প্রতিপত্তি কোন মানুষকে বড় করে না। সুনীতি ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমেই ইতিহাসে কোন ব্যক্তি বা জাতি স্থান করে নিতে পারে।

ক্ষমতা মদমত্ত বহু পরাক্রমশালী ব্যক্তি ও জাতি সময়ের ক্রমবিবর্তনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা হল। শুরু করেছিলাম এক প্রখ্যাত আইনজীবীর জীবনের একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করছি তার জীবনের শেষ পরিণতির কথা বলে। নামকরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে বিত্তবান সেই আইনজীবীর জন্য ওষুধ জোটেনি। কারণ চেক সই করার মতো তখন তাঁর অবস্থা ছিল না। বায়তুল মোকাররমে ঐ আইনজীবীর জানাজায় তাঁর পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা হলো না। আমার মুখ খোলার আগেই মরহুমের উচ্চশিক্ষিত পুত্র সারা পৃথিবীর বিরক্তি ও ঘৃণা মুখে নিয়ে বললেন, তাঁর স্যান্ডেল জোড়া চুরি হয়ে গেছে। মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বক্তার পায়ের দিকে নজর

দিলাম। না, তার পা তো খালি নয়। একটু ছোট হলেও একজোড়া স্যান্ডেল সু পায়ের মধ্যে গলিয়ে নিয়েছেন তিনি। ঐ জুতা জোড়ার প্রকৃত মালিক হয়ত খালি পায়ে বাড়ি ফিরবেন।

জ্বীনের ফকির

ছোট জেলা শহর। সারা শহরে একটিই আলোচ্য বিষয় ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে। নিরানন্দ জীবনে এ রকম সরস বিষয় যখন পাওয়া যায় তখন রাস্তাঘাট, বাজার, দোকানপাটে একই বিষয় নিয়ে চলে নানা ধরনের আলোচনা বিশ্লেষণ। বিতর্কিত বিষয় হলে তো কথাই নেই।

আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগের কথা। শহর থেকে অদূরে এক গ্রামে সুন্দর এক গৃহবধূর ওপর জ্বীনের আছর হয়েছে। অনেক ঝাড়ফুঁক, আর তাবিজে কোন কাজ হচ্ছে না। এ সময় গ্রামে নাজেল হলেন কালো শুশ্রুমন্ডিত তাগড়া কামেল এক ফকির, তার বেশভূষাও বিচিত্র। হাতে স্থানে স্থানে তামা মোড়ানো বক্র এক 'আশা', যাকে আমরা বলি লাঠি। হুজুরের চোখ দু'টি রক্তজবার মত লাল। সাথে দু'জন সাগরেদ। সাগরেদদেরও চেহারা তেলতেলে। দু'জনের কাঁধে দু'দু'টা ঝোলা। ফকির কিছুক্ষণ পর পর 'হক মওলা' বলে হুংকার ছাড়েন। বিচিত্র দর্শক নবাগত অতিথিদের দেখতে ভিড় জমে গেছে। ফকিরের হুংকারে পাশে দাঁড়ানো ছোট ছেলে-মেয়েরা দূরে সটকে পড়লো, নিজেদের বুকে ফুঁ দিয়ে আবার ভিড়ের একটু দূরে অবস্থান নিলো। এ সব বড়দের আলাপ থেকে শোনা।

আমাদের জেলা সদর থেকে সাহেবের হাটের দূরত্ব মাইল চারেক হবে। ঐ সময় পুরনো সেই নোয়াখালী শহরে না ছিলো বিজলী বাতি না ছিলো রিকশা। মটর গাড়ির সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। রেনু মিয়া কন্ট্রাক্টরের গাড়ির আওয়াজ শুনলে আশপাশের বাড়ি থেকে বাচ্চারা ছুটে আসতো। ঐ গাড়ির হর্ন-এর চেয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজই পথচারীদের মাইল খানে দূর থেকে সতর্ক করে দিতে ছিলো যথেষ্ট। মেয়েদের মাইনর স্কুলের, যদ্দুর মনে পড়ে, একটা বাস ছিলো তো সেটা রাস্তায়

যত্নো না চলতো গাভেরকে বিশ্রাম নিতো তার চেয়ে অনেক বেশি। মেয়েদের হাই স্কুল-উমা গার্লস এর মেয়েরা (এর মধ্যে আমার নিজের বড় বোন, জ্যাঠাতো বোনরাও ছিলেন) স্কুলে যেতেন ঝেরঝেরে ঘোড়ার গাড়িতে করে। ইটের ক্ষতবিক্ষত রাস্তার ওপর দিয়ে চলা ঘোড়ার গাড়ির গতিবেগ আবদুল গফুর সওদাগরের হঁটার সাথে তাল রাখতে পারতো না।

যা বলছিলাম। ফকিরের সাগরেদরা বললো, হুজুরের বহু গুণের কথা। তবে বিশেষভাবে জানালো, হুজুরের অধীনে আছে একশ' জ্বীন। যার ফলে পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাধি নেই যা এই কামেল আদমী সারাতে পারেন না। ভূতে ধরা, জ্বীনে ধরা রোগীরা তো কোন ছার। আর যায় কোথায়। জ্বীনে ধরা মহিলার চিকিৎসার জন্য হুজুরের কাছে ধরনা দিলো লিকলিকে চেহারার লোকটি। এদ্দিন পর লোকটির নাম মনে আসছে না। সোনা মিয়া বা কেরামত আলী গোছের কিছু একটা হবে। বাজারে ছোট এক মুদি দোকানের মালিক ঐ দুর্বল লোকটি। অনেক কাকুতি মিনতির পর ফকির রাজি হলেন 'কেস'টি হাতে নিতে। তবে শর্ত, রাত দুপুরের পর শুরু হবে 'চিকিৎসা' এবং ওখানে বেশি লোক সমাগম হলে চলবে না। কারো হাতে টর্চ, ম্যাচ বা আলো জ্বালাবার মতো কিছু থাকবে না। আর রোগীকে যে ঘরে ঝাড়ফুঁক করা হবে সেখানে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। কৃষ্ণপক্ষের রাত। নির্ধারিত সময়ে দুই সাগরেদ নিয়ে উপস্থিত সর্বরোগ নিরাময়ে সিদ্ধহস্ত বিশালদেহী ফকির। সাগরেদদের একজন হুঁশিয়ার করে দিলেন, কেউ যেন কথা না বলে, শব্দ না করে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জ্বীন আসবে না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে একদল মানুষ। জ্বীন দিয়ে রোগ সারাবার গল্প অনেকে শুনেছে। কিন্তু স্বচক্ষে তা দেখার সুযোগ তারা পায়নি। গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত ছেলেও আছে উৎসুক গ্রামবাসীদের মধ্যে।

বিকট গোঁগোঁ আওয়াজ শুনলো লোকেরা। ঘরের পাশের গাছের একটা ডাল মট করে ভেঙে গেলো। এক সাগরেদের কণ্ঠে গায়েবী আওয়াজ শুনা গেলো, সবাই সাবধান, তিনি এসে গেছেন। সমাগত লোকদের গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। টিনের ঘরের চালে মানুষের পায়ের শব্দের মতো আওয়াজ পাওয়া গেলো। দোচালা টিনের ঘর হঠাৎ কেঁপে উঠলো। ঘরের ভেতর থেকে ফকিরের গর্জন শোনা গেলো। জ্বীনকে ধমক দিচ্ছে ফকির। অবিলম্বে এ বাড়ি ছাড়, তা না হলে তোকে নির্বংশ করবো। জ্বীনের বংশ বৃদ্ধি হয় কিনা সেই বয়সে ওসব প্রশ্ন মনে জাগেনি। যাদের কাছ থেকে এ ঘটনা শোনার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে তাদের মনেও নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু সকলের কান খাড়া- ঘরের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার দিকে। কিছুক্ষণ পর পর টিনের ঘর কেঁপে কেঁপে উঠছে। জ্বীনের আগমন এবং

তার কার্যক্রম যে শুরু হয়ে গেছে তাতে কারো সন্দেহ রইলো না। ঘরের ভেতর সেই তাগড়া ফকির আর সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী জ্বীনে ধরা রোগিনী। জ্বীন নাকি-সুরে কি যেন দুর্বোধ্য ভাষায় বললো। যাবি না? ফকিরের চিৎকার। তুই মহিলাকে ছেড়ে যাবি কিনা বল? ফকিরের প্রশ্ন। পুনরায় নাকি সুরে কি যেন বললো জ্বীন। জ্বীনের ভাষা বুঝে ফকির আর তার সাগরেদরা। এক সাগরেদের কণ্ঠই বাংলা কমেন্ট্রি দিয়ে যাচ্ছে দুর্বোধ্য ভাষা জনতার বোধগম্য করে। এক হাড়ি রসগোল্লা চাইছে জ্বীন, বললো সাগরেদ। ফকির চিৎকার দিয়ে বললো, রসগোল্লা পাবি না, তোরে যাইতে হইবে কাঁটা মুখে লইয়া।

হঠাৎ সোরগোল উঠলো দোচালা টিনের ঘরের পেছনে কাঁঠাল গাছের উপরে ধরা পড়ল ফকিরের এক সাগরেদ। শিক্ষিত যুবকরা ফকিরের বুজরুকি সম্পর্কে আগেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলো। তারা তক্কে-তক্কে ছিলো কি করে কি ঘটে দেখার জন্য। তাই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলো সেই সন্ধ্যার পর থেকে। সাগরেদকে উত্তম-মধ্যম দেয়ার পর সে কবুল করলো টিনের ঘর কাঁপানোর দুরূহ কাজটুকু তারই। পরে ফকির হুজুরকে ঘরের ভেতর থেকে যুবকরা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলো। জ্বীনে ধরা মহিলাটি তখন অজ্ঞান। তার কাপড়-চোপড় আলু-থালু। গায়ের ব্লাউজটি চটি বিছানো কম দামী চৌকির এক পাশে পড়ে আছে। মহিলাটির সাড়া শব্দ নেই। গ্রামের একমাত্র এলএমএফ ডাক্তার এলেন, এবং রোগিনীকে পরীক্ষা করে বললেন, ক্লোরফরম জাতীয় কোন কিছু দিয়ে মহিলাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। মহিলার ডাক্তারী পরীক্ষা হলে তিনি নিশ্চিত হয়ে আরো কিছু তথ্য উদঘাটন করতে পারতেন বলে জানালেন। যুবকরা ফকির ও তার দুই সাগরেদকে যে কম্বল ধোলাই দিলো, তা যে কোন সাধারণ মানুষের ভাগ্যে ঘটলে তার অক্কা পাওয়ার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। তখনো জনতার একাংশ জ্বীনের অস্তিত্বের প্রতি আস্থা রেখে, কার খালাতো ভাইয়ের সমন্দির ভাগনীর জ্বীনের আছর করে কিভাবে সারলো তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলো। কিন্তু আজ এভাবে হাতে নাতে জ্বীন বাবাজী ধরা পড়ায় অনেক বিশ্বাসী এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করে ঘটনাস্থল ছেড়ে কেটে পড়লো। আর ফকির দুই সাগরেদসহ নাকে খত দিয়ে বললো, এ পেশা আর করবে না। ভোর হওয়ার আগে গ্রাম ছেড়ে গেলো শরীরে প্রচুর ব্যথা বেদনা নিয়ে।

এর অনেক বছর পর লালবাগ থানায় ফোন করেছি খবরের সন্ধানে। ডিউটি অফিসার জানালেন তেমন বড় ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনা কিছু নেই। তবে আজিমপুর কলোনীর এক বাসায় প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে এক ফকিরকে কেন্দ্র করে। ওখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ওরা ফিরলে ওখানে কি ঘটেছে তা জানা যাবে। পুলিশ

অকুস্থল থেকে কখন ফিরবে কে জানে। অথচ খবরটি অন্য পত্রিকায় বেরুলে আগামীকাল আমাকে নিউজ মিস করার জন্য জবাবদিহি হতে হবে। তাছাড়া ব্যাপারটা জানার কৌতূহলও রয়েছে। রিকশা নিয়ে ছুটলাম কলোনীর নির্দিষ্ট ভবনে। ঘটনা ঘটেছে দোতলার এক ফ্ল্যাটে। ঐ ফ্ল্যাটের কর্ত্রী মাঝে- মাঝেই জ্বীনের আছরে ফ্লাট হয়ে পড়েন। ভদ্রমহিলা দেখতে শুনতে ভালো, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। ছাপোষা কৃপণ কেরানী স্বামী কোন এক লোকের পরামর্শানুযায়ী কামেল এক ফকির এনে চিকিৎসা করাবার পর মহিলা সুস্থ হলেন। ছ'বছর পর মহিলার প্রথম সন্তান হলো। এরপর মহিলা ঘন ঘন জ্বীনের আছরে আক্রান্ত হতে থাকলেন। আর ফকির সাহেবেরও এ ফ্ল্যাটে আগমন হতে থাকলো যখন তখন। ফকির চলে গেলে মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু বেচারা স্বামী ফকিরের এরূপ একান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আর সহ্য করতে পারছিলো না। অসুস্থ স্ত্রীর দাবি, 'ফকির সাহেব আমাদের বাসায় থাকবেন'। ফকিরও গররাজি নয়। বিপত্তি বাধালো কলেজে পড়া আশপাশের ফ্ল্যাটের ছেলেরা। জোয়ান ফকির সম্বন্ধে খবর দিলেন ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আজিমপুর বেড়াতে আসা এক লোক। কোথায় কার ঘর ফকির সাহেব তার কেরামতি দিয়ে ভেঙেছেন সেই বর্ণনা ঐ লোকের কাছে থেকে বিস্তারিত শোনার পর উপস্থিত লোকজন ফকির সাহেবকে 'প্রাথমিক চিকিৎসা'র পর বিধ্বস্ত অবস্থায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

ছোটকালে জেলা শহরে বেশ কয়জন ফকির-দরবেশ দেখার সুযোগ হয়েছিলো। প্রায় ছ'ফুট লম্বা এক ফকির, হাতিয়া না কোথায় বাড়ি, বিরাট লাঠি হাতে মাঝে-মধ্যে শহরে আসতেন। শহরের কুতুব বলে বিতর্কিত চরিত্রের ব্যক্তিদের আনাগোনা ছিলো ঐ ফকিরকে ঘিরে। একদিন স্কুলে যাচ্ছি। ক্লাশ সেভেনে পড়ি। পাশের বাড়ির এক মেয়ে, বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড়, সেও যাচ্ছিল তার স্কুলে। সম্ভবত পড়তো আমার এক ক্লাস উপরে। হঠাৎ দেখি ধোপদুরস্ত কাপড়পরা দীর্ঘদেহী সেই ফকির মেয়েটির দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাঁটছে। কথা নেই, বার্তা নেই, আমার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে ফকির বললো, কি খোকা, মালটি খুব খাসা না? আমিতো হতবাক। বলে কি এ বেটা। কয়েক হাত দূরে ছিটকে গেলাম। যা ইচ্ছে তাই বলে বকলাম ফকিরটিকে। বললাম ভন্ড, বদমাইশ, জোচ্চোর। লাঠি হাতে আমার পেছনে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে কি বুঝে আর এগোলো না ফকির বাবাজী। কাছেই আমার স্কুল-শহরের নামজাদা জেলা স্কুল। আমাকে সম্বোধন করে ফকির অভিশাপ বর্ষণ করলো— জেনে রাখ, ম্যাট্রিক পাস তুই কোনদিন করতে পারবি না।

আইএ পাস করার পর ফকির সাহেবের সাথে দেখা সোনাপুর এক আত্মীয়ের

চায়ের দোকানে। আমার সঙ্গে ছিলো বাল্যবন্ধু সলিমুল্লাহ। আমাকে দেখিয়ে সে হুজুরকে তাজিমের সঙ্গে বললো, একে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ও ম্যাট্রিক পাস করবে না কখনো। এখনতো ও আইএ পাস করে গেছে। ঢাকায় যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। মুদ্রিত নয়ন হুজুরের। চোখ খুলে একবার আমাদের দিকে চাইলেন। মৃদু হেসে বললেন, দেখ আমি দিল থেকে বদদোয়া করিনি। আবার চোখ বুজলেন। পুরনো শহর ভেঙে যাওয়ার পর তিনি নতুন জায়গায় তার স্থান করে নিয়েছেন। তবে তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, শহর নদী ভাঙা থেকে রক্ষা পাবে। সর্বগ্রাসী মেঘনা গিলে খেলো নোয়াখালী শহর। শহর রক্ষা না পেলেও ঐ ফকিরের বুজরকির তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না। তবে ভক্তের সংখ্যা তখনো রয়েছে আগের মত।

পাশের রাষ্ট্রের চরম প্রতাপশালী এক সাধুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির পর সেই দেশের এক পাইলট গ্রাউন্ডেড হলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেশ পাইলটকে এখন পরিবেশ নিয়ে তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ তিনি নাকি তার প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধেয় গুরুর বিরুদ্ধে চরম অবমাননাকর নারী ঘটিত অভিযোগ এনেছেন। গুরুজী তার সুন্দরী বিবাহিতা এক শিষ্যাকে নিজের কাছে চিরদিনের মতো রাখতে চেয়ে সেই মহিলার স্বামীকে প্রফেশনাল কিলার দিয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

সম্প্রতি আবার ওখানে দুধ নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি হয়েছে। গণেশ ঠাকুর মশাই দুগ্ধ পান করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। দুধের দাম নাকি দিল্লি ও অন্যান্য স্থানে প্রতি লিটার বিক্রি হয়েছে কয়েক শ' টাকা করে। লাখ লাখ বুভুক্ষু শিশুর মুখে যেখানে রীতিমত অন্ন জোটে না, সেখানে কয়েকদিন বয়ে গেলো দুধের নহর। এক আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকী এ খবরের শিরোনামে বলেছে দেবতা তৃষ্ণার্ত।

বুজুর্গ লোকদের কামকাজই আলাদা। দুই কামেল মওলানা একদিন পৃথক পৃথকভাবে এসে উঠলেন বর্ধিষ্ণু এক কৃষকের বাড়িতে। কৃষক তাজিমের সাথে দু'জনের খেদমত করতে শুরু করলো। দু'জনের মাথায় বিরাট পাগড়ি, গায়ে জরির কাজ করা জেব্বা, হাতে লাঠি। একজন গেলেন গোসল করতে। খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় জন তার পোটলা থেকে কাপড় বার করছেন। তিনি যাবেন পুকুরে প্রথমজন এলে পর। কি তিনি খেতে পছন্দ করেন, কৃষক জানতে চাইলো। আরে আমার 'বাত' পরে শুনবেন, বললেন দ্বিতীয় মওলানা। ঐ ছাগলকে কেন পাত্তা দিচ্ছেন, ওতো একটা ভন্ড। প্রথম জন সাফ-সুতরো হয়ে দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় জন গেলেন পুকুরে। কৃষক কিছু বলার আগেই প্রথম মওলানা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, ঐ গরুটাকে কেন জায়গা দিয়েছেন। ওতো একটা আস্ত ভন্ড।

দ্বিতীয় মওলানা গোসল শেষে ফিরলেন। দু'মওলানাই ক্ষুধার্ত। বহুদূর পথ হেঁটে এসেছেন। ঢাকনা দেয়া খাবার পরিবেশন করে কৃষকটি বললো, আমি লবণ নিয়ে আসি, আপনারা একটু বসুন। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। দু'মওলানাই একই সঙ্গে ঢাকনা তুলে চুপ হয়ে গেলেন, আর পরস্পরের মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য দুর্বাসার দৃষ্টি হানলেন। এক থালায় ছিলো ছাগলের খাদ্য   ছোলা, আর অন্যটাতে কুচি কুচি করে কাটা ঘাস।

বিলেতের ঢেউ

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকের কথা। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ডক্টরেট ডিগ্রি নেয়ার জন্য বিলেত যান টেলেন্টেড এক নবীন অধ্যাপক। বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত থাকার অপরাধে তার বিলেত যাওয়া প্রায় ভেস্তে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর বেচারা উচ্চ শিক্ষা নেয়ার জন্য পাক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পান। ইতোমধ্যে অধ্যাপকের জীবনে ঘটে যায় রোমাঞ্চকর এক ঘটনা। রাজনীতিতে তখন তিনি সক্রিয়। এক মফস্বল শহরে পুলিশের তাড়া খেয়ে তরুণ রাজনৈতিক কর্মী আশ্রয় নেন এক আইনজীবীর বাসায়। বেশ কয়েকদিন ওই বাসায় আত্মগোপন করে থাকতে হয় তাকে। ঐ সময়ের মধ্যে আইনজীবীর কন্যার সাথে হয় ছাত্রনেতার প্রণয়, যা পরে পরিণয়ে গড়ায়।

বিলেত যাওয়ার সময় নবীন অধ্যাপক তার নবপরিণীতার দেখাশুনার ভার দিয়ে যান তারই এক গুণমুগ্ধ ছাত্রের কাছে। একই রাজনীতিতে দীক্ষিত ছাত্রটি নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর উপদেশ পালন করেন। এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

বিলেত থেকে ফিরে এসে অধ্যাপক স্ত্রী ও ছাত্রটির ঘনিষ্ঠতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে নিজেই ওদের পথ থেকে সরে গেলেন। ওরা পরে বিয়ে করেছিল। প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রটি অধ্যাপকের স্ত্রীকে বিয়ে করে লোকচক্ষের আড়ালে চলে যান। মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় ছাত্রটি আমাদের 'হলে' এসে আমার মুগার চাদরটি ধার চাইলে অবাক হলাম। পরে জেনেছি অভিসারে যাওয়ার ও অধ্যাপকের স্ত্রীর আত্মীয়দের চোখ এড়াবার উদ্দেশ্যে আমার চাদরের প্রয়োজন হয়েছিল।

একই ধরনের একটি ঘটনা তার দু'যুগ আগে ঘটে যায় ব্রিটেনে যা সারা

পৃথিবীতে সৃষ্টি করে এক অভাবনীয় আলোড়ন। লন্ডন থেকে কিছুদিনের জন্য আমেরিকা যাওয়ার সময় মিসেস ডেডলি ওয়ার্ড তার প্রেমিকের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান সুন্দরী বান্ধবী মিসেস সিম্পসনের কাছে। আমেরিকা থেকে ফিরে মিসেস ওয়ার্ড দেখেন তার বান্ধবী খুব নিষ্ঠার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত মিসেস সিম্পসনের জন্য প্রেমিকপ্রবর অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তাবৎ পৃথিবীর মানুষের মানোরাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে রইলেন।

মিসেস ডেডলি ওয়ার্ডের সাথে এডোয়ার্ডের পরিচয় হয় আকস্মিকভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লন্ডনের উপর বিমান হামলার একরাত্রে এডোয়ার্ড বেলগ্রেড স্কোয়ারে এক অভিজাত বাড়িতে অনুষ্ঠিত পার্টিতে যোগ দেন। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল বেসমেন্টের স্বল্পালোকিত এক ঘরে। বিমান আক্রমণের সব সময়টা ঐ মহিলা পাশের আলাপী সুদর্শন যুবকটির সাথে খোলামেলা কথা বলে যান। যুবকটি মহিলাকে নিজের কথা বলতে গিয়ে শুধু জানালো সে থাকে লন্ডন ও উইন্ডসরে। অল ক্লিয়ার সিগনাল পাওয়ার পর পার্টি আবার জমে ওঠে। মিসেস ওয়ার্ড তখনই আবিষ্কার করেন কে ছিলেন ঐ যুবক। এরপরই তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। কিন্তু মিসেস সিম্পসনের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার পর অষ্টম এডোয়ার্ডের জীবনে আর কোন নারী স্থান পায়নি। সুদীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে মিসেস সিম্পসনই ছিলেন এডোয়ার্ডের একমাত্র সঙ্গী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে একবার নিজ দেশে ফেরার সুযোগ এসেছিল প্রেমিক-রাজার। জার্মানিরা ফরাসী দেশ দখল করার পর তিনি স্পেনে আশ্রয় নেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজপরিবার তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে রাজকীয় সম্মান দেখাবার গ্যারান্টি না দেয়ায় এডোয়ার্ড জীবিতাবস্থায় ফিরে যায়নি তার জন্মভূমিতে। এদিকে একই বংশের সন্তান রাজকুমার চার্লস সিংহাসনে আরোহণের বাসনা চরিতার্থ করতে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আর বিয়ে করবেন না। ডায়নার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চার্লসকে বলেছেন তার মা রাণী এলিজাবেথ। ডায়না টালবাহানা করছেন এ নিয়ে। অপরদিকে চার্লসের প্রেমিকা কামেলা পার্কার বলছেন তিনি বিয়ে করবেন চার্লসকে। কি যে ঝামেলা চার্লসের!

দাদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চার্লসের ইচ্ছা নেই। চার্লসের সাথে তাঁর চাচার একদিকে রয়েছে খুব মিল, যা হলো সমাজের নিচের তলার লোকদের কথা বলা ও ওদের জন্য কিছু করা। ব্যুরোক্রাটদের কিন্তু এটা না-পছন্দ। রাজপরিবারে বর্তমানে বিত্তশালীদের জীবনে বহু নারীর আগমন খুব একটা আয়েবের ব্যাপার নয়।

এডোয়ার্ডের বিরুদ্ধে উঁচু মহলে আর একটি অভিযোগ ছিল। তা হলো হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনীর ইতালির প্রতি তার দুর্বলতা।

প্রমাণ হিসেবে সরকারি অনুকম্পায় লিখিত বিবরণসমূহে বলা হয়েছে, অষ্টম এডোয়ার্ড ইথিওপিয়ার রাজা হাইলে সেলাসিকে সাক্ষাৎদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইতালি ইথিওপিয়া দখলের পর হাইলে সেলাসি ব্রিটেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার জার্মানি রাইন ল্যান্ড দখল করে নেয়ার পর রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড নাকি জার্মানির নিন্দা করতে চাননি। অবশ্য তাঁর মতামত উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকার জার্মানির তীব্র নিন্দা করে। রাজার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, মিসেস সিমসনের সাথে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবনট্রপের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা বলেন, মাত্র দু'বার রিবনট্রপের সাথে মিসেস সিম্পসনের দেখা হয়েছে, তাও ডিনার পার্টিতে।

ব্রিটেন যতটা রক্ষণশীল বলে নিজেদের জাহির করতে চায় ততটুকু রক্ষণশীল কি তারা? ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাস ঘাঁটলে ও সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে এর একটা চিত্র পাওয়া যায়।

রাণী এলিজাবেথ পড়েছেন বড্ড বিপাকে। তাঁর গুণধর পুত্র-কন্যারা যে কাণ্ড করছে তাতে ব্রিটেনবাসী রাজতন্ত্রের ওপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। চরমপন্থীরা জনগণের টাকায় এ ধরনের রাজতন্ত্র রাখার ঘোরতর বিরোধী। অন্য মত, দেশের ঐক্য সংহতির খাতিরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র রাখা উচিত। এ বিতর্ক এখন ব্রিটেনের ঘরে ঘরে। রাজরাজড়ার আচার-আচরণ সাধারণ, এমনকি অসাধারণ মানুষের জীবনে আছর করে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আজকাল আমাদের সমাজেও তেমন কোন গুনাহর কাজ বলে গণ্য হচ্ছে না। তবে এর আধিক্য সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, ভাঙা পরিবারগুলোর সন্তানরা হয় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এই সেদিন প্রৌঢ় এক বিদগ্ধ অধ্যাপক বাড়ি খোঁজ করে দিতে বললেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। অধ্যাপক নিজ বাড়িতেই থাকতেন। তবে বাড়িটি তাঁর তুলনামূলকভাবে কমবয়সী স্ত্রীর নামে। সুশ্রী স্ত্রী সুশিক্ষিতা এবং তারও পেশা অধ্যাপনা। অধ্যাপক সাহেব বন্ধুকে শুধু এটুকু জানালেন, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বিলেতের ঢেউ আমাদের সমাজে লাগবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জীবদ্দশায়

তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল সারা প্যারিস শহরে। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে ল্যুবার মিউজিয়াম থেকে 'মোনালিসা' নিখোঁজ। ১৯১১ সালের কথা। মিউজিয়ামে সকালের সিফটের কর্মচারীরা যথারীতি তাদের কাজে এসে দেখতে পেল সুরক্ষিত ঘরের দেয়ালে টাঙানো 'মোনালিসা' তার নির্ধারিত স্থানে নেই। জায়গাটি শূন্য। হতবাক কর্মচারীরা ঐ শূন্য স্থানের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপরই মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তা বিভাগে খবরটা জানিয়ে দেয়া হলো। লেলিহান শিখার মত খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির এ বিরল বিশ্বনন্দিত শিল্পকর্ম উদ্ধারের জন্যে বিভিন্ন সংস্থা হন্যে হয়ে ছুটলো দিকে দিকে।

এদিকে ল্যুবার মিউজিয়াম লোকে লোকারণ্য। সবাই এক নজর দেখতে চায় দেয়ালের সে শূন্য স্থান যেখানে 'মোনালিসা' তার মিষ্টি হাসি নিয়ে দর্শকদের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতো। হায় সে 'মোনালিসা' আজ আর তার জায়গায় নেই। কোন পাষণ্ড 'মোনালিসা'কে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় স্থান দেয়ার জন্যে সুদক্ষ তস্করদের দ্বারা চুরি করিয়ে নিয়ে গেছে। প্যারিসবাসী বা বিশ্বের কোন শিল্পরসিক এ অবস্থা মেনে নিতে পারে না। 'মোনালিসা'কে যে করেই হোক উদ্ধার করতেই হবে। নিরাপত্তা বিভাগের লোকদের যথেষ্ট গালমন্দ শুনতে হলো প্রেস, গুণী-জ্ঞানী মানুষের কাছ থেকে। সমালোচনা করা হলো 'মোনালিসা'র নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। 'মোনালিসা'র যথাযোগ্য যত্নআত্তি করা হয়নি। এদিকে ল্যুবার-এ লোকের ভিড় লেগেই আছে। উদ্দেশ্য 'মোনালিসা' যে দেয়ালে যে স্থানে টাঙানো ছিল সেদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা। 'মোনালিসা' দেয়ালে

থাকাকালীন যত লোক তাকে দেখতে আসতো এখন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লোক 'মোনালিসা'র শূন্য স্থান দেখতে আসে। গালমন্দ শুনলেও মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ 'মোনালিসা' বাবদ টু পাইস কামিয়ে নিল কিছুদিনের মধ্যে। যাহোক অবশেষে দু'বছর অনেক তল্লাসি, অনুসন্ধানের পর 'মোনালিসা'কে উদ্ধার করে তার স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো। 'মোনালিসা' সম্ভবত বিশ্বের সবচে' দামী শিল্পকর্ম। কয়েক বছর আগে জাহাজযোগে 'মোনালিসা' আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন মুল্লুকে যায়। 'মোনালিসা'র সুদীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার সময় যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছিল আজ পর্যন্ত কোন জীবিত ব্যক্তির জন্য এহেন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কিনা এ অধমের জানা নেই। তাছাড়া কয়েক কোটি টাকার বীমাও করা হয়েছিল এ 'ভদ্রমহিলা'র জন্যে। পথিমধ্যে যদি কোন অঘটন ঘটে যায় তার জন্য এ বীমা। এই সম্মান, এত মূল্য কোন মানুষ পেয়েছে বলে জানি না।

ধনকুবের দেশ আমেরিকায় 'মোনালিসা' খুব সমাদর পায়। পত্র-পত্রিকায় 'মোনালিসা'র জয় কীর্তন চলে কিছুদিন ধরে। 'মোনালিসা'র স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর মার্কিন বিত্তশালীদের এক জমজমাট পার্টিতে দু'ভদ্রমহিলার আলাপ: কেমন দেখলে 'মোনালিসা'কে?

: অদ্ভত সুন্দর মিস মোনালিসা। তার সাথে হ্যান্ডসেক করে ধন্য হলাম। মার্কিনীদের শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্যারিস শহরের এক এ্যান্টিকস সপে ঢুকে এক মার্কিন পর্যটক মানুষের ছোট একটা স্কাল হাতে নিয়ে জানতে চাইলো এ স্কালের তাৎপর্য। দোকানী বললো, এটা নেপোলিয়ানের স্কাল। মার্কিন পর্যটকের চোখ ছানাবড়া বলে কি জোচ্চোর দোকানী। গত বছর না আমি নেপোলিয়নের স্কাল কিনে নিয়ে গেলাম তোমার দোকান থেকে, পর্যটক বললো, এ্যান্টিকস শপ মালিককে। কথাটা মিথ্যে নয়, দোকানী জানালো, গত বছর যেটা নিয়েছেন সেটা ছিল নেপোলিয়নের পরিণত বয়সের স্কাল আর এটা হলো তার ছোটকালের। বিমুগ্ধ মার্কিন পর্যটক তার ভুল বুঝতে পারলো, পার্স খুলে বেশ দাম দিয়ে নেপোলিয়নের আর একটি মাথাও কিনে নিলো।

দ্যা ভিঞ্চি কি তার জীবদ্দশায় সে সম্মান পেয়েছে যা পেয়েছে তার সৃষ্ট শিল্পকর্ম? ইউরোপে রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেন। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ শিল্পীর জীবনই কেটেছে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে। জীবদ্দশায় যে সম্মান তারা পাননি তা পেয়েছেন মরণের পর। একটা সান্ত্বনা তবুও তো পেয়েছেন। রেনেসাঁর শিল্পীরা তাদের জীবন দিয়ে শিল্পীদের জন্যে যে মর্যাদার স্থান করে গেছেন, তা তাদের উত্তরসূরিরা আজ ভোগ করছেন। ভ্যাটিকান সিটির

গীর্জায় মাইকেলেঞ্জেলোর শিল্পকর্মে রয়েছে পরবর্তী শিল্পীদের উত্তরাধিকার।

আমাদের দেশের কথায় আসা যাক। দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে এক শিল্পী ঢাকায় এসে ড্রয়িং টিচার হিসেবে যোগ দিলেন এক সরকারি স্কুলে। কয়েকটি ছবি করে কলকাতায় ভদ্রলোক কিছুটা নাম করেছেন। তবে জাতে মুসলমান বিধায় কলকাতার সমাজে কল্কে পাননি তেমন। মুসলমানদের মধ্যেও শিল্পটিল্প নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া করার মত লোক ছিল না তখন। অতএব প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও শিল্পী নিজেকে সমাজের সামনে প্রকাশ করতে পারেননি, যেমনটি করা উচিত ছিল। তাছাড়া ভদ্রলোক আবার ছিলেন একটু মুখচোরা। তার উপর আঞ্চলিক ভাষায় দখল একটু বেশি থাকায় সম্ভ্রান্ত সমাজ সম্পর্কেও তার একটু ভয়ভীতি ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

যাহোক এহেন ভদ্রলোক স্বাধীন পাকিস্তানে পদার্পণ করে মনে একটু সাহস পেলেন। স্কুলের ড্রয়িং টিচার-এর পদ তাঁর মনে শান্তি বা স্বস্তি দিতে পারছে না। ভদ্রলোকের অনেক দিনের বাসনা স্বাধীন দেশে একটা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এ বাসনা মনে নিয়ে ভীরু পায়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন তদানীন্তন এক মন্ত্রীর বাড়িতে। অতি সাধারণ পাঞ্জাবী পায়জামা পরা ড্রয়িং টিচারটি প্রতীক্ষায় রয়েছেন মন্ত্রীর আগমনের।

অনেকক্ষণ পর মন্ত্রী মহোদয় উপরতলা থেকে নিচে হলঘরে নাজেল হয়ে ড্রয়িং টিচারের মনের কথা শুনলেন। মন্ত্রীর বাসা তখন লোকে গমগম করছে। তিনি এ উদীয়মান শিল্পীকে বেশি সময় দিতে পারবেন না, তা আগেই জানিয়ে দিলেন। শিল্পী তার কথা মন্ত্রী মহোদয়কে বুঝিয়ে বলবার সুযোগও পেলেন না। এদিকে মন্ত্রী মহোদয়ের আদুরে ছোট ছেলে আব্বার কোল ঘেঁষে শিল্পীর সাথে তার পিতার কথোপকথন শুনছিল। সে আবদার করলো তার ছাতায় শিল্পীকে দিয়ে যেন তার নাম লিখিয়ে দেয়া হয়। ছেলের কথামত মন্ত্রী মহোদয় আবদুলকে আদেশ করলো পিন্টু বাবুর ছাতায় শিল্পীকে দিয়ে নাম লিখিয়ে নেয়ার জন্যে। ভীষণভাবে অপমাণিত হয়ে চলে গেলেন সে শিল্পী মন্ত্রীর বাসা থেকে। কিন্তু তিনি তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে করেই হোক আর্ট স্কুল তাকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এবং শেষ পর্যন্ত সেগুনবাগিচায় পরিত্যক্ত এক বাড়িতে তিনি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন। একদিনের সে ভীরু ড্রয়িং টিচার, যার তুলির আঁচড়ে আঁকা ছবি দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার রূপ তুলে ধরেছিল, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের ছবি যার শিল্পকর্মের উপপাদ্য বিষয় সে শিল্পী আজ ঘুমিয়ে আছে তারই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের (যা পরে উন্নীত হয় কলেজে এবং স্থানান্তরিত হয় শাহবাগ) চত্বরে। আমরা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সে কর্মবীর

শিল্পী জয়নুল আবেদীনকে।

দিন কয়েক আগে গুলশানে এক ডিপ্লোম্যাট-এর বাড়িতে বেশ কয়টি শিল্পকর্ম দেখতে পাই। এর বেশির ভাগই বাংলাদেশী শিল্পীদের অঙ্কিত। এর মধ্যে একটি পোর্ট্রেট দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। অনেকক্ষণ পোর্ট্রেটটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গৃহকর্তা তখন ভেতরের দিকে গিয়েছিলেন। ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে গৃহকর্তাকে এই পোর্ট্রেট-এর সৃষ্টিকর্তা কোন দেশের এবং কে জানতে চাইলাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশী এক শিল্পীর করা এ কাজ। বিভিন্ন দেশে অবস্থানকালে এ ডিপ্লোম্যাট বহু ছবি সংগ্রহ করেছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় যখন এক বাংলাদেশী শিল্পীর প্রশংসা করছিলেন তখন মনে হলো এ প্রশংসার আমিও একজন অংশীদার। আমাদের দেশের এই শিল্পীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভার পরিচয় কখনো দিতে পারতেন না, যদি না শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবের তাজমহলে রূপ না দিতেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগে মারা যান। সান্ত্বনা তাঁকে জাতি যৎকিঞ্চিত সম্মান দিয়েছে। কিন্তু তিনি যত পেয়েছেন জাতির কাছ থেকে জাতি পেয়েছে তার থেকে শতগুণ বেশি।

প্রসঙ্গত আজ এক লোকের কথা উল্লেখ করছি যিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনে একজন সক্রিয় প্রথম কাতারের সৈনিক হিসেবে বহু দুঃখ কষ্ট সয়েছিলেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন পিজি হাসপাতালের এক সাধারণ ওয়ার্ডে। অনুবাদ সাহিত্যে তার দখল ছিল প্রখর। প্রখ্যাত উর্দু ও ফার্সী লেখকদের তিনি পরিচিত করে দেন বাঙালি পাঠকদের কাছে। তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য তিনি প্রগতিশীল লেখকদের লেখাই অনুবাদ করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সেদিন পিজি হাসপাতালে তাঁর বিরল কেশ শীর্ণ দেহ দেখে কে ভাববে এককালের আকর্ষণীয় চেহারার যে যুবক একটা পুরনো সাইকেল সম্বল করে সারা শহর চষে বেড়াতো এই সেই বিদ্রোহী বিপ্লবী যুবক। আমাকে দেখে তাঁর মুখটা খুশীতে ভরে উঠলো। পাশে একটি টুল দেখিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বসতে ইঙ্গিত করলো। বললো জানো রহিম, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কয়েকটি গান শুনতে বড্ড ইচ্ছে করে- যেমন আমি বাণিজ্যেতে যাবো, মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান, ইত্যাদি। আবার নিজ থেকেই মন্তব্য করলো এখানে গান শুনা সম্ভব নয়, বিভিন্ন রকমের রোগী রয়েছে, তাদের অসুবিধা হবে। তাঁর কথার মধ্যে একটা করুণ বেহাগের রাগিণী যেন শুনতে পেলাম।

স্থানীয় ডাক্তারদের খুব প্রশংসা করে রুগ্‌ণ বন্ধু বললো, এখানে যদ্দুর সম্ভব

চিকিৎসা করা যায়, এরা তার ত্রুটি করছেন না। তবে আমাদের দেশে এর বেশি করাও সম্ভব নয়, তাঁর উক্তি। এর সাথে যোগ করলো, বিদেশে কোথাও গেলে হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচতে পারতাম কিন্তু কে জোগাবে এ অর্থ? তাঁর করুণ আর্তি। এককালের সে সংগ্রামী বন্ধুর বহু শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে অনেক উঁচু পদে এখানে সেখানে সমবেত চেষ্টা করলে হয়তো এ অমূল্য জীবনটা আমরা বাঁচাতে পারি।

একটি জাতি বিশ্ব দরবারে তার স্থান ততটা পায় যতটা সে তার দেশের কৃতী সন্তানদের দেয়। জীবদ্দশায় কাউকে অবহেলা করে মৃত্যুর পর তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মালাদান করাটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দেশের বেশির ভাগ জাতীয় পুরস্কার দেয়া হয়েছে মরণোত্তর। জীবদ্দশায় শিল্পী সাহিত্যিক ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে সম্মান দেখাতে পারলে আমাদের দেশে আরো সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের জন্ম হবে, হবে বিকাশ। তা না হলে অনেক না ফোটা ফুল অঙ্কুরে ঝরে যাবে।

[□ এ লেখাটি সাপ্তাহিক চিত্রালীতে বেরিয়েছিলো ১৯৮৫ সালের ২০ নবেম্বর-এ। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই সাহিত্যিক ছিলেন নেয়ামাল বশির। ১৯৮৫ সালের ৩০ নবেম্বর এই সংগ্রামী প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃতের জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

মোস্তফা জামান আব্বাসী ও আমি নেয়ামালকে বিলেতে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু বিলেতের ডাক্তাররা ঢাকায় তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র দেখে জানিয়েছেন বিলেত গেলে লাভ হবে না।

হারিয়ে যাওয়া পুরনো লেখাটির কপি তার সংগ্রহ থেকে দিয়ে সাহায্য করায় নেয়ামাল-এর ছোটভাই বশির আল হেলালকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

মহাপ্রস্থানের যাত্রী

ম্যানচেস্টার থেকে স্পেশাল ট্রেন-এর ফেরত যাত্রা লন্ডনের উদ্দেশ্যে। ১৯৮০ সালের মধ্য জুনের কথা। দ্রুতগামী ট্রেন-এর যাত্রীসংখ্যা সীমিত। প্রত্যেক যাত্রীর সিটের সামনে রয়েছে একটি করে ছোট টেবিল। পকেট থেকে নোট বইটি বের করে টেবিলের উপর রাখলাম। ইনট্রো কি করবো মনে মনে তাই ভাবছি। ভাবনায় হঠাৎ করে ছেদ পড়লো সামনে দণ্ডায়মান কূটনীতিকের সম্বোধনে। তিনি বললেন, এই যে সাংবাদিক সাহেব, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন। ঘোর কাটতে কয়েক মূহূর্ত লাগলো। কূটনীতিকের মুখ নিঃসৃত নির্দেশ শুনার পর দৃষ্টি গেলো অদূরে অন্য সিটে বসা প্রেসিডেন্ট জিয়ার দিকে। লক্ষ্য করেছি, সর্বক্ষণ তিনি একের পর এক তার সহযাত্রীদের ডেকে কথা বলছেন-তাদের কথা শুনছেন, পরামর্শ করছেন কি করে দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে বাড়ানো যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে তাই নিজ কাজে মনোনিবেশ করলাম। সহযাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ।

প্রতিবেদনটা ছিলো মানচেস্টারে এই সুধী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রদত্ত ভাষণের উপর।

নোট বইটি হাতে নিয়ে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সামনে। ইশারা করে সামনের খালি সিটে বসতে বললেন, স্বল্পভাষী প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলে কি করছিলাম। রিপোর্ট লিখছি, ঢাকায় পাঠাতে হবে, বিনীতভাবে জানালাম আর বললাম, লন্ডন পৌঁছে লিখতে গেলে দেরী হয়ে যাবে, তাই ট্রেনে বসেই লেখাটা সেরে ফেলছি।

'হু' বলে একটা শব্দ শুনলাম। পরে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, সাংবাদিকতা

কেমন চলছে? উত্তরে বললাম, ভালোই। কেমন ভালো? পুনরায় জানতে চাইলেন চির অনুসন্ধিৎসু জিয়া। বললাম, এখন তো দেশে বহু পত্র-পত্রিকা। তাতে কি খারাপ হয়েছে? তিনি জানতে চাইলেন আমার মত। না, তা মোটেও না বরং এতে বহু মতের প্রতিফলন ঘটছে, নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিলাম। বহুদলীয় গণতন্ত্র যেখানে আছে সেখানে বহুমতের পত্রিকা থাকবে, পুনরায় যোগ করলাম।

বলুন তো, খবর কাগজে কেন এমন সব সংবাদ ছাপায় হয় যা অনেক ক্ষেত্রে অসত্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই তথ্যভিত্তিক নয়, অনুযোগ করলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। স্বগোত্রীয়দের সমর্থনে বললাম, আদর্শ সাংবাদিকতা আমাদের কাম্য হলেও তা বাস্তবে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বললাম, আমাদের দেশেই একশ্রেণীর কাগজ আছে তারা ক্ষমতাসীন দলের কোন ত্রুটি দেখে না, অপরদিকে অন্য এক ধরনের পত্রিকা রয়েছে যাদের দৃষ্টিতে সরকারের কৃত সকল কর্মই খারাপ। এ দু'য়ের মধ্যে কি একটা ভারসাম্য আনা যায় না? প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সফল কতটুকু হওয়া যাবে তা বলা যায় না, বিনীতভাবে বললাম। গম্ভীর মুখে প্রেসিডেন্ট বললেন, ঠিক আছে, আপনি যান আর দাউদ খান সাহেবকে প্লিজ আসতে বলুন। দাউদ ভাই ছিলেন প্রেসিডেন্টের প্রেস এ্যাডভাইজার।

প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গীদের কয়েকজনের ঢুলু ঢুলু চোখ। গতরাতে লন্ডনের শেরাটন টাওয়ার হোটেলে তাদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়া পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করছেন। তাঁদের সুবিধে-অসুবিধের কথাও শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে। তুলনামূলকভাবে বয়স্ক দু'একজন রাষ্ট্রদূতের কাহিল অবস্থা দেখে প্রেসিডেন্ট নিজেই তাদের স্ব স্ব রুমে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। আগামীকাল সকালে ম্যানচেস্টার যাওয়ার জন্য যেন তারা রেডি থাকেন তা মনে রাখতে বললেন প্রেসিডেন্ট। ১৭ই জুন, ১৯৮০ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন ঢাকার বর্তমান বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক রুটে উড়লো প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী বিমান। গন্তব্যস্থান লন্ডন। দু'দিনের সফরে প্রেসিডেন্ট জিয়া যাচ্ছেন ব্রিটেনে।

বিমানবন্দরের অনেক কাজ বাকি। এমনকি এখানে তখনও রাডার স্থাপন করাও হয়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন, তাঁর লন্ডন সফরে তিনি নতুন বিমানবন্দরই ব্যবহার করবেন। অগত্যা, দিন-রাত কাজ করে কর্তৃপক্ষ সুপরিসর বিমান উড্ডয়নের ব্যবস্থা করেন নতুন হাওয়াই আড্ডা থেকে। প্রেসিডেন্ট জিয়া যা বলতেন তা তিনি করতেন। যা বলতেন তা ভেবেচিন্তেই বলতেন।

এ সম্পর্কে মনে পড়ছে তাঁর সাথে প্রথম সরাসরি সাক্ষাতের কথা। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের একদিন। সাংবাদিকরা তাদের দ্বিতীয় ওয়েজবোর্ড গঠনের দাবি জানিয়ে আসছিলো। জিয়াউর রহমান তখন ডেপুটি চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। তাঁর সাথে বিএফইউজে ও ডিইউজে'র নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয় তারই নির্দেশ মত। তদানীন্তন ডিপিআইও জনাব আবদুল মতিনের সাথে নির্মল সেন, গিয়াস কামাল চৌধুরী ও কামাল লোহানীসহ যাই ক্যান্টনমেন্টে তাঁর দফতরে। নির্মল সেন তখন বিএফইউজে'র সভাপতি, গিয়াস কামাল চৌধুরী সেক্রেটারি জেনারেল, আমি সিনিয়র সহ-সভাপতি, আর কামাল লোহানী ডিইউজে'র সভাপতি। আমাদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য জিয়াউর রহমান সাহেবের হাতে দেয়া হয়। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন টাইপ করা আমাদের দাবি-দাওয়া। পরে আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন। নির্মল সেন বললেন, আমাদের যা বলার তা তো ঐ কাগজে রয়েছে। ডিসিএমএলএ জিয়া তবু আমাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চান।

নির্মল বাবু বললেন, একই দাবি-দাওয়ার কথা বহু জনকে বার বার বলেছি, কিন্তু ফল হয়নি। স্বভাবতই নির্মল সেন ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের আগের ইঙ্গিত করছিলেন, যখন ঘন ঘন তথ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন হয়েছে। জেনারেল জিয়া বললেন, আগের কথা ভুলে যান, এখন কি করা যায় তাই আসুন আলোচনা করি। আমাদের আক্রমণাত্মক কথার মুখে তিনি ছিলেন শান্ত, নীরব শ্রোতা। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের দেয়া দাবিনামার মার্জিনে কিছু নোট নিচ্ছেন। তিনি আমাদের কোন আশ্বাস না দিয়ে বললেন, সাংবাদিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা এবং এ পেশার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দায়িত্বশীল সাংবাদিক তৈরি করতে পারলে সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে বলেও তিনি মন্তব্য করলেন। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। তিনি জোর দিয়ে বললেন, এর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের কথা না দিয়েও অল্প কিছুদিনের মধ্যে সাংবাদিকদের এক ডিনার পার্টিতে জেনারেল জিয়া সংবাদপত্র শিল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতনবোর্ড গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেয়ার ঘোষণা দিলেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভার-এর কৃতী সম্পাদক জনাব ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর কথা মতো কাজ হয়েছে।

জিয়ার স্বপ্নের প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রধান মহাপরিচালক হন অসীম সাহসী অবজারভার সম্পাদক মরহুম আবদুস সালাম, যিনি 'সুপ্রীম টেস্ট' শিরোনামে

সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে স্বাধীন বাংলাদেশে চাকরি হারান। পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব তোয়াব খানও প্রেস ইনস্টিটিউটে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাংলাদেশ অবজারভার-এর প্রাক্তন নিউজ এডিটর ও সালাম সাহেবের জামাতা শ্রদ্ধেয় এবিএম মুসা।

গ্রাম-গঞ্জের সাংবাদিকরাও প্রেস ইনস্টিটিউটের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। সংবাদপত্র শিল্পে নবাগতদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পিআইবি বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে। এক সময় আমাদের ধারণা ছিল অন্যরকম। সাংবাদিকতায় ডিগ্রিধারীদের সংবাদপত্রের কর্তাব্যক্তিরা একটু তির্যক দৃষ্টিতে দেখতেন। সে ধারণার আজ বহুলাংশে পরিবর্তন হয়েছে। প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই— এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই জেনারেল জিয়া পিআইবি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আর একদিনের করুণ স্মৃতি মনে পড়ে। সেদিন ছিল সারা জাতি শোকে মোহ্যমান। নতুন বিমানবন্দরে ছুটে গেছি প্রেসিডেন্ট জিয়াকে রিসিভ করতে। তিনি আসছেন চট্টগ্রাম থেকে, তবে কফিনবন্ধ হয়ে। ১৯৮১ সালের জুন মাসের প্রথমদিকের কথা। ৩০ মে কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর ঘৃণ্য কর্মের ফলে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে। প্রথম খবর ছিল, লাশ আসবে নতুন বিমানবন্দরে। কখন আসবে সে প্রতীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা অপেক্ষমাণ নতুন বিমানবন্দরের এখানে সেখানে। বিকেলের দিকে জানা গেলো অজ্ঞাত কারণে তেজগাঁর পুরাতন বিমানবন্দরে আনা হবে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মরদেহ। জীবিত জিয়া আর কখনও পুরানো বন্দরে তাঁর যাত্রা শুরু বা যাত্রা শেষ করতেন না। কর্মই ছিল তাঁর ধর্ম। দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে। হতদরিদ্র একটি জাতিকে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সাফল্যের দোরগোড়ায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল এক সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগেই সেই সাহসী পুরুষ চলে গেলেন মহাপ্রস্থানের পথে, যেখান থেকে কেউ কোনদিন আর ফিরে আসে না।

বীজতলা

নবাবধনী কঞ্জুস পিতা ১২ বছর বয়স্কা কন্যার জন্মদিনে একটি বই উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন বই তুমি চাও? বুদ্ধিমতী মেয়ে চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলো। চোখ খুলে বললো, ডাডি আমার চাই একটা চেক বই।

ছোটকাল থেকেই এখনকার ছেলেমেয়েরা বৈষয়িক হয়ে উঠছে। এটা শুভ লক্ষণ। এ ধরনের ছেলেমেয়েরা যেমন বুদ্ধি ধরে, তেমনি বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রেও এরা দেখাতে পারে কৃতিত্ব।

কঞ্জুস পিতার বুদ্ধিমতী কন্যাটি চেক বইটি যথার্থ ব্যবহার করে অনেক বই কিনেছে এবং পরবর্তী জীবনে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশ ও দশের জন্য কিছু অবদান রেখেছে। বই পড়ার নেশা তাকে পৃথিবীর জ্ঞান-রাজ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বাংলার মুসলমানদের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিলো তেমনি একটা সুযোগ, যার ফলে এ অঞ্চলের অনগ্রসর মুসলিম সমাজ তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন সফল করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু এ সুযোগ লাভ খুব সহজে হয়নি। এর পেছনে ছিলো অনেক নিবেদিতপ্রাণ সমাজসচেতন মুসলিম বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোভাব।

অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রমের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলোর মুখ দেখে ১৯২০ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. আর সি মজুমদার তাঁর লিখিত নিবন্ধ "ঢাকার স্মৃতি"তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে স্যার আশুতোষ মুখার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জীসহ আরো অনেকের প্রবল বিরোধিতার উল্লেখ করেছেন। ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবে তিনি আশুতোষ বাবুর কাছে জানতে চান, কিসের বিনিময়ে তিনি তাঁর এ বিরোধিতা প্রত্যাহার করতে রাজী। তিনি এ সুযোগে তাঁর নিজ বিদ্যাপীঠের জন্যে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধার কথা বলেন। আশুতোষ বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে নতুন চারটি প্রফেসরের পদ সৃষ্টির দাবি করেন। দাবি পূরণের পর আশুতোষ বাবু তাঁর বিরোধিতা প্রত্যাহার করেন।

১৯১১ সালে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ায় এ অঞ্চলের মুসলমানদের মাঝে দেখা দেয় চরম হতাশা। পরের বছর ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন ও মুসলমানদের মধ্যকার বিরাজমান হতাশা দূর করার ব্যাপারে কি করা যায় তাও চিন্তা করেন। ১৯১২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী ঢাকায় ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে

নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ আরো কয়েকজন নেতা। বঙ্গভঙ্গ রোধের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো তাও তিরোহিত হয়ে গেছে বলে নেতৃবৃন্দ লর্ড হার্ডিঞ্জকে জানান। তারা বলেন, এ অঞ্চলের অবহেলিত মুসলমানদের অনগ্রসরতা দূর করার অন্যতম পন্থা হলো শিক্ষা বিস্তার। তারই প্রয়োজনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দের এ দাবি মেনে নেন ভাইসরয় এবং ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি। রাজনৈতিক মঞ্চ ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকেন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা।

ড. রাসবিহারী ঘোষ-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে আশংকা প্রকাশ করেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে 'বাংলাকে অভ্যন্তরীণভাবে দ্বিখণ্ডিত করা'। তাঁরা আরো বলেন, যেহেতু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী হলো কৃষক, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন কাজে আসবে না।

হার্ডিঞ্জ সাহেব রাসবিহারী বাবুদের এ 'অকাট্য যুক্তি' মানতে পারলেন না। পূর্ববঙ্গ ঘোষণার পর কয় বছর সময়ের মধ্যে (১৯০৫-১৯১১) এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে জাগরণের জোয়ার দেখা গিয়েছিলো, তা স্তিমিত হয়ে পড়ে বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ার পর। মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যত অগ্রগতি সম্বন্ধে গভীরভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ে- এ কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ জানালেন হিন্দু নেতৃবৃন্দকে। তিনি প্রতিনিধিদলকে এ আশ্বাস দেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাকে অভ্যন্তরীণভাবে দ্বিখণ্ডিত করার কোন আশংকা নেই। তিনি তাদের আরো বলেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে হবে না, এটা উন্মুক্ত থাকবে সকল সম্প্রদায়ের জন্যে।

একটি চিঠির মাধ্যমে ১৯১২ সালের ১২ই এপ্রিল ভারত সরকার বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠাবার নির্দেশ দেয়। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে যুক্তি হিসেবে আরো বলা হয় যে, এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ অনেক কমবে। এছাড়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের বক্তব্য পেশেরও সুযোগ সুবিধা পাবে। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন সিনেট সদস্যের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৬ জন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনস্বীকার্য ভূমিকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন কেমন চলছে? এ প্রশ্ন অনেকের। সেসন জট, শিক্ষকদের দলাদলি ও ছাত্রদের মধ্যে হানাহানি— এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠকে সাধারণ মানুষের কাছে বিতর্কিত করে তুলেছে। ছাত্র-শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ দুর্বার ভাষা আন্দোলনের উৎপত্তি হয় এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। দুঃখের ব্যাপার, আজ অমর একুশে উদযাপনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে বিরাজ করছেন। একুশে ফেব্রুয়ারীর মর্যাদা এর ফলে হচ্ছে ক্ষুণ্ন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐতিহাসিক বিজয়ের পর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এই বিজয়কে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে জারি করে ৯২-ক ধারা। এবং তারই ফলে সেই বিজয় মুখোমুখি হয় এক সন্ত্রাসী চক্রের। ১৯৫৫ সালে একুশে উদযাপন করতে বাধা দিয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা। সেই বাধা উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা পালন করেছে একুশে ফেব্রুয়ারী।

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অধিকার কারো নেই- যত বড় বিদ্বান বুদ্ধিমানই তারা হোন না কেন। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করতে পারলেই আমরা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো। ❑